কালসন্দর্ভ
অঙ্কিতা

কালসন্দর্ভা

কালসন্দর্ভা

একটি অকাল্ট থ্রিলার

অঙ্কিতা

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

Kaalsandarva
An Occult Thriller
by *Ankita*

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০১৯

তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

ইবুক প্রকাশ : এপ্রিল ২০২০

প্রচ্ছদ : তৃষা আঢ্য

অলংকরণ : দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

হরফ সজ্জা ও পৃষ্ঠাবিন্যাস : সন্তু বাগ

বর্ণশুদ্ধি : সংকল্প সেনগুপ্ত

ইবুক সংস্করণ : বাংলা ডিজিটাল প্রেস

মুদ্রক : শরৎ ইমপ্রেশনস প্রা. লি.

১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০০৭৩

পরিবেশক : অরণ্যমন প্রকাশনী, ৩/সি যদুনাথ দে লেন, কলকাতা ১২

আলাপন : ৭২৭৮৯৯২৫৪০

ISBN : 978-81-938947-1-2

প্রকাশক : কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

৩৭২/৩ দমদম রোড, সুরের মাঠ, কলকাতা ৭০০০৭৪

ইমেল : kalpabiswa.publications@gmail.com

ওয়েবসাইট : kalpabiswabooks.com

আলাপন : +৯১-৯০৫১৩৭০১১৬

মূল্য : ২৭৫ টাকা

উৎসর্গ

মা-কে

প্রকাশকের কথা

কল্পবিশ্ব প্রকাশনীর তৃতীয় নিবেদন কালসন্দর্ভা। শুরু থেকেই কল্পবিশ্বের উদ্দেশ্য ছিল পুরানো লেখা পুনরুদ্ধার ও গবেষণামূলক লেখার পাশে এই সময়ের লেখকদের, বিশেষত তরুণদের লেখা বাংলা কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর কাহিনি প্রকাশ। পরে প্রকাশনা শুরু করেও নতুন লেখকদের উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারটাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। তারই ফলশ্রুতি তরুণ লেখিকা অঙ্কিতার এই উপন্যাসটি।

ইতিহাস এবং তন্ত্র আশ্রয়ী এই গতিময় ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চারের চরিত্র কিন্তু খাঁটি বাঙালি। অঙ্কিতা অবলীলায় নন-লিনিয়ার ন্যারেটিভে অতিক্রম করে গিয়েছেন স্থান-কালের সীমা। তাঁর চরিত্ররা বেশির ভাগই আজকের যুগের তরুণ-তরুণী। কিন্তু তারা মোকাবিলায় নামছে বহু শতাব্দী প্রাচীন এক ষড়যন্ত্রের। পড়তে পড়তে যেমন শিউরে উঠতে হয় সেই অলৌকিক শক্তির নির্মমতায়, তেমনই আবার শুভ শক্তি ও ভালোবাসার জয়গানে শান্ত হয় মন।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কিতার এই উপন্যাস পাঠকের বিপুল সমাদর পেয়েছে। এক নবাগতার প্রথম লেখাটির এমন জনপ্রিয়তা দেখে প্রকাশক হিসেবে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। দ্বিতীয় মুদ্রণও শেষ। সামান্য কয়েকটি বানান পরিবর্তন করে তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

কৈফিয়ত

অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপারে আমার প্রথম আগ্রহ জন্মায় 'দেবযান' পড়াকালীন। গল্পটি ফ্যান্টাসি নাকি আমাদের জগতেরই এক অন্য রূপ তা বুঝতে পারিনি বহু কাল। সেই সময়ই হাতে আসে 'অলাতচক্র' বইটি। সেই প্রথম 'তন্ত্র' নামক এই অদ্ভুত ধর্মাচরণটি আমাকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পরে ক্রমাগত বিজ্ঞান চর্চার ফলে তন্ত্রের প্রতি, অলৌকিক জগতের প্রতি আমার সেই আগ্রহ ক্রমশ কমে আসে।

বছর কয়েক আগে পর্যন্তও তন্ত্রের উপরে কিছু ফিকশনাল গল্প-উপন্যাস ছাড়া আমার আর কিছুই পড়া হয়ে ওঠেনি। একদিন রাঢ় বাংলার পটভূমিতে একটা থ্রিলার গল্পের প্লট ভাবতে ভাবতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। তার কাছ থেকেই একটা অদ্ভুত তথ্য জানতে পারি— তিনটে শক্তিপীঠ দিয়ে তৈরি একটি ত্রিভুজের নাভিবিন্দুতে যদি কেউ জন্মায় তাহলে সে নাকি মহান সাধক হয়। সাধক বামাখেপা নাকি জন্মেছিলেন সেরকম ক্ষেত্রে।

সেই সময় তারাপীঠ বেড়াতে গিয়ে এই ছোট্ট গল্পটা আমি আবারও শুনি এক পুরোহিতের মুখে। এই দু-লাইনের তথ্যটুকু ছাড়া কেউই আর কিছুই বলতে পারেনি। কোন কোন শক্তিপীঠ? কীরকম ত্রিভুজ? ত্রিভুজের নাভি মানে কি ভরকেন্দ্র? নাকি কোনও বিশেষ তান্ত্রিক শব্দ? কিছুই তারা বলতে পারেনি।

তবে তন্ত্রের সঙ্গে অঙ্কের এইটুকু মিল পেয়েই আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি। অবশ্য হাজার খুঁজে কোনও বইতে আমি এই ব্যাপারে কিছুই পাই না। তারপর গুগ্‌ল ম্যাপের সাহায্যে শক্তিপীঠগুলোকে খুঁজে খুঁজে ওই তথ্যের সত্যতা যাচাই-এর চেষ্টা করি। এবং সত্যি সত্যি স্থানগুলোর মধ্যে এক বিশেষ জ্যামিতিক আকৃতি খুঁজে পাই। আমার উপন্যাসে আমি এই তথ্যটা ভাগ করে নিয়েছি পাঠক বন্ধুদের সঙ্গে।

এর পরে উৎসাহিত হয়ে আমি তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত পড়াশোনা শুরু করি। ভারতে তন্ত্রের উৎপত্তি এবং বিস্তার নিয়ে বিস্তর গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এর প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায়, এই বিশাল উপমহাদেশের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র, বিভিন্ন সব তন্ত্রশাস্ত্র, এবং দ্বিতীয়ত এইসব শাস্ত্রের ব্যাপারে সমকালীন সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক প্রামান্যতার অভাব।

তন্ত্রের গোড়া খুঁজতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরাণ বা লোককথায় এসে ধাক্কা খেতে হয়— যাকে ইতিহাস বলে মেনে নিতে ঐতিহাসিকদের ঘোর আপত্তি আছে। এই উপন্যাসেও সেই দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। ক্রমে আমার থ্রিলার গল্পের প্লটে মিশতে থাকে বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রথা, তন্ত্রের ইতিহাস, পুরাণ এবং অতি অবশ্যই এক অলৌকিক জগতের গল্পও।

উপন্যাসের মধ্যে বেশ কিছু গোষ্ঠীর নাম, তাদের উপাসনা পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ করেছি আমি। চিরপ্রণম্য সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রথম আলো'র কৈফিয়ৎ-এ যা বলেছিলেন, সেই

মহাজনপদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও বলতে চাই, গল্পের চরিত্ররা এবং ঘটনাবলি সবটাই কাল্পনিক, কিন্তু পুরাণ আর ইতিহাস অংশটুকু নির্জলা সত্য। রৌম্য, ভৈরব ইত্যাদি চরিত্রগুলো আমি পুরাণের বিভিন্ন বই থেকে গ্রহণ করেছি। একইভাবে সুতিয়া, আহোম, দেওরী প্রভৃতি গোষ্ঠীদের খুঁজে নিয়েছি ভারতের ইতিহাস থেকে।

প্রায় আট মাস আগে আমি উপন্যাসটা লিখতে শুরু করি। তখনও পর্যন্ত ভেবেছিলাম এটা বড়োজোর হাজার কুড়ি শব্দের একটা থ্রিলার উপন্যাসিকা হবে। কিন্তু কখন যে আমার হাত থেকে রাশ কেড়ে নিয়ে চরিত্ররাই ঘটনাক্রমকে চালনা করতে শুরু করল তা টেরই পেলাম না। মাসচারেক আগে যখন উপন্যাসের প্রথম ড্রাফট লিখে শেষ করলাম, তখন দেখলাম শব্দসংখ্যা সত্তর হাজার ছুঁই ছুঁই।

নবাগত লেখকের পক্ষে এরকম এক বিশাল বপু উপন্যাসের জন্ম দেওয়া অনেকটা সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতোই। জন্ম দিয়ে মায়ের মন তো অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু একই সঙ্গে মাথায় ঢোকে সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তাও। সেই চিন্তা থেকে আমাকে মুক্ত করেছে কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস। তাদের আশ্বাস- বাণীতেই শব্দ সংখ্যার কোনও বিশেষ বাধনে বাধা পড়তে হয়নি আমার এই উপন্যাসকে।

উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে যারা তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়াও এই দীর্ঘ গবেষণাধর্মী উপন্যাসের অবিরাম আর জটিল চলন যখনই আমাকে ক্লান্ত করেছে, তখন যে মানুষটার ক্রমাগত উৎসাহে আমি আবার পথ খুঁজে পেয়েছি, যার প্রাণপণ প্রচেষ্টা ছাড়া এত কম সময়ে কিছুতেই আমার এই উপন্যাসটি বই আকারে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারতাম না, আমার সেই চিরসাথীকে প্রণাম।

অঙ্কিতা
১২ নভেম্বর ২০১৮
ankitamaity88@gmail.com

এই উপন্যাসটি একটি কাল্পনিক কাহিনিমাত্র। কোনও ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে মিল থাকলে তা একেবারেই কাকতালীয় ও অনিচ্ছাকৃত। এই উপন্যাসটির উদ্দেশ্য কখনওই কোনও বিশেষ জাতি বা অঞ্চলের মানুষের ধর্ম, বর্ণ বা ঐতিহ্যকে আঘাত করা নয়। উপন্যাসটি কোনও কুসংস্কার অথবা কোনও তান্ত্রিক ক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য লেখা হয়নি।

কালপক্ষ

আট বছর আগে, জুলাই ২০০৯

(দিকরং উপত্যকা, অসম)

প্রাক-আষাঢ়ের রাত্রি। আজ অমাবস্যা। ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে চারধার। কিছুক্ষণ আগেই তিন দিন ধরে অবিরাম ঝরে চলা প্রবল বৃষ্টি সামান্য ধরে এসেছে। আকাশে বারবার ফুটে উঠছে বিদ্যুৎরেখা। মেঘের পাহারা ভেদ করে একটা তারাও উঁকি দিচ্ছে না। অন্ধকার ফুঁড়ে দীর্ঘ বল্লমের মতো উঠে গেছে পাহাড়ি উপত্যকার মহাবৃক্ষের সারি। তাদের ঋজু প্রাচীন শরীর বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। বনজঙ্গলের মাঝে এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। মন্দির ও তার সংলগ্ন সামান্য অংশে কোনও বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। প্রকৃতিবন্ধন।

মন্দিরের ভাঙাচোরা পাথরের দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা মশাল গোঁজা। তাদের সম্মিলিত সামান্য আলোতে ছমছম করছে জঙ্গলের মাঝখানে প্রাচীন মন্দিরটা। দেবী দিক্করবাসিনীর মন্দির। এখন অবশ্য ভিতটুকু ছাড়া বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। এদিক-ওদিক মানুষসমান উঁচু কয়েকটা পাথরের ভাঙা দেওয়াল। দেবালয়ের ছাত ধ্বংস হয়ে গেছে প্রায় পাঁচশো বছরেরও আগে। দেবালয়ের পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের উপনদী, দিকরং।

মন্দিরের পাথুরে মেঝেতে বসে আছে এক প্রৌঢ়া। মশালের ছায়া ছায়া আলো সত্ত্বেও দীর্ঘ কালো আলখাল্লায় ঢাকা শরীরটাকে মাঝে মাঝেই অন্ধকার থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। শুধু প্রৌঢ়ার বলিরেখাপূর্ণ মুখ মশালের আলোতে জ্বলজ্বল করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে এক মহাযজ্ঞ। তিনিই এই যজ্ঞের হোতা।

মৃদু মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে মেঝের উপরে রক্ত দিয়ে তিনি এক অদ্ভুত আলপনা আঁকছেন। সাতকোনা এক জ্যামিতিক আলপনা। প্রতিটা কোনায় বিশেষ ভাষায় কয়েকটি অক্ষর লেখা। এ কোনও সাধারণ আলপনা নয়। এ এক অতি গুহ্য তান্ত্রিক আলপনা।

এক ধারে মন্দিরের পাথুরে মেঝেতে রাখা যজ্ঞের একমাত্র উপাচার। একটি পূর্ণগর্ভা তরুণী। তরুণী জ্ঞানরহিত। তার দেহে কোনও স্পন্দন নেই। আচম্বিতে দেখলে মৃত মনে হয়। এই তরুণীর গর্ভেই বাস করছে আগামী দীর্ঘ পরিকল্পনার চাবিকাঠি। ঠিক সূর্যগ্রহণের মুহূর্তে খুলবে নরকের দ্বার। তরুণীকে আহুতি দেওয়া হবে দেবীর উদ্দেশ্যে। দেবী তুষ্ট হলে জন্ম নেবে 'বীজ'।

প্রৌঢ়ার কয়েক হাত পিছনে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক বালক। দশ বছরের বালক। তার চকখড়ির মতো সাদা শরীরে মশালের হলদেটে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। বালকটি পাথরের মতো ভাব- লেশহীন মুখে চেয়ে আছে তরুণীর দিকে। পরিষ্কার দিঘির মতো স্বচ্ছ নীল দুই চোখের মণিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল মশালের

অগ্নিশিখা। প্রৌঢ়ার সঙ্গে সে মন্ত্রবন্ধনে বাঁধা। তার কোথাও পালাবার উপায় নেই। প্রৌঢ়া মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করতেই তার বুক কেঁপে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

গত কয়েকদিন ধরেই ভারত ভূখণ্ডের এই প্রত্যন্ত প্রান্তে অসম্ভব বৃষ্টি হচ্ছে। দিকরং নদী ফুলেফেঁপে ভাসিয়ে দিয়েছে আশপাশ। পাহাড় থেকে নেমে আসা সর্বনাশী ঘোলা জল গ্রামগঞ্জ ভাসিয়ে বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে চলছে মূল ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অভিমুখে। সদিয়া, দিকরং দুটি গ্রামই ভেসে গেছে। ভাঙা মন্দির সংলগ্ন জঙ্গল সর্বাগ্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে।

নদীর ভয়ংকর গর্জন বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। দিকরং নদী তার উপাস্য দেবী দিক্করবাসিনীর মতোই মানুষখেকো হয়ে উঠেছে। নদীর মতো বালকের ধমনিতেও বয়ে যাচ্ছিল রক্ত, গজরাচ্ছিল থেকে থেকে। বালকটি শিরায় শিরায় অনুভব করছিল সেই পাগলপারা উন্মাদনা। হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা মেরে মেরে রক্তকণিকারা জানিয়ে দিচ্ছে, আজই তার শেষ দিন।

আটশো বছর আগে যোগিনীরা জাগিয়েছিল দেবী দিক্করবাসিনীকে। এই মন্দির চত্বরে জন্ম নিয়েছিল এক 'বীজ'। সেই শেষ। তারপরে দিকরং দিয়ে কত জল বয়ে গেল। লুপ্ত হয়ে গেল কত তন্ত্রজ্ঞান। মুছে গেল কত মহান রক্তধারা। যোগিনীতন্ত্রের প্রাচীন ধারাগুলোই হারিয়ে গেল সময়ের ঘূর্ণিপাকে।

আজ আবার সেই নরকের দেবীকে আহ্বান জানাতে এসেছে এক যোগিনী। প্রৌঢ়া মহিলা। মহাযোগিনী কালসিদ্ধা। এক প্রাচীন ইতিহাস ফিরে আসছে পৃথিবীর বুকে। দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে রক্তকুণ্ডে বলি দিতে হবে এক ভৈরবকে। ভৈরবের প্রাণ না পেলে দেবী পুনর্বার পা রাখবে না মর্তের মাটিতে। নিজের শক্তি দিয়ে আশীর্বাদ করবে না বীজকে। দেবীকে তুষ্ট করার এক এবং অন্যতম উপাদান হল ভৈরব। এই বালক!

বালকটি দিকরং নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পরেই ভোর হবে। পুবের আকাশ ফাঁকা হয়ে আসছে। সূর্য উঠবে। সে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখছিল নদীর বুকে বিশাল বিশাল উপড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি, ঘরের চালা, গোরু-মহিষের মৃতদেহ ভেসে চলেছে। নদীর তীব্র স্রোতে সেগুলো লাট খাচ্ছে, ডুবছে, ভাসছে আর প্রবল টানে এগিয়ে চলছে মহাধ্বংসের দিকে। ঠিক যেমন কালান্তক এক নিয়তি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক মারণযজ্ঞ থেকে অপর মারণযজ্ঞের দিকে, তাকে শিখণ্ডী বানিয়ে তৈরি করে নিচ্ছে মহাধ্বংসের সূচনা। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যোগিনী কালসিদ্ধা বালকটিকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন মন্দির প্রাঙ্গণে। বিশাল কুসুমরঙা সূর্যটা পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগেই নিয়তির করাল গ্রাসের মতো রাহু মুখব্যাদান করে তাকে খেতে শুরু করল। গ্রহণকাল।

রক্তাঙ্কিত সপ্তভুজ যন্ত্রটিকে ঘিরে এক অদ্ভুত চক্রাকার জ্যামিতি ফুটে উঠল মন্দিরগর্ভস্থ পাথরের মেঝেতে। ক্রমে চক্রের মধ্যে এক অস্বাভাবিক রক্তকুণ্ড তৈরি হল।

আকাশে সূর্যের গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। কালো বৃত্তের বাইরে থেকে আলোকরশ্মি তিরের মতো ছিটকে আসছে বাইরে। কয়েক পলের মধ্যেই স্বর্গীয় হীরকাঙ্গুরীয় দেখা যাবে আকাশের গায়ে।

যোগিনীর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রক্তকুণ্ডটা ক্রমে বড় হচ্ছিল। বালকটি হঠাৎ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। ছটফট করে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মন্ত্রবন্ধনের জন্যে সে একচুলও নড়তে পারল না। রক্তবৃত্তের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে ভয়ংকর দুটো পৈশাচিক হাত। হিংস্র নখরসমৃদ্ধ রক্তাক্ত দুটো হাত। হাত বেরিয়ে আসছে তাকে টেনে নেওয়ার জন্য। প্রদত্ত বলি গ্রহণের জন্য।

পরক্ষণেই এক মারাত্মক আঘাতে প্রৌঢ়া যোগিনীর সঙ্গে সঙ্গে বালকও ছিটকে পড়ল মন্দিরের বাইরে। সে অবাক বিস্ময়ে দেখল, সূর্যের মতোই স্বর্ণাভাবিশিষ্ট এক যুবক ঢুকে এসেছে প্রকৃতিবন্ধনের মধ্যে। বালকটি বুঝল, তার আতঙ্কিত চিৎকারই যুবকটিকে বুঝতে সাহায্য করেছে স্থানটা। যুবকের হাতে এক বিচিত্র অস্ত্র। চাবুকের মতো সেই অস্ত্রের টানে, দূর থেকেই বালককে সে ছুড়ে ফেলেছে ওই পৈশাচিক হাতের আওতার বাইরে।

যুবকটি লাফিয়ে ঢুকে এল মন্দিরের মধ্যে। যোগিনী মন্ত্রবন্ধনে আটকাতে চাইল যুবকটিকে। কিন্তু তার মন্ত্রোচ্চারণের আগেই বিদ্যুতের মতো যুবকের হাতের স্বর্ণবর্ণ ধারালো অস্ত্রটা আঘাত করল যোগিনীকে। যোগিনীর রক্তাক্ত দেহটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

রক্তকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এল আরও দুটো ভয়াল পৈশাচিক হাত। আক্রমণ করল যুবককে। দেবী বুঝতে পারছে, কেউ তার খাদ্য সরিয়ে নিচ্ছে। অন্য দুটো হাত ততক্ষণে রক্তকুণ্ডের পাশে পড়ে-থাকা তরুণীর অর্ধেক দেহ টেনে ঢুকিয়ে ফেলেছে রক্তবৃত্তের মধ্যে। তরুণীর মুখবিবর থেকে বুক পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে বৃত্তের মধ্যে। বিস্ফারিত উদর আর দীর্ঘ নগ্ন পা কাঁপছে থেকে থেকে।

মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যুবকের অস্ত্রটা থেকে এক সরু আগুনে শিকল বেরিয়ে বেঁধে ফেলল চারটে হাত। কয়েক পলের জন্যে থেমে গেল হাতগুলো। যুবক তরুণীকে টেনে বের করে আনার চেষ্টা করল রক্তকুণ্ডের মধ্যে থেকে।

পরক্ষণেই এক আবক্ষ ভয়ংকরী পৈশাচিক দেবী বেরিয়ে এল রক্তবৃত্তের মধ্যে থেকে। ছয় হাতে মারাত্মক অস্ত্র সমেত সে আক্রমণ করল যুবককে। যুবক বাধ্য হল তরুণীটিকে ছেড়ে অস্ত্রের আক্রমণ ঠেকাতে। রক্তকুণ্ড গিলে খেতে শুরু করল নিস্পন্দ পূর্ণগর্ভা দেহটিকে। উপায়ান্তর না দেখে যুবক মারাত্মক পদাঘাত করল তরুণীর গর্ভে। নাড়িতে আবদ্ধ এক ক্ষুদ্র শরীর ছিটকে বেরিয়ে এল। তরুণীর দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল রক্তকুণ্ডের মধ্যে। নাড়িতে টান লেগে শিশুর দেহটাও এগিয়ে যাচ্ছিল রক্তবৃত্তের দিকে। যুবক দ্রুত অস্ত্রচালনা করে নাড়ি কেটে দিল। সে লাথি মেরে শিশুটাকে দূরে ছুড়ে ফেলতে চাইল, কিন্তু পারল না। ভয়ংকর পিশাচিনী দেবী মুখব্যাদান করে ধারালো দাঁতে কামড় বসাল যুবকের দেহে।

‘তেহাম্... ৎনাত... জ্ঘকিদ্... সানাখে।’ চিৎকার করে উঠল যুবক।

সোনালি অস্ত্রটা থেকে একটা ঘূর্ণ্যমান চক্র ছিটকে বেরিয়ে এসে আমূল গেঁথে গেল দেবীর শরীরে। অলৌকিক একঝলক কালাগ্নি বেরিয়ে এল দেবীর দেহ থেকে। দৈবী আগুনে ঢেকে গেল সমস্ত মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে মাটিতে পড়ে-থাকা বালকটিও টের পেল আগুনের ঝলসানি। মন্দিরের মেঝেতে পড়ে-থাকা শিশুটির শরীরে মিশে গেল সেই কালো আগুন।

এক লহমায় যুবককে টেনে নিয়ে দেবী অদৃশ্য হল কুণ্ডের মধ্যে।

পূর্ণগ্রহণ ছেড়ে যাচ্ছে, মহাকাশীয় আংটির হীরের মতো জ্যোতিঃপুঞ্জ বড় হতে হতে লাল সূর্যের কিয়দংশ বেরিয়ে এসেছে। মাত্র চার মিনিটের অবকাশে এক মহাযজ্ঞ হয়ে গেল দিকরং কূলে। প্রকৃতিবন্ধন মুছে গেছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে দেবীর থানে। রক্তকুণ্ডটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রবল বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে পাথরের মেঝেতে লেগে থাকা শেষ কাঁচা রক্তটুকু। মাটিতে পড়ে থাকা সদ্যোজাত শিশুটি আচমকা তারস্বরে কেঁদে উঠল।

এতক্ষণে বালকটির সংবিৎ ফিরল। সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল শিশুটার কাছে। অস্বাভাবিক রক্তবর্ণের এক শিশু। শিশুটিকে থামানোর জন্য দু-আঙুলে কচি ঠোঁট দুটো চেপে ধরল বালক। পরক্ষণেই হাত সরিয়ে নিল। তীব্র এক আগুনে জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে বালকের হাতে।

ক্রন্দনরত শিশুটি পড়ে রইল ভেজা মাটিতে। ভাঙা দেউলের একপাশে প্রৌঢ়া যোগিনীর অচৈতন্য দেহ ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। বালকটি কোনওমতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নদীর পারে গেল। তার গলা শুকিয়ে গেছে। নদী থেকে জল খাওয়ার জন্যে সামান্য ঝুঁকতেই মাথা ঘুরে গেল বালকের। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে সে অনুভব করল ওই যোগিনীর মন্ত্রবন্ধনে সে আর আবদ্ধ নয়। মুক্তির আনন্দ অনুভব করার আগেই বালকটি টলে পড়ে গেল খরস্রোতা নদীগর্ভে। সে ভেসে গেল প্রবল বন্যাস্রোতে।

দ্বিপ্রহরে প্রৌঢ়ার জ্ঞান ফিরল। কূল ছাপিয়ে উঠে এসেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। কোনওরকমে বুক ঘষটে তিনি নামলেন মন্দির থেকে। তাঁর নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে। মাটিতে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে গেলেন সদ্যোজাত শিশুটার দিকে। আরেকটু হলেই শিশুটা ভেসে যেত ব্রহ্মপুত্রের বানে। প্রৌঢ়া শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে আবার উঠে এলেন মন্দিরের মধ্যে। তখনই তিনি অনুভব করলেন, দেবীর দেহনিঃসৃত কালাগ্নি তার সমস্ত ক্ষমতা শুষে নিয়েছে। মন্ত্রবন্ধন কেটে গেছে। ভৈরব বালকটিকে তিনি আর অনুভব করতে পারলেন না। বালকটা কি বেঁচে আছে? তিনি বুঝতে পারলেন না।

প্রৌঢ়া রক্তবর্ণ শিশুটিকে সূর্যের আলোয় তুলে ধরলেন। কালপক্ষের শুরু। তাঁর সাধনার প্রথম ধাপ পূর্ণ হয়েছে। দেবী আশীর্বাদ করেছে এই শিশুকে। জন্ম নিয়েছে ‘বীজ’। এই শিশুই তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে। আগামী মহাযজ্ঞের শেষে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগিনী হবেন এই লৌকিক পৃথিবীর বুকে।

বর্তমান সময়কাল, জানুয়ারি ২০১৮

এক

'আজ কত তারিখ রে কৃষ্ণা?'

'আজ হল গে তোর পৌষসংক্রান্তি। চোদ্দোই জানুয়ারি।'

সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা বসে ছিল একতলার চওড়া বারান্দার হাতায়। মোবাইলে গত দু-তিন দিনের তোলা ছবিগুলো দেখছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝি এখানে বেশ ঠান্ডা। জলে হাত দিলে হাত কনকন করছে। শহরে শীত ভালো বোঝা যায় না, কিন্তু এখানে ওই 'মাঘের শীত বাঘের গায়ে' প্রবাদটা রীতিমতো কামড়ে কামড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সর্বানন্দপুর গ্রামের উপাধ্যায়বাড়ি। কোপাই নদী থেকে কয়েকশো মিটার দূরে, সবুজ ধানখেতের মাঝে বাগান-ঘেরা দোতলা বাড়িটাকে অনেকটা তৈলচিত্রের দৃশ্যপটের মতোই লাগে। বাড়ির চারধারে পুকুর-বাগান-মন্দির সমেত প্রায় তিন বিঘা ভিটেজমির সীমানা দেড়-মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। লাল টুকটুকে সুরকি বিছানো পথটুকু বাদে বাকি বাগানটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। সেই ঘাসের উপরে নেচে-বেড়ানো প্রজাপতির পিছনে জাল হাতে করে ছুটে বেড়াচ্ছে সোলাঙ্কীর ছোট বোন শাম্ভবী। এইবারে সে ক্লাস ফোরে উঠবে।

কৃষ্ণার সঙ্গে সোলাঙ্কীর বন্ধুত্ব প্রায় বছরখানেকের। গত ডিসেম্বরে দুজনেই ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বের হয়নি এখনও। জানুয়ারির শেষে বেরবে।

সোলাঙ্কীর মাকে অফিসের কাজে টরোন্টো যেতে হয়েছে গত বছর পুজোর সময়। মাস ছয়েকের আগে মা ফিরতে পারবে না। এই সময়টা বাবাকে প্রতি বছরই দিল্লিতে গিয়ে থাকতে হয় অফিসের কাজে। দু-সপ্তাহ টানা। মা নেই বলে বাবা সোলাঙ্কীদের দিল্লি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন।

ওরা হয়তো বাবার সঙ্গে দিল্লি চলে যেত। কিন্তু নিউ ইয়ার'স ইভে কৃষ্ণাদের বাড়ির পার্টিতে গিয়ে ঠিক হয়, জানুয়ারির ছুটিটা সোলাঙ্কীরা কৃষ্ণার মামাবাড়িতেই কাটাবে।

বোলপুরের কনকনে ঠান্ডা উপভোগ করতে করতে সোলাঙ্কী ভাবছিল কোনটা ভালো! দিল্লির কুয়াশা-ঢাকা রাস্তাঘাট, নাকি রাঢ় বাংলার এই ধু ধু খেত। বাবার সঙ্গে দিল্লি গেলে সারাক্ষণ হোটেলে বসে থাকা। বাবার দিবারাত্রি অফিসের কাজ। কোথাও ঘুরতে যাওয়া যায় না। বোরিং লাগে খুব। শাম্ভবী তো মাথা খারাপ করে দেয় একেবারে। দিল্লি যাওয়ার থেকে কৃষ্ণার মামাবাড়ি ঢের ভালো।

পৌষসংক্রান্তির তিন দিন আগে এসেছে ওরা সর্বানন্দপুরে। সোলাঙ্কীর বাবা নিজেই এসেছিলেন ওদের তিনজনকে নিয়ে। সোলাঙ্কী, শাম্ভবী আর কৃষ্ণা। আজ সকালেই তিনি কলকাতা চলে গেছেন। বিকেলে দিল্লির প্লেন।

‘জামাইবাবু আর লতাদি এসে গেলে আরও মজা হত।’ কৃষ্ণার কথায় সোলাঙ্কী বর্তমানে ফিরে এল।

‘কবে আসবে ওরা?’

‘ওরা আসবে তেসরা মাঘ, মানে আরও তিন দিন পরে। সংক্রান্তিতে নাকি বাড়ি থেকে বেরতে নেই।’

কৃষ্ণা বকবক করেই যাচ্ছিল। ‘জামাইবাবু এলে আরেকদিন পিঠেপুলির আসর বসবে। বামুনপিসি বলেছে, এবার ময়ূরপেখম বানাবে। আমি সব ছবি তুলে রাখব। ফেসবুকে দিলে যা...’

‘একটা সতিনমোচড়ও হবে। আর এবারেও সেটা তুইই শেষ করবি।’ কৃষ্ণার কথার মাঝখানে কে যেন ফুট কাটল। দুজনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, অচিন্ত্য এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। কৃষ্ণার মামাতো দাদা। উপাধ্যায়বাড়ির একমাত্র বংশপ্রদীপ।

‘যার ভালো লাগবে, সে খাবে। তুই যেন পিঠে খাস না!’ ঝংকার দিয়ে উঠল কৃষ্ণা।

‘সতিনমোচড় আবার কী?’ সোলাঙ্কী অবাক হয়ে জানতে চাইল।

‘ওটা এক রকমের পোড়া পিঠে। কৃষ্ণার জন্য আমরা একটুও ভাগে পাই না।’ অচিন্ত্য তালা খুলে একটা সাইকেলকে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে নামাতে বলল।

‘কোথায় যাচ্ছিস?’ কৃষ্ণা কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

‘কঙ্কালীতলার দিকে যাব। ঠাকুরবাড়িতে বলে আসি। রটন্তীপুজোতে আমাদের নামে একটা পাঁঠা যাবে।’ অচিন্ত্য বলল।

‘চল, আমরাও যাব।’ কৃষ্ণা সোলাঙ্কীকে টানল।

বাগান থেকে জাল হাতে শাম্ভবীও ছুটে আসে। সে একটাও প্রজাপতি ধরতে পারেনি। ‘কোথায় যাচ্ছ তোমরা? আমিও যাব, আমিও যাব।’

তিনজনকে দেখে অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করল, ‘অতটা হাঁটবি নাকি?’

‘তোর সাইকেলে তো আর সবাই হবে না।’ কৃষ্ণা ঠোঁট বেঁকাল।

‘হয়ে হয়তো যাবে, কিন্তু শুধু তুই উঠলেই তো আর টানতে পারব না।’ অচিন্ত্যর ঠাট্টায় কৃষ্ণার ফুলো ফুলো গাল দুটো আরেকটু ফুলে গেল।

‘সে তো পারবিই না। বাঁশকাঠির মতো চেহারা। মামি যে প্রতিদিন আহা রে বাছা রে বলে দুধের সরটা, মাছের বড় পেটিটা খাওয়াচ্ছে, সেগুলো যায় কোথায়?’ কৃষ্ণাও ঝামটাল।

কৃষ্ণা আর অচিন্ত্য প্রায় পিঠোপিঠি ভাইবোন। বছর দুয়েকের বড় মামাতো দাদাটার আধিপত্য মেনে নিতে কৃষ্ণা কখনওই রাজি নয়। অচিন্ত্যর নিজের দিদির নাম লতা। মাস ছয়েক আগে তার বিয়ে হয়েছে, সে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। এখন বিশাল উপাধ্যায়বাড়িতে অচিন্ত্য ছাড়া পরিবারের মানুষ মাত্র তিনজন। অচিন্ত্যর বাবা, মা আর ঠাকুরদা।

বোলপুর শহরে অচিন্ত্যদের পারিবারিক ব্যাবসা। সোনার দোকান। অচিন্ত্যর বাবা বিমলচন্দ্র আর ঠাকুরদা তারকনাথ নিয়মিত দোকানে বসেন। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি তারকনাথ

দৈহিক দিক থেকে এখনও যথেষ্ট সক্ষম।

লতার বিয়ে হয়ে যাওয়া ইস্তক সারাদিন বাড়িতে শুধু অচিন্ত্য আর তার মা সুরমাদেবী। বাড়িটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। কৃষ্ণা সবান্ধব আসাতে সেই অবস্থাটা খানিক হলেও কেটেছে। পৌষ মাস কেটে গেলেই লতাও আসবে বরকে নিয়ে। অচিন্ত্য বেজায় খুশি।

উপাধ্যায়বাড়ি থেকে কোপাই নদী দু-তিনশো মিটার দূরে। নদীর উপরে বাঁশের সাঁকো, সেটা পেরলেই উলটোদিকে কঙ্কালীতলা গ্রাম। মন্দিরটা অবশ্য মাঠ পেরিয়ে আরও আট-নশো মিটার। কৃষ্ণা শেষমেশ লতার পুরানো লেডিজ সাইকেলটা নিয়ে এসেছে। বেশ কয়েক মাস অব্যবহৃত পড়ে থাকার ফলে সেটা একটু গন্ডগোল করছে। জোরে চালালেই চেন পড়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে এসে কৃষ্ণার সাইকেলের চেন আবার পড়ে গেল। এই নিয়ে তিনবার।

কৃষ্ণা বেজার মুখে বলল, 'ধুস, এই সাইকেল নিয়ে আমি যেতে পারব না।'

কৃষ্ণা নদীর ধার ঘেঁষে ঘাসের উপরে সাইকেলটা রাখল। শাম্ভবী সাইকেল থেকে নেমেই নদীর ঢালু পাড় ধরে ছুটে গেল। অচিন্ত্য চিৎকার করে সাবধান করল শাম্ভবীকে।

সোলাঙ্কী নদীটা দেখছিল। শীতে বরুণদেব বড়ই কৃপণ হয়ে গেছে। সামান্য জল তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। বড় বড় পাথর দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও অবশ্য প্রায় বুকসমান জল হবে, তবে বেশির ভাগ জায়গাতেই হাঁটু-জল। দুপুরের রোদ থাকা সত্ত্বেও কনকনে বাতাস মাঝে মাঝে কাঁপন লাগিয়ে দিচ্ছে হাড়ে। সে শাল দিয়ে ভালো করে কান-মাথা মুড়ি দিয়ে নিল।

'তাহলে তোরা এখানেই বস্। আমি বলে ফিরে আসি। আধ ঘণ্টাও লাগবে না।' অচিন্ত্য বলল।

'নদীর পারে বেশিক্ষণ থাকব না কিন্তু, ঠান্ডা লেগে গেলে খুব মুশকিল হবে।' সোলাঙ্কী বলল।

'বুড়ি ঠাকুমাদের মতো কথা বলিস না তো। একটু হাওয়া দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, অমনি তোর ঠান্ডা লেগে যাবে! চার প্রস্থ জামাকাপড় চাপিয়েছিস তো।' কৃষ্ণা বলল।

'আরে, আমার জন্যে বলছি না, শামুর জন্যে বলছি।' সোলাঙ্কী বান্ধবীর দাদার সামনে মানসম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করল।

অচিন্ত্য সাইকেলটা নিয়ে এগতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ কী যেন দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পলকে অচিন্ত্যর মুখ চোখ সাদা হয়ে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সোলাঙ্কী দেখল, নদীর অন্য পারে সাঁকোর থেকে একটু দূরে বছর কুড়ি-বাইশের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কালো, লম্বা, ছিপছিপে চেহারা; পরনে নীল জিন্স আর লাল-নীল পুলওভার। একটা মোটরবাইকের পাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটা এই পারে তাদেরই দেখছে।

কৃষ্ণা এসব কিছুই খেয়াল করেনি, উলটোদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সে জানাচ্ছিল, অচিন্ত্য কঙ্কালীতলা ঘুরে আসতে আসতে তারা এখানে না-ও থাকতে পারে।

অচিন্ত্য চকিতে সাইকেলটায় চেপে বসে বলল, 'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। কোপাই দেখা শেষ হলে তোরা ফিরে আসিস।'

'সে কী রে? তুই কঙ্কালীতলা যাবি না?' কৃষ্ণা অবাক গলায় বলল।

'না, আমার অন্য কাজ আছে।' অচিন্ত্য তড়িঘড়ি বাড়ির দিকে সাইকেল চালাল দ্রুতবেগে।

কৃষ্ণা হাঁ করে অচিন্ত্যর সাইকেলের উড়ান দেখেছিল। সোলাঙ্কী তার সোয়েটার ধরে টান দিল, নদীর অন্য পারের ছেলেটাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'ওটা কে রে?'

কৃষ্ণা প্রথমে পরিষ্কার দেখতে পেল না, তারপরে ভালো করে দেখে খুব অবাক হল। নদীর অন্য প্রান্তের যুবকটিও তার বাইকে স্টার্ট দিচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে-ও লাল ধুলো উড়িয়ে কঙ্কালীতলা গ্রামের দিকে চলে গেল। কৃষ্ণা খুব অবাক গলায় বলল, 'ও তো তৌফিকদা।'

দুই

উপাধ্যায়বাড়ির ভিতরের উঠোনটা বেশ বড়। ছোট ছোট লাল-কালো চৌখুপি করা শান-বাঁধানো বিশাল উঠোন। তার দুইদিকে বড় বড় উলটানো ‘এল’ শেপের বাড়ির দুটো অংশ। বাড়ির দুই প্রান্তের সঙ্গে সমকোণে উঠোনের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রয়েছে মা করুণাময়ীর মন্দির।

অনেকটা লাল-কালো উঠোনের পরে শ্বেতপাথরে বাঁধানো মন্দিরটা স্বাভাবিকভাবেই চোখে শীতল লাগে। উঠোনের পরে ছোট সরু বাঁধানো রাস্তা ঘুরে ঘুরে চলে গেছে আম-কাঁঠালের বাগানের মধ্যে। ওদিকে পুকুর আছে। পুকুর থেকে স্নান সেরে কৃষ্ণার মামিমা এইমাত্র উঠোনে জল-ছড়া দিতে দিতে ঘরে ঢুকেছেন। খিড়কি দরজা থেকে বাড়ির ভিতর বারান্দা অবধি জলের দাগ। সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা আলপনার জন্য চালগুঁড়ি মাখছিল। রঙিন আলপনা দেবে বলে হলুদ গুঁড়ো আর সিঁদুর মিশিয়ে আলাদা আলাদা করে রাখছিল। রটন্তীপুজোর কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। তিথি অনুসারে এবারে রটন্তীপুজোর অমাবস্যা পৌষসংক্রান্তির পরের দিনই পড়েছে।

উপাধ্যায়বাড়িতে মা করুণাময়ীর প্রাত্যহিক পুজোর জন্যে পুরোহিত থাকলেও রটন্তীপুজো বাড়ির পুরুষরাই করেন। আগে তারকনাথ নিজের হাতেই সম্পূর্ণ পুজো করতেন। কিন্তু কয়েক বছর এত দীর্ঘ সময়ের পুজোর চাপ নিতে পারেন না বলে বিমলচন্দ্র তাঁকে সাহায্য করেন। তবে এখনও সমস্ত বিধি মেনে রটন্তীপুজোর মাঝে কুমারীপুজোটা তিনি একা হাতেই করেন।

ছোটবেলায় লতা আর কৃষ্ণা কতবার কুমারী হয়েছে। নিজেকে বেশ ঠাকুর ঠাকুর লাগে, একগাদা জড়োয়া গয়না আর বেনারসি পরে। আলপনা দিতে দিতে কৃষ্ণা ছোটবেলার কুমারীপুজোর অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছিল।

‘কুমারীপুজো দুর্গাপুজোতে হয় না?’ সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ, তা তো হয়। তবে এ বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী রটন্তীপুজোর দিনেও কুমারীপুজো হয়।’

‘কত বছর বয়স অবধি কুমারী হওয়া যায়?’ সোলাঙ্কী সাগ্রহে জানতে চাইল।

‘তুই আর হতে পারবি না।’ কৃষ্ণা চালবাটা-মাখা হাত নাড়াল, পরক্ষণেই গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলল, ‘আমার মনে হয় পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে অবধি। তবে ঠিক জানি না।’

‘ধুস, আমি মোটেও ওইসব কুমারী-টুমারি হতে চাই না।’

‘আমি তোর কথা বলিনি। শামুর কথা বলছিলাম। ইন ফ্যাক্ট, দাদুই শামুর কথা বলছিল। আমি বলে দিয়েছি কোনও প্রবলেম নেই। কী রে?’ কৃষ্ণা ভ্রু নাচাল।

সোলাঙ্কী চালবাটা-মাখা হাত তুলে একটু অবাক গলায় বলল, ‘কিন্তু আমরা তো ব্রাহ্মণ নই। আমরা তো সরকার।’

‘ব্রাহ্মণ কুমারী হতে হবে, কে তোকে বলেছে? জানিস, বিবেকানন্দ বৈশ্য কুমারী পুজো করেছিলেন।’ বিজ্ঞের মতো জানাল কৃষ্ণা। ‘শামুর জন্যে শাড়ি-গয়না কিনে এনেছে দাদু। বিকেলে ওকে আমরা সাজিয়ে দেব।’

'একটা কথা ছিল কৃষ্ণা।' সোলাঙ্কী কৃষ্ণার কাছে সরে এল। কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'শামু আসলে ঠিক আমার বোন নয়।'

'মানে!?' কৃষ্ণা অবাক গলায় বলল।

'শামুকে গ্র্যানি ছোটবেলায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। ও ছোটবেলাটা গ্র্যানির কাছেই কাটিয়েছে। বছর তিনেক আগে শামুকে কলকাতার স্কুলে ভরতি করার সময় বাবা ওর সারনেমটা চেঞ্জ করে সরকার করেছে। নয়তো নানারকম প্রবলেম হচ্ছিল। বাইরের লোকেরা কেউই প্রায় আসল কথা জানে না। শামুর নাম ছিল শাম্ভবী ডি'সিলভা।' সোলাঙ্কী সামান্য অপরাধী গলায় জানাল।

'তোর গ্র্যানি! যিনি বছর দেড়েক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন? উনি কি তোর নিজের গ্র্যান্ডমা?' কৃষ্ণা বলল।

'না। ঠিক নিজের নয়। উনি হচ্ছেন আমার দাদুর পিসতুতো বোন। একটু দূরের রিলেশন। তবে মায়ের দিকের তো কেউই বেঁচে নেই, ওই এক গ্র্যানি ছাড়া।'

'হুঁ। বুঝলুম। তো অসুবিধেটা কীসের?'

'শামুকে কি কুমারী করা উচিত হবে? ও তো খ্রিস্টান।'

'ও আদৌ খ্রিস্টান কি না কে জানতে গেছে। কুড়িয়ে পেয়েছিল বলছিস তো। আর বাকি কথা চেপে যা। কাউকে বলার দরকার নেই। এই শেষ মুহূর্তে কুমারী খুঁজতে আবার কোথায় ছুটবে? বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন দোষ নেই, তেমনই কুমারী হলে জাতে দোষ নেই।' কৃষ্ণার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে সোলাঙ্কীর দোনামনা ভাবটা কেটে গেল। সে হেসে ফেলল।

সোলাঙ্কীর আর-একটা বড় দুশ্চিন্তা ছিল। শাম্ভবী যা ছটফটে মেয়ে, অতক্ষণ আদৌ চুপ করে বসে থাকবে তো এক জায়গায়! কিন্তু সোলাঙ্কীর সমস্ত দুশ্চিন্তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে শাম্ভবী দিব্যি চুপচাপ বসে রইল পিঁড়ির উপরে।

পুজোর শুরুতে তারকনাথ শাম্ভবীর পা ধুইয়ে-মুছিয়ে যত্ন করে আলতা পরিয়ে দিলেন। সোলাঙ্কী অবাক হয়ে দেখল, শাম্ভবী হাসল না পর্যন্ত, কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর মুখ করে দেখছে সবকিছু।

মাথায় লাল চেলি, বেনারসি আর সোনার গয়না, হাতে-গলায়-মাথায় ফুলের মুকুট, ফুলের মালা, পাতার মালা। মা করুণাময়ীর কোলের কাছে বসে-থাকা শাম্ভবীকে আরেক দেবীমূর্তির মতোই লাগছে। শত প্রদীপের আলোয় আর লাল চেলির ছায়ায় শাম্ভবীর তামার বরন রঙে এক অদ্ভুত রক্তাভা ফুটে উঠেছে।

কুমারীকে দেবীরূপে স্থাপনা করে একটা বিশাল মালা পরানো হল। ধুনোর ধোঁয়া, ঢাকের বাদ্যি, ঘন ঘন বেজে-ওঠা শাঁখের আওয়াজ, কর্পূরের গন্ধে শাম্ভবীর বুকের মধ্যে ক্রমে একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ছিল।

কৃষ্ণা একসময় সোলাঙ্কীর কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'শামুকে একদম অন্যরকম দেখতে লাগছে।'

সোলাঙ্কীও ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল। সত্যিই শাম্ভবীকে অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখতে লাগছিল। সে বেশ কিছু ফোটো তুলল পুজোর। এর আগে সে কুমারীপুজো

দেখেনি।

তারকনাথ স্বস্তিবাচন পাঠ করে ধ্যান শুরু করলেন, 'ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্য-সুন্দরীং বরবর্ণিনীম্... ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্...'

শাম্ভবীর যেন জ্বর আসছে, জ্বলে যাচ্ছে সারা শরীর। হাত-পা অবশ, কে যেন তার ঠোঁট চেপে ধরেছে, জিব টেনে ধরেছে। সে মুখ নাড়তে পারছে না, কথা বলতে পারছে না। কাঠের পুতুলের মতো একভাবে বসে আছে, ফেলতে পারছে না চোখের পাতা। অপলক তাকিয়ে আছে ঘটের দিকে। জেগে জেগেই সে যেন ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল অতল গহ্বরে।

একে একে সমস্ত নিয়ম মেনে ষোড়শোপচারে পুজো শুরু করলেন তারকনাথ। তাঁর ভরাট গলায় মন্ত্রপাঠ ধ্বনিত হচ্ছিল ক্ষুদ্র দেবালয়ে। তিনি রজত আসন অর্চনা করে পাঠ করলেন, 'ঐং হ্রীং শ্রীং হুং হেঁসায়ৈ ইদমাসনং কালসন্দর্ভায়ৈ কুমার্যৈ নমঃ...'

আচমকাই শাম্ভবীর গলার মালাটা দপ করে জ্বলে উঠল। লেলিহান শিখারা নেচে উঠল রক্তজবার মালা জুড়ে। সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আগুন আগুন!'

তিন

অচিন্ত্য দেখছিল, সকালের রোদ গাছের পাতার জাফরি ভেদ করে সবুজরঙা দরজাটায় নরম নকশা তৈরি করছে। দীর্ঘ নয় বছরের রোদ-জল-ঝড়ে দরজাটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও মুছে যায়নি দুটো হাতের ছাপ।

এতদিন হয়ে যাওয়ার পরেও এই ঘরটার সামনে এলে অচিন্ত্যর বুক ধড়ফড় করে, গায়ে কাঁটা দেয়। খুব ভয়ংকর কোনও দেবতার পুজো করার সময় যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে যায়। মানুষ প্রতিনিয়ত ভয় পায়, দেবতা এই বুঝি রুষ্ট হয়ে অভিসম্পাত দিলেন। তেমনই এই ঘরটার সামনে এলে অচিন্ত্যর মনের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশে যায় ভয়। তবু সে আসে। ভয় থেকেই আসে, নাকি শ্রদ্ধাবনত হয়ে— এ কথা সে নিজেও বলতে পারবে না। বাড়িতে থাকলে প্রায় প্রতিদিনই, মা করুণাময়ীর পায়ে মাথা নোয়ানোর মতো সে এই চৌকাঠেও একবার করে মাথা ছুঁইয়ে যায়।

কালকের ঘটনার পরে তাকে তো আসতেই হত। এই বাড়িতে কোনও অঘটন ঘটলেই তার মনে হয় ছাতের ঘরের দেবতাটি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বোধহয়। অচিন্ত্য রংচটা দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করল, ‘ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।’

প্রদীপ না, কিচ্ছু না, কাল যে কী করে শামুর গলার মালায় আগুন ধরে গেল, কেউ বুঝতেই পারেনি। অবশ্য এই বৃদ্ধ বয়সেও যে তারকনাথের উপস্থিতবুদ্ধি আর ক্ষিপ্রতা অন্যান্যদের থেকে বেশি, তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। সবাই যখন চিৎকার করতে ব্যস্ত, তখন খালি হাতেই জ্বলন্ত মালাটা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন শামুর গলা থেকে। পুজোর ঘট উলটে জল ঢেলে তক্ষুনি নিবিয়ে দিয়েছিলেন মালাটা।

অত হুলুস্থুলের মধ্যেও শাম্ভবী স্থির মূর্তির মতো বসে ছিল। এক উজ্জ্বল আভা বেরচ্ছিল ওর দেহ থেকে। সবাই দেখেছে সেটা গতকাল রাতে। অবশ্য তা এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসার মতো শাম্ভবী বলে উঠেছিল, ‘পুজো শেষ?’ আগুন, চেঁচামেচি কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করেনি।

‘দাদা, তুই এখানে? সবাই তোকে নিচে খুঁজে বেড়াচ্ছে।’ কৃষ্ণার গলার আওয়াজে অচিন্ত্য চমকে উঠল। অচিন্ত্যকে ছাতের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কৃষ্ণা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল তার কাছে। ‘দাদা। এই ঘরটা সেই থেকেই বন্ধ আছে?’

‘হ্যাঁ।’

কৃষ্ণা অচিন্ত্যর অন্যমনস্ক ভাবটা লক্ষ করল। অচিন্ত্য ছাতের পাঁচিলে হেলান দিয়ে ঘরটা দেখছিল। কৃষ্ণাও দেখল ঘরটাকে। এই ঘরে যে থাকত, তার নাম কেউ নেয় না এ বাড়িতে। এই ঘরে কেউ যে কখনও থাকত তা-ও মনে হয় না। শুধু দরজার পাল্লার উপরে ছোট ছোট দুটো হাতের ছাপ ঘরের মালিকের সাক্ষ্য দেয়।

কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, ‘তোকে টিউশনি করানোর সময় তৌফিকদা দু-একবার এসেছিল শুনেছি। দাদুর থেকে চাবি নিয়ে দরজাও খুলেছিল।’

‘হুঁ। সে তো আসবেই। তার যে প্রাণের বন্ধু ছিল।’

‘তা তুই সেদিন নদীর পারে তৌফিকদাকে দেখে অমন পালালি কেন রে?’ গতকাল রটন্তীপুজোর তোড়জোড়ে কোপাইয়ের ধারে অচিন্ত্যর অদ্ভুত ব্যবহার কৃষ্ণার মাথা থেকে

বেরিয়ে গিয়েছিল। আজকে আবার কথায় কথায় সেটা মনে পড়ে গেল।

অচিন্ত্য চমকে উঠল, 'কে বলল?'

'সালু দেখাল। নদীর ওপারে তৌফিকদা দাঁড়িয়ে ছিল। ও অবশ্য তৌফিকদাকে চেনে না। তা এত ভালো রেজাল্ট করেছিস মাধ্যমিকে, তৌফিকদা তো তোকে কোলে তুলে নাচবে।'

'বোকার মতো কথা বলিস না কৃষ্ণা। তৌফিকদা আমাদের থেকে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছিল। শুধু মাধ্যমিক নয়, ও উচ্চমাধ্যমিকেও স্ট্যান্ড করেছিল।'

'তৌফিকদা যে ব্রিলিয়ান্ট পিস তা সবাই জানে, কিন্তু তোর কী হল, তুই পালালি কেন? ভয় তো আমরা পাব তৌফিকদাকে, আমার মতো সিক্সটি পার্সেন্ট পেয়ে পাশ-করা পার্টি। একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেও ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারব না।'

'সে আমিও পারব না।' বিড়বিড় করে বলল অচিন্ত্য, তারপরে গলা তুলে বলল, 'আমি তো দেখিনি তৌফিকদাকে। আমার হঠাৎ পেট ব্যথা করছিল, তাই চলে এলাম।'

'ও তা-ই বল্। আমি ভাবলুম, তৌফিকদা বোধহয় আশা করেছিল, তুই ফার্স্ট হবি। তার বদলে এইটিন্থ হয়েছিস। তোকে হয়তো পেটানোর জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

কৃষ্ণার ঠোঁটে মিচকি হাসিটা অচিন্ত্য খেয়ালই করল না। সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

'পেটাবে বলেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছে...' অচিন্ত্য আবারও বিড়বিড় করল।

কৃষ্ণা ঠিক শুনতে পেল না অচিন্ত্যর কথাগুলো, সে কাজের কথায় ঢুকে পড়ল, 'মাধ্যমিকের কথায় মনে পড়ে গেল, আমাকে যাবতীয় নোটসের খাতা দিবি। তৌফিকদাকে তো টিচার হিসাবে পাব না। ওই নোটস পড়েই যা উদ্ধার হয়। মা বারবার করে বলে দিয়েছে এবারে সমস্ত নোটের খাতা নিয়ে যেতে।'

'মাধ্যমিকের নোটসের খাতা কিন্তু প্রচুর। অঙ্কগুলো বাদ দিলে প্রায় খান কুড়ি তো হবেই।' অচিন্ত্য জানাল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কৃষ্ণা বলল, 'হ্যাঁ রে, নোটের পাতা ধুয়ে জল খেলে ফার্স্ট ডিভিশন পাব না?'

'তা পেতে পারিস। সিদ্ধপুরুষ প্রেরিত নোটস বলে কথা। পাতা ধুয়ে জল খেলেও হয়তো নম্বর পাওয়া যাবে। ওই চৌকাঠ থেকে ধুলো তুলে নিয়ে যা। জলে গুলে খেলে ওতেও ভালো নাম্বার পেয়ে যাবি হয়তো।'

'কেন রে? মাধ্যমিকের নম্বরের সঙ্গে ওর কী?' কৃষ্ণা অবাক হল, 'বলিস তো তৌফিকদার পায়ের ধুলো জলে গুলে আগামী বছরটা সকাল-বিকেল খাব না হয়।'

'অরিজিনাল নোটস তো আর তৌফিকদার নয়। অরিজিনাল নোটস তো ছিল তাঁর।'

'কার?' কৃষ্ণা একটু অবাক হল। অচিন্ত্য ইঙ্গিত করল ছাতের ঘরটার দিকে। কৃষ্ণার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'কী যা-তা বলছিস তুই?'

'যা-তা কেন হবে? সত্যি কথা। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের গল্প ছেড়েই দিলাম। তৌফিকদা আইএসআই ক্র্যাক করে ফেলল। কলকাতার বড় বড় প্রফেসরের কাছে পড়েও আইএসআই-এর ম্যাথস ট্রিকস শিখতে মানুষের জীবন বেরিয়ে যায়। আর তৌফিকদা এই এঁদো গ্রামে বসেই সব জেনে গেল। অবাক লাগে না?'

‘অবাক তো নিশ্চয়ই লাগে। তবে তৌফিকদার আমলে আমরা আরও ছোট ছিলাম, অত মাথা ঘামাতুম না। ভেবেছিলাম ভালো টিচার আছে তোদের স্কুলে। আর ব্রিলিয়ান্ট ছেলে।’

‘ব্রিলিয়ান্ট তো বটেই। খাটতও খুব। টিচাররাও কিছু কিছু সাহায্য করেছিল, তবু গুরু বিনা সিদ্ধিলাভ কারওই হয় না। তৌফিকদাকে সে সমস্ত কিছু দিয়ে গিয়েছিল। গাদা গাদা ট্রিকস, নোটস, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সব।’

‘তুই পাগল। সে যখন চলে গেছে, তার বয়স খুব বেশি হলে শাম্ভবীর মতো। আট-নয় বছর। ওই বয়সে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের নোটস! বিস্ট্যাটের ম্যাথস ট্রিকস! অসম্ভব!’

‘হ্যাঁ। আমি নিজে খাতা দেখেছি তৌফিকদার কাছে। অসম্ভব জিনিয়াস, পাগল। খাতাগুলো দেখলে তোর মনে হবে মধ্যযুগের কোনও এক বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা সব নিয়ে চর্চা করে, তার পাগলামি টুকরো টুকরো করে লিখে রেখেছে। এই ধর্ মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বিবরণী লিখছে, চারটে প্যারাগ্রাফ লেখার পরে শনি গ্রহ কোন অ্যাঙ্গলে সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তার কিছু জটিল অঙ্ক কষা। মোগলের পতনের বাকি কারণগুলো খুঁজে পাওয়া গেল হয়তো দশ পাতা পরে। তৌফিকদার ধৈর্য ছিল, অধ্যবসায় ছিল, আর প্রাণের বন্ধুর টানও ছিল; বসে বসে ওই গোলকধাঁধার থেকে উদ্ধার করেছে নোটসগুলো।’ সামান্য থেমে অচিন্ত্য বলল, ‘তৌফিকদা বলে, সে নাকি প্রডিজি ছিল।’

কৃষ্ণার ভারী অদ্ভুত লাগছিল। সবাই জানে এই ছাতের ঘরের ছেলেটা অপয়া ছিল, শয়তান ছিল, খুনেও ছিল; কিন্তু সে নাকি প্রডিজি ছিল!

চার

বিকেলবেলা কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিল। অন্যান্য দিন এই সময়ে তারা মোবাইলে খুচখাচ ছবিও তোলে। কিন্তু কালকের ঘটনার পর থেকে সোলাঙ্কী একটু বিমর্ষ হয়ে আছে।

একসময় কৃষ্ণা বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখল। 'হ্যাঁ রে! কাল তুই ভয় পেয়ে গিয়েছিলি, না?'

'আগুনের কথা বলছিস? ও ঠিক আছে। অমন তো হতেই পারে। আচ্ছা, কালসন্দর্ভা মানে কী? সেই সময় দাদু বলছিলেন কী একটা মন্ত্র। হ্রীং ক্রীং কালসন্দর্ভা ইং মিং...' সোলাঙ্কী হেসে উঠল।

কৃষ্ণার মনের কিন্তু কিন্তু ভাবটা কেটে গেল, সে-ও হেসে ফেলল, 'এটা আমি জানি। তবে সংস্কৃত মন্ত্রের মানে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। কালসন্দর্ভা হল গিয়ে তোর, একটা বিশেষ বয়সি কুমারীর নাম। আমি যত দূর জানি, ষোলো বছর বয়স অবধি কুমারীদের আলাদা আলাদা নাম হয়। প্রথম বছরের কুমারীর নাম হয় সন্ধ্যা, দ্বিতীয় বছরে সরস্বতী, তারপরে ত্রিধামূর্তি, কালিকা... এরকম তোর, নয় বছরের কুমারীকে বলে কালসন্দর্ভা। আর তুইই তো বলেছিলি শামুর বয়স এইট প্লাস।'

কথাগুলো বলে কৃষ্ণা এদিক-ওদিক তাকাল। 'হ্যাঁ রে, কুমারীদেবী গেলেন কোথায়?'

'ওই তো, নিচের বাগানে দাদুর সঙ্গে খেলা করছে। এখানে এসে তো ঘরে থাকতেই চায় না। হাতির পাঁচ পা দেখেছে।' সোলাঙ্কী ভেংচি কাটল।

'হাতি নয় রে গাধা। ওটা সাপের পাঁচ পা। তোর বাংলার কী হাল!' কৃষ্ণা একবার নিচের বাগানে উঁকি দিয়ে দেখল।

সোলাঙ্কীও উঁকি দিল।

উপাধ্যায়বাড়ির সামনের বাগানে লাল সুরকির রাস্তা। তার এক ধারে দুটো গাড়ি। একটা উপাধ্যায়দের, অন্যটা সোলাঙ্কীদের। তাদের ড্রাইভার বিশুকাকু বালতি করে জল দিয়ে গাড়িটা ধুচ্ছে।

এই গাড়ির সূত্রেই সোলাঙ্কীদের সঙ্গে কৃষ্ণাদের আলাপ। প্রায় বছরখানেক আগে, শাম্ভবী আর সোলাঙ্কী গাড়িতে করে স্কুল যাচ্ছিল। তখন তাদের অন্য ড্রাইভার ছিল। হঠাৎ কী হল, সোজা সামনের গাড়িতে গিয়ে ঠুকে দিল সেই ড্রাইভারকাকু। সামনের গাড়িটা চালাচ্ছিলেন কৃষ্ণার বাবা।

কৃষ্ণার বাবা ডাক্তার। অ্যাক্সিডেন্টের পরে তিনিই প্রাথমিক চিকিৎসা করে দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে বাড়িতে ফোন করে খবরও দিয়েছিলেন। সেই থেকে সম্পর্ক বাড়তে বাড়তে একদম গলায় গলায়। আগের পুরানো ড্রাইভারকে বরখাস্ত করে নতুন ড্রাইভার বিশুকে রাখা হয়েছে। বিশু মোটামুটি ভালোই গাড়ি চালায়। বিশ্বাসীও।

সোলাঙ্কী দেখছিল, বাগানের ছায়ার মধ্যে একটা বিশাল আরামকেদারা পেতে তারকনাথ কী যেন একটা বই পড়ছে। তার চারধারে আগের দিনের মতোই প্রজাপতি ধরার জাল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে শাম্ভবী।

ওই অ্যাক্সিডেন্টের সময় উলটোদিকের গাড়িতে তারকনাথও ছিলেন। বৃদ্ধ মানুষ, বেজায় জবুথবু হয়ে পড়েছিলেন ওরকম আচমকা ঘটনায়। তখন সেইভাবে পরিচয় হয়নি, পরে কৃষ্ণাদের বাড়িতে আলাপ হয় দাদুর সঙ্গে। কৃষ্ণার মতো তারাও তারকনাথকে দাদু বলেই ডাকে।

দাদু বেশ মজার মানুষ। গল্পও জানেন অনেক। অন্ত্যাক্ষরি খেলার সময় দিব্যি হেঁড়ে গলায় স্বরচিত কবিতাতে সুর দিয়ে গেয়ে যান।

দাদুর গানের কথা মনে পড়তেই সোলাঙ্কী হেসে ফেলল। কালকের ঘটনার ছায়া তার মন থেকে একেবারেই সরে গেছে।

শাম্ভবী অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করে একটাও প্রজাপতি না ধরতে পেরে বেজায় রেগে গেল। সকালে দাদু বলেছিল, দোলনা টাঙিয়ে দেবে গাছের ডালে। তারও কোনও বন্দোবস্ত করেনি। এখন বই পড়ছে। খানিক রাগে, খানিক অভিমানে সে বিশাল কালো গেটটা পেরিয়ে বাইরের পাতা-ঝরা নেড়া গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। তার খুব দুঃখ হয়েছে। একটু একটু কান্না পাচ্ছে।

গেটের সামনে লাল কাঁকুরে রাস্তাটার পূর্বদিকে মরশুমি ফসলের সুবিশাল সবুজ গালিচা চলে গেছে শীতকালে পাথরসার কোপাই নদী পর্যন্ত। নদী পেরলেই কঙ্কালীতলা। ওখানে একটা জাগ্রত মন্দির আছে। প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। শাম্ভবী কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। সে অনুভব করল শীতের আবিলতা, পড়ন্ত সূর্যের নিস্তেজ আলো, মাঠ ভরতি সবুজ ধান গাছ ঠেলে এক তীব্র প্রাণকাড়া আকুতি বারংবার ছুটে আসছে তার কাছে। এসো মা, জাগ মা, রক্ষা কর!

'অলখনিরঞ্জন'

হেঁড়ে গলার বিকট চিৎকারে শাম্ভবী প্রায় লাফিয়ে উঠল। গাছতলায় একটা সাধু এসে দাঁড়িয়েছে। লম্বা, কালো কৌপীন পরিহিত এক সাধু। বটের ঝুরির মতো জটা নেমে এসেছে মাথা থেকে। সারা গায়ে ছাই মাখা। কপালে বিশাল ত্রিপুণ্ড্রক। হাতে একটা বিশাল চিমটে। কিন্তু শাম্ভবী এসব কিছু দেখল না। সে দেখল সাধুর চোখ দুটো। ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে, শাম্ভবীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। শুধু চোখ দিয়েই যেন সাধুটা তাকে খেয়ে নেবে।

পিছনে ফিরে শাম্ভবী দেখল গেটের সামনে দরোয়ানকাকু নেই, গাড়ির কাছে বিশুকাকুও নেই। সে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে এসে গেটের ভিতরে ঢুকে দাঁড়াল। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে কচ্ছপের মতো মুণ্ডু বার করে বলল, 'কী চাই?'

সাধুটা যেন শাম্ভবীর কথা শুনতেই পেল না। সে বিড়বিড় করে বলল, 'কে তুই?'

শাম্ভবী একবার পিছন ফিরে দেখল। বারান্দায় আরামকেদারায় বসা তারকনাথ হাতের বইটা মুড়ে রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সে বেশ সাহস পেয়ে উলটে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

সাধুটা লোভাতুর চোখে শাম্ভবীকে দেখতে দেখতে বিড়বিড় করছিল। 'ভারী সুলক্ষণা। অষ্টক মহাভৈরবী গুণসম্পন্না! নবমবর্ষীয়া। সাধনসঙ্গিনী হবার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত।'

শাম্ভবী আর সাহস পেল না। সে উলটোদিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদু। ও দাদু।'

অবশ্য শাম্ভবী ডাকার আগেই তারকনাথ উঠে এসেছেন। তিনি এসে সাধুটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই মহারাজ?'

সাধু এবার অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বরে বলল, 'অলখনিরঞ্জন।'

তারকনাথ একবার সাধুটাকে কড়া চোখে দেখলেন। তারপর শাম্ভবীকে বললেন, 'বাড়ির ভিতরে গিয়ে অচিন্ত্যর মাকে অথবা বামুনপিসিকে বল তো একটা সিধে পাঠিয়ে দিতে।'

'কী?' শাম্ভবী 'সিধে' কথাটা বোঝেনি।

'সিধে। সিধে। আচ্ছা চল। আমিই যাচ্ছি। আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তারকনাথ শাম্ভবীকে নিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে রওনা দিলেন।

যেতে যেতে শাম্ভবী একবার পিছন ফিরে তাকাল। সাধুটা কেমন হায়নার মতো জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

অন্ধকার নেমে আসছিল সর্বানন্দপুরের উপাধ্যায়বাড়ি ঘিরে।

পাঁচ

'যা-ই বল সোলাঙ্কী— তোমার আর তোমার বোনের মধ্যে কোনও মিল নেই।' জয়ন্ত বলল।

জয়ন্ত লতার স্বামী। সাতাশ-আটাশ বছর বয়স। গড়পড়তা বাঙালি চেহারা। উচ্চতা বেশি নয়, তবে বেশ ফরসা। গৌহাটিতে একটা প্রাইভেট কলেজে ইতিহাস পড়ায়। গত বছর বোলপুরে একটা কনফারেন্সে এসেছিল সে। কী একটা অনুষ্ঠানের জন্য রুপোর জিনিস কিনতে বিমলচন্দ্রর দোকানে গিয়েছিল, সেখানেই আলাপ অচিন্ত্যর বাবার সঙ্গে। তারপরে এ কথা-সে কথা, এবং শেষমেশ বিবাহ প্রস্তাব। অবশ্য বিয়ের আগে কৃষ্ণার দাদু খুঁটিয়ে কোষ্ঠীবিচার করে নিয়েছিলেন নাতজামাইয়ের।

লতা আর জয়ন্ত গতকাল রাত্তিরে এসে পৌঁছেছে সর্বানন্দপুরে। পৌষসংক্রান্তির তিন দিন পরে। বোলপুর স্টেশনে তাদেরকে আনতে গিয়েছিলেন বিমলচন্দ্র আর তারকনাথ। আজ সকাল থেকেই জামাইবাবুকে ঘিরে শ্যালক-শ্যালিকাদের আসর বসেছে।

জয়ন্ত রীতিমতো আধুনিকমনস্ক ছেলে। শুরুতে বিয়ের সময়ের সেই কোষ্ঠী মেলানোর কথা নিয়েই হাসাহাসি হচ্ছিল। তারপরে গল্পগুলো ক্রমশ অলৌকিকের দিকে ঘুরে যায়। তারপর অচিন্ত্য যখন রটন্তীপুজোর দিন মালাতে আগুন লেগে যাওয়ার গল্পটা শোনাল বেশ চোখ গোল গোল করে, তখন সেই কথার সূত্রে সহজভাবেই জয়ন্ত নিজের বিস্ময়টা জাহির করে ফেলল, 'তোমাদের দুই বোনের মধ্যে মিল নেই এতটুকু।'

সোলাঙ্কী জয়ন্তর কথায় সামান্য একটু অস্বস্তি নিয়ে হাসল। সে একটু ছোটখাটো, পুতুল পুতুল নিটোল গড়ন দেহ, ফরসা হাত-পা, সুন্দর মুখশ্রী।

শাম্ভবী ঠিক উলটো, প্রায় বছর সাতেকের ছোট হওয়া সত্ত্বেও এখনই তার মাথা দিদির কাঁধের কাছে পৌঁছে গেছে। লম্বা লম্বা কাঠির মতন হাত-পা আর সমান দেহকাণ্ড নিয়ে সে যেন সবসময় কালবৈশাখীর ঝড়। সব থেকে বড় কথা, শাম্ভবীর গায়ের রং অদ্ভুত লালচে, তার চুলও সামান্য রক্তাভাবিশিষ্ট, চোখের মণিও লালচে মধুরঙা। এই বিশেষত্বের জন্যেই শাম্ভবী সবার আগে নজরে পড়ে অনেকের মধ্যেই।

দুই বোনের মধ্যে এই অমিলটুকু সবাই লক্ষ করে। কৃষ্ণা ছাড়া এখনও এই বাড়ির কাউকে আসল কথাটা বলেনি সোলাঙ্কী। বিশেষ করে রটন্তীপুজোর দিন যা ঘটেছে, তাতে শাম্ভবীর আসল পরিচয় জানানোর সদিচ্ছা আর সোলাঙ্কীর নেই।

সোলাঙ্কীর অপ্রস্তুত ভাবটা লক্ষ করেই কৃষ্ণা কথা ঘোরাতে অন্য প্রশ্ন করল, 'জয়ন্তদা, সত্যি কি ভূতপ্রেত হয়? অথবা এইসব বাণ-মারাটারা। তোমার কী মত?' কৃষ্ণা জয়ন্তকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

জয়ন্ত হেসে উঠল। 'দেখ, অনেকেই বিশ্বাস করে। আমি সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে ভূতপ্রেত আমি দেখিনি কখনও। আমাদের সনাতন বিশ্বাসে ভয় বলে একটা ব্যাপার আছে। আমরা অনেক কিছুকেই বড় ভয় করে চলি। এগুলো হয়তো তার থেকেই তৈরি হয়েছে।'

'তবে বশীকরণ ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি।' অচিন্ত্য বলল।

'বশীকরণ আবার কী? তোর যত ভুলভাল কথা। যা হিপনোটিজম, তা-ই বশীকরণ।' কৃষ্ণা যুক্তি স্থাপন করল।

'না কৃষ্ণা। এখানে একটা বেসিক পার্থক্য আছে।' জয়ন্ত বলল।

‘কীরকম?’ অচিন্ত্য হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল।

‘হিপনোটিজমকে সায়েন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা করা যায়। হিপনোটিজম করলে একটা মানুষকে দিয়ে সেই সমস্ত কাজই করানো যায়, যা সে করতে চায়। মানে তোমার মনের মধ্যে কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে আগ্রহ আছে। যেমন ধর আপেল খাওয়া। হিপনোটিজম করে একটা কাঠের বলকে আপেলের মতো তোমার হাতে ধরালে তুমি সেটা খেতে চাইবে। কিন্তু তুমি ধর কিছু কাজ করতে চাইছ না। যেমন, মানুষ খুন। তুমি কোনও দিনও একটা সাধারণ মানুষকে খুন করতে চাও না। সে ক্ষেত্রে কিন্তু হিপনোটিজম করে তাকে দিয়ে মানুষ খুন করানো যাবে না। সেটা সম্ভব নয়।’ জয়ন্ত জানাল।

‘আর বশীকরণ?’ সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

‘তন্ত্রমতে বশীকরণের ক্ষেত্রে বলা হয়, মানুষটা তোমার হাতের পুতুল হয়ে যাবে। তুমি তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করাতে পারবে। খুনটুন সবকিছু।’ জয়ন্ত বলল।

অচিন্ত্য লাফিয়ে উঠল, ‘হ্যাঁ, ঠিক। ওই জন্যই তো বশীকরণ এত ভয়ানক। শঙ্খ-লাগা সাপের তলায় কাপড় রেখে সেই কাপড়কে যদি তাবিজ করে পরা যায়, তবে আর কেউ বশীকরণ করতে পারে না।’

কৃষ্ণা বড় করে ভেংচি কাটল, ‘তুই পরিস সেই তাবিজ।’

‘আরে আরে, ঝগড়া নয়। তোমাদের একটা ভূত ঝাড়ানোর গল্প বলি। আমার মাসিবাড়িতে একবার একটা ওঝা এসেছিল...’ জয়ন্ত গল্প শুরু করল।

জয়ন্তর গল্প শুনতে শুনতে কৃষ্ণা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। লতাদির বিয়েটা এত তাড়াহুড়ো করে হয়েছিল যে কৃষ্ণারা আসতেই পারেনি বিয়েতে। তারপরে তো লতাদি গৌহাটিই চলে গেল। জয়ন্তদার সঙ্গে দেখা হয়নি, আলাপও হয়নি। লতার বিয়ে হয়েছে প্রায় ছয় মাস হল। বিয়ের পরে এই প্রথম সে বাপের বাড়ি এল। লতাকে দেখে বাড়ির সবাই অবাক হয়ে গেছে। তার বাচ্চা হবে। কৃষ্ণা ভাবছিল লতাদিটা একদম যা-তা। সবে বিয়ে হয়েছে, কোথায় একটু আনন্দ করবে, মজা করবে, এদিক-ওদিক ঘুরতে যাবে। তা নয়, আগেই পেট বাঁধিয়ে বসে আছে। আরে, বাচ্চা নেওয়ার দিন কি ফুরিয়ে যাচ্ছে নাকি?

সমবেত হাসির হররায় কৃষ্ণা চমকে উঠল। জয়ন্তর গল্প শেষ হয়ে গেছে। সবাই হেসে কুটোপাটি হচ্ছে।

‘উফ। সাহস আছে তোমার। এরকম কত ভণ্ডামি ধরেছ তুমি?’ জিজ্ঞাসা করল অচিন্ত্য।

‘আসলে কী ব্যাপার জান তো, ওটা কোনও সাহসের ব্যাপারই নয়। এই থার্ড ক্লাস ভণ্ডগুলোর মোটেও কোনও ক্ষমতা থাকে না। শুধুই লোক ঠকিয়ে খাওয়া। একবার লোকের সামনে এদের মুখোশ ছিঁড়ে দিলেই দেখবে, এরা তোমার পায়ে পড়ে গেছে। এদের পাল্লায় পড়ে কত লোকে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় বল তো।’ জয়ন্ত কয়েকটা মৌরি দানা দাঁতে কাটতে কাটতে বলল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, ‘সকালে কোথায় গেছিলি রে দাদা?’

‘রাখালেশ্বর গেছিলাম। দিদির এইরকম সময়, তাই মা বলল রাখালেশ্বরের রক্তমাটির একটা তাবিজ...’

‘রক্তমাটি? সেটা আবার কী?’ সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

‘আরে, সে এক অলৌকিক ব্যাপার। এই রাখালেশ্বরে একটা খুব জাগ্রত শিব মন্দির আছে। প্রতি বছর গাজনের মেলাও বসে। কয়েক মাস আগে ওইখানে নদীর চড়ায় এক দৈবী ঘটনা ঘটেছে। অমাবস্যার পরের দিন সবাই দেখে, একটা বিশাল বৃত্ত হয়ে মাটি রক্তে ভিজে গেছে। প্রথমে তো সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছিল। শিবের অনুচররা বুঝি পাতাল থেকে উঠে আসছে। কিন্তু তারপর রটে গেল, ওই মাটি তাবিজ করে পরলে কোনও অশুভ কিছু ছুঁতে পারে না কাউকে। এমনকী সমস্ত রোগ-অসুখও সেরে যায়। এখন তো সেই মাটি নিয়ে এইসা কাড়াকাড়ি। পুরো কুয়োর মতো গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। এখন মাটি নেই আর। জল উঠছে। আমি ফালতু ফালতু গেলাম।’ অচিন্ত্য গোমড়া মুখে জানাল।

জয়ন্ত হেসে বলল, ‘ওই মাটি খেয়ে বা পরে কারও ক্যানসার বা থ্যালাসেমিয়া সেরে গেছে বলে তুমি দেখেছ?’

অচিন্ত্য গম্ভীর মুখ করে বাইরের গাছপালা দেখতে লাগল। কৃষ্ণার হঠাৎ খুব হাসি পেল। মামা-মামির ঠাকুর-দেবতায় বিশাল ভক্তি, সেখানে জামাই একেবারে উলটো।

***

মন্দিরের সামনে আরামকেদারায় আধশোয়া হয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন তারক- নাথ। নাতি, নাতনি আর নাতজামাইয়ের খুনসুটি শুনতে শুনতে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। মনে মনে ভাবছিলেন অন্য কথা। এক টুকরো দুশ্চিন্তার মেঘ তাঁর মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছে বারেবারে।

বোলপুর স্টেশন থেকে নাতনি আর নাতজামাইকে নিয়ে ফেরার সময় তিনি তৌফিককে দেখেছেন। তিনি আর জয়ন্ত গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। বাকিরা গাড়ির মধ্যেই বসে ছিল। তিনি স্পষ্ট দেখেছেন তৌফিক রাস্তার উলটোদিকে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটা তাহলে গ্রামে ফিরে এসেছে। লতা যে বাপের বাড়ি এসেছে, সেটাও ওই ছেলে দেখেছে। ভিতরে ভিতরে বড়ই অস্বস্তি বোধ করলেন তারকনাথ। ছেলেটার উপরে নজর রাখা প্রয়োজন। লতাকেও সাবধান করা দরকার। ওই ছেলেকে তাঁর বিশ্বাস নেই।

শাম্ভবী অনেকক্ষণ ধরেই মন্দিরের সাদা সিঁড়ির ধাপগুলোতে কীসব আঁকিবুকি কাটছিল। কেউ বিশেষ লক্ষ করেনি। সোলাঙ্কীরই প্রথম চোখে পড়ল। সে তেড়ে গিয়ে কান ধরে তুলে আনল বোনকে।

‘ইস্, কী কাণ্ড করেছে দেখ্ কৃষ্ণা। সিঁদুরে সিঁদুরে ছয়লাপ করেছে একেবারে। জামাকাপড় সব মাখিয়েছে।’ সোলাঙ্কী একটা চড়ই বসিয়ে দিত। তারকনাথ আটকালেন।

‘আরে আরে। কী হয়েছে তাতে? ছেলেমানুষ।’

কৃষ্ণা উঠে এল, ‘এটা কী লিখেছে শামু?’

এবার বাকিরাও উঠে এল। সত্যি, সাদা সিঁড়ির চারটে ধাপের প্রত্যেকটাতে শাম্ভবী সিঁদুর দিয়ে কী যেন একটা নাম লিখেছে। পাশে আবার পা এঁকেছে। মানুষের পা নয়, শুভ

অনুষ্ঠানে যেমন লক্ষ্মীর পা তা-ও নয়, কাকের পায়ের ছাপের মতো। পায়ের ছাপটা সোজা উঠে গেছে মন্দিরের দিকে।

জয়ন্তই বানান করে পড়ল লেখাটা, '৺দি-ক-ক-র-বা-সি-নী'

'দিক্করবাসিনী? সেটা আবার কী?' কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

'কোনও ঠাকুর নাকি? ৺ তো ঠাকুরের নামের আগেই বসে।' অচিন্ত্য শুকনো মুখে জিজ্ঞাসা করল।

'কে এই দিক্করবাসিনী? এরকম কোনও দেবীর কথা তো শুনিনি কখনও। এই শামু, এই নামটা কোথায় পেলি?' সোলাঙ্কী শাম্ভবীকে ধরে একটা ঝাঁকানি দিল। শাম্ভবী সিঁদুর-মাখা মুখ নিয়ে ঘাড় নাড়ল। সে জানে না।

'দাদু, তুমি শুনেছ?' কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

তারকনাথও দেখছিলেন লেখাটা। তিনিও ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'উঁহু। আগে জল এনে পরিষ্কার করে দে। সুরমা বা বিমু দেখতে পেলে এখুনি চেঁচামেচি করবে।'

কৃষ্ণা দাদুর কথায় পাত্তা দিল না। নামটা খুব অদ্ভুত, তার বেশ আগ্রহ হয়েছে। সে বলল, 'দাঁড়াও, গুগ্‌ল দেখি।'

'৺দিক্করবাসিনী অসমের এক প্রাচীন দেবী।' জয়ন্ত আচমকা বলে উঠল।

'রিয়েলি? তুমি জান নামটা?' কৃষ্ণা বলে উঠল।

'হ্যাঁ। শুধু নামই নয়, প্রচুর গল্পও আছে এই দেবীকে ঘিরে।'

কৃষ্ণা আরও আগ্রহী হয়ে উঠল। এক অজানা দেবী, তারও আবার গল্প আছে। কিন্তু তারকনাথ তাড়া দিল, আগে চাতাল পরিষ্কার কর। সোলাঙ্কীও শাম্ভবীকে টেনে নিয়ে গেল হাত-মুখ ধোয়াতে।

ছয়

আবার আসর বসল ঠিক সন্ধের সময়। জয়ন্ত গল্প বলতে শুরু করল—

'গৌহাটি থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে, অসমের একেবারে পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মপুত্রের এক উপনদী হল দিকরং। দিকরং নদীর তীরে দেবীর থান। তাই নাম দিক্করবাসিনী। আবার স্থানীয় ভাষায় দিক্কর মানে শিব, সেই অর্থে এই দেবী স্বয়ং শক্তিস্বরূপিণী।

পুরাণে বলে, দেবী দিক্করবাসিনী ছিলেন মহারূপা। তিনি স্বর্গ ও নরক উভয় স্থানেই পূজিত হতেন। দেবী এবং পিশাচী দুই রূপই ছিল তাঁর অঙ্গে। এক হাতে উদ্যত খড়্গ, তো অন্য হাতে বরাভয়। এক হাতে নরকরোটি, অন্য হাতে লাস্যমুদ্রা। দেবী দাঁড়িয়ে থাকেন একজোড়া মৈথুনরত শবদেহের উপরে, যা একাধারে জন্ম ও অন্যদিকে মৃত্যুর প্রতীক। এই ভয়ংকর সুন্দর দেবীর দুই রূপ, ললিতকান্তা এবং তীক্ষ্ণকান্তা।

মহাভারতের যুগে অসুররাজ নরকাসুর দেবী দিক্করবাসিনীর সঙ্গে চাতুরী করে তাঁর ললিতকান্তা রূপটি চুরি করে স্থাপন করে কামাখ্যা পাহাড়ে। সেই থেকে কামাখ্যাদেবীর জন্ম। অন্যদিকে ললিতকান্তা লাস্যরূপ হারিয়ে দেবী দিক্করবাসিনী হয়ে উঠলেন ভয়ংকরী তীক্ষ্ণকান্তা।

সেই প্রথম দেবী পৃথিবীর মাটিতে পাঠান তাঁর সন্তানদের। পাতাল থেকে উঠে আসে দেবীর সন্তানরা। ভয়ংকর রৌম্যপিশাচের দল। তাদের অত্যাচারে কামরূপ প্রদেশ নরকে পরিণত হয়। তখনই কামরূপ প্রদেশের নাম হয়ে যায় নরক রাজ্য। হাজার বছর নরকভোগের পরে এই রাজ্যের শেষ রাজা ভগদত্তের হাহাকারে ভগবান বিষ্ণুর আসন টলে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে বাসুদেব কৃষ্ণ অবতারে তিনি আহ্বান জানান রৌম্যকুলকে। কুরুক্ষেত্রের আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য আর কয়েক লাখ হাতি-ঘোড়ার শবদেহের মাংসে পেট ভরিয়ে রৌম্যপিশাচের দল শান্ত হয়। সন্তানদের পেট ভরেছে দেখে দেবী দিক্করবাসিনী প্রীত হয়ে রৌম্যদের পাতালে ফিরিয়ে নেন।

এই হল পুরাণের গল্প। আজও নদী-পাহাড়-অরণ্য-ঘেরা ওই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা দেবী দিক্করবাসিনীকে অসম্ভব ভয় করে চলে।' জয়ন্ত থামল।

টেবিলের উপরে জড়ো হয়েছে ফাঁকা চায়ের কাপ আর বাটিতে মুড়ি-তেলেভাজার ভুক্তাবশেষ। জয়ন্তকে প্রায় ঘিরে ধরে গল্প শুনছিল সবাই। একটা ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ল গল্পের শেষে।

জয়ন্ত থামতে অচিন্ত্য বলে উঠল, 'উফ, এ তো বিশাল গল্প!'

'বাহ্, তুমি তো অনেক পৌরাণিক কথা জান নাতজামাই!' প্রশংসার সুরে বললেন তারকনাথ। জয়ন্ত হাসি হাসি মুখে মাথা নিচু করল।

'এটা তো পৌরাণিক গল্প। ইতিহাস কিছু নেই?' কৃষ্ণা একটু হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই আছে।' জয়ন্ত প্লেট থেকে একটা তেলেভাজা তুলে নিতে নিতে জানাল।

'ইতিহাসটা বল।'

'শদিয়ার কাছে দিকরং নদীর ধারে এই দেবীর পাথরের তৈরি মন্দিরের ভিত্তি পাওয়া গেছে। সেখানে দেবীকে তাম্রেশ্বরী বা তামারমায়ী নামে ডাকা হয়। আন্দাজ করা হয় যে মন্দিরের ছাত হয়তো কখনও তামার তৈরি ছিল। তাই তামারমায়ী নাম হয়েছে।

প্রায় খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে এই দেবী ছিলেন অসমের সুতিয়া গোষ্ঠীর আরাধ্যা। তখন অসমে অনেক ছোট ছোট আদিবাসী গোষ্ঠী ছিল। সুতিয়ারাও তাদের মধ্যে একটা। ক্রমে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠল। বারোশো শতাব্দী নাগাদ অন্য গোষ্ঠীগুলোকে পরাস্ত করে তারাই হয়ে উঠল সর্বেসর্বা।

বলা হয়, তাদের আরাধ্যা দেবী দিক্করবাসিনীর জন্যেই তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই দেবীর পুজো সাধারণ ছিল না। দেবী দিক্করবাসিনী নাকি সদাসর্বদা রক্তস্নাতা। সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন পশুপাখির রক্তে দেবীর পুজো করার পরে, বৎসারান্তে দেবীকে নাকি নররক্তে স্নান করানো হত।'

'ওরে বাবা রে!' জয়ন্ত গল্প শেষ করার আগেই সোলাঙ্কী চেঁচিয়ে উঠল।

অচিন্ত্য লাফিয়ে উঠল। 'মানে নরবলি দেওয়া হত?'

'একেবারে কাঁচাখেকো দেবী তো।' কৃষ্ণা বলল।

'হ্যাঁ, এই দেবীর স্থানীয় নামই ছিল কেচাইখাতি। কাঁচাখেকোর সঙ্গে মিলটা খুঁজে পাচ্ছ?' জয়ন্ত বলল।

'তারপর? তারপর?' সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

'লোককথা আছে, আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে এই ভয়ংকরী দেবীকে নাকি একবার জাগ্রত করা হয়।'

'জাগ্রত করা হয়!'

'হুম। দেবী উঠে এসেছিল পৃথিবীতে...' জয়ন্ত গল্প শেষ করার আগেই খেতে যাওয়ার ডাক এল। কৃষ্ণা একটু গাঁইগুঁই করছিল। কিন্তু অচিন্ত্য একেবারে তেড়েফুঁড়ে উঠল, 'না না। আজ আর গল্প নয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। পরে কখনও দুপুরবেলা বসে এসব গল্প শোনা যাবে। রাত্রিবেলা এইসব গল্প শোনা একদম ইয়ে নয়। মানে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।'

পুরাণ হল, ইতিহাস হল, কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়েই গেল। এই নামটা শাম্ভবী জানল কোথা থেকে? খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে অচিন্ত্য একবার মন্দিরের দিকে তাকাল। আচমকা তার মনে হল, মন্দিরের সাদা সিঁড়িতে রক্তে আঁকা ছাপ জ্বলজ্বল করছে। ছোট ছোট কাক-ছাপ পায়ে কেউ একজন গিয়ে ঢুকছে মন্দিরের মধ্যে।

৺দিক্করবাসিনী।

সাত

জলখাবার খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা ছাতে উঠে এল শাম্ভবী। শীতের সকাল, এখনও ভালো করে রোদ ওঠেনি। উঠোনে দিদিরা প্রতিদিনকার মতোই আসর বসিয়ে মজার মজার গল্প করছে। ওদের মাঝখানে যেতে আজ তার একদম ইচ্ছা করল না। ছাতের উপরে ঝুঁকে থাকা গাছগাছালির পাতায় শিশির লেগে আছে। দূরে মাঠের মাঝে একপাল ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আকাশে হলুদ-সবুজ-লাল কত্ত ঘুড়ি উড়ছে। আর একটা বিশাল ঢাউস কালো ঘুড়ি।

কালো ঘুড়িটা দেখতে দেখতে শাম্ভবীর মনে হল, তার স্বপ্নের ওই বুড়িটাকেও একদম ওরকম দেখতে। ইভিল উইচ। ঠিক যেমন দিদির ভূতুড়ে গল্পের বইগুলোর কভারে থাকে। কালো কাপড়ে হুড-টানা কঙ্কালের মতো হাতওয়ালা ব্ল্যাক এঞ্জেল। শাম্ভবী বুড়িটার নাম রেখেছে কালো পরি।

সেদিন কুমারীপুজোর আসনে বসে শাম্ভবী যেন অন্তহীন এক সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। ঠিক অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড-এর মতো। সুড়ঙ্গটা স্বচ্ছ কাচের তৈরি। চোখ খুলে রেখেও সে দেখতে পাচ্ছিল না দিদি, কৃষ্ণাদি কিংবা দাদুকে। শুনতে পাচ্ছিল না শাঁখের আওয়াজ। সে ক্রমে ডুবে যাচ্ছিল এক অন্য জগতে।

এক অতি ভয়ানক জগৎ। রক্তময়, চেতনাবিহীন। সেই জগতে চিরজ্বলন্ত একটা ভীষণ চক্রের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে ছিল। চক্র থেকে তীব্র কালচে লাল আগুন ছিটকে ছিটকে পড়ছিল। এক ভয়ংকরী বিকটদর্শন বুড়ি, কালো পরি। মাথার দীর্ঘ জটা থেকে এক আগুনের সুতো তৈরি হচ্ছিল। সেই সুতো দিয়ে কালো পরি বেঁধে ফেলছিল শাম্ভবীকে।

বিকট স্বরে মন্ত্র পড়ছিল, 'ওঁ দিক্করবাসিনীম্ হুং...'

সেই সময় জ্ঞান ফিরে পেয়ে তার অত কিছু মনে হয়নি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন কালো পরিটা তাকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলছে। তার বড় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে, ওই কালো পরিটা একটু একটু করে তাকে গিলে ফেলবে। তার মা, বাবা, দিদিয়া সবাই হারিয়ে যাবে। সে নিজেও হারিয়ে যাবে। অজানা একটা বিপদের আশঙ্কায় আচমকা শাম্ভবীর চোখের লালচে মণি দুটো ঝাপসা হয়ে এল জলের তলায়।

শাম্ভবী চোখের জল মুছে এদিক-ওদিক তাকাল। পুকুরের দিকে ছাতের উপরে একটা ঘর। কৌতূহলী পায়ে শাম্ভবী এগিয়ে গেল ঘরটার দিকে।

বহু দিনের তালাবন্ধ ঘর। লোহার শিকলে মরচে পড়ছে, পিতলের তালাটাতেও। শাম্ভবী তালাটা একবার নেড়েচেড়ে দেখল। তার মনে হল, বহু যুগ কেউ খোলে না এই ঘরটা।

বহু পুরানো ফ্যাকাশে রংচটা কাঠের দরজাটা দেখলে বোঝা যায়, কোনও এক যুগে এর গায়ে সবুজ রঙের প্রলেপ ছিল। দুটো পাল্লা জুড়ে জায়গায় জায়গায় পোকায় ফুটো করে দিয়েছে। দরজার উপরের কাঠ আর দেওয়ালের লাগোয়া অংশ জুড়ে পোকারা মাটির ঢিবলি ঢিবলি ঘর বানিয়েছে। দরজার চৌকাঠে একটা নাম খোদাই করা। 'চন্দ্রমৌলি'।

শাম্ভবী দেখল দরজার দুটো পাল্লায় দুটো ছোট ছোট কালচে হাতের ছাপ। ঠিক যেমন নতুন বউ তার নিজস্ব ঘরের বাইরের দেওয়ালে আলতা-মাখা হাত রাখে শুভাকাঙ্ক্ষা আর অধিকারবোধে, অনেকটা তেমনি। এই ঘরে কি কেউ বউ হয়ে এসেছিল? কিন্তু এ যেন

অনেকটা তারই হাতের মাপের। তার বয়সি কোনও ছেলে বা মেয়ের। হাতের ছাপে হাত রাখতেই শাম্ভবীর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

এক অপরূপ স্ফটিকদ্বার। ভিতরে এক অপূর্ব নীলপদ্ম। নীলপদ্মটাকে দেখতে পেয়েই স্বস্তির এক অনুভূতি শাম্ভবীর আপাদমস্তক ছড়িয়ে পড়ল। কালো পরিকে দেখে তার মনের মধ্যে যেমন তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, ঠিক তার উলটো। যেন কেউ তাকে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে একরাশ ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে দিল।

এই নীলকমলই তাকে রক্ষা করবে ওই কালো পরির থেকে। শাম্ভবী দু-হাতে জোরে ধাক্কা দিল স্ফটিকদ্বার খোলার জন্যে। কিন্তু কেউ যেন আঁট করে বন্ধ করে রেখেছে তার মনের দরজা। আরও... আরও শক্তি দরকার। শাম্ভবী সজোরে ধাক্কা দিতে লাগল বন্ধ দরজাটায়।

***

'উফ, জয়ন্তদাটা এমন সব ভয়ংকর গল্প বলে না!' অচিন্ত্য আইসক্রিম শেষ করে কাঠিটা চাটছিল।

'কেন? কাল রাত্রে বাথরুম চাপতে চাপতে তোর ঘুম হয়নি বুঝি?' কৃষ্ণা নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করল।

শাম্ভবী খিলখিল করে হেসে উঠল। সোলাঙ্কীও মুখে শাল চাপা দিল। অচিন্ত্য কানটান লাল করে কৃষ্ণার পনিটেইল ধরে এক টান দিল। বোনগুলো এমনই হয়। এখুনি পকেট ঝেড়ে আইসক্রিম খেল, আর এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই।

'হুঃ, তোরা যে কত বীরাঙ্গনা, আমার জানা আছে। মুখেই শুধু ফটর ফটর।' অচিন্ত্য আইসক্রিমের কাঠিটা একটা নেড়িকুকুরকে তাক করে ছুড়ে মারল।

বিকেলবেলা সবাই এসেছে কঙ্কালীতলার মন্দির দেখতে। শাম্ভবী হঠাৎই এমন জেদ ধরল যে আসতেই হল। ফেরার সময়ে অচিন্ত্য জানাল, তাকে এক সাধুর থেকে তাবিজ নিতে হবে দিদির জন্যে। মা বলে দিয়েছে। সাধুর আস্তানা কঙ্কালীতলা পুরানো শ্মশানের পাশেই। প্রায় মাস দেড়েকের উপরে তিনি ডেরা পেতেছেন। কিন্তু অচিন্ত্যর একা একা যেতে সাহস হচ্ছে না। তাই সবাইকে আইসক্রিম ঘুষ দিয়ে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

তাবিজ সাধুর কাছে বেজায় ভিড়। কঙ্কালীতলার পুরানো শ্মশানের উলটোদিকে একটা গাছের তলায় তিনি ছাউনি খাটিয়ে আসর সাজিয়ে বসেছেন। দুটো চেলা আর এক ভৈরবী সমেত জমজমাট সংসার। চারপাশে ভক্তের ঢের লেগেছে, দেখল সোলাঙ্কী। কোনও একজনের জন্য যজ্ঞ হচ্ছে। বাবাজি বেশ হাত-পা নেড়ে হুংকার ছেড়ে মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। সবার চোখে অল্প একটু ভয়ের সঙ্গে বেজায় ভক্তিভাব, ঠিক যেমন পোড়া কাঠের ধোঁয়ায় মিশেছে কর্পূরের গন্ধ। অচিন্ত্য দেখল, একটু টাইম লাগবে। সে সবাইকে বাইরে দাঁড়াতে বলে সাধুর এক চেলাকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা গল্প করছিল। শাম্ভবী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল একটু দূরের গাছপালায় ঘেরা পোড়ো জমিটার দিকে। দুপুরবেলা সে হাজার ধাক্কা দিয়েও ওই

স্ফটিকদ্বার খুলতে পারেনি। তার অত শক্তি নেই। নদীর ধারে ওই পোড়ো জমিটা যেন তাকে টানছে। ওখানে গেলেই যেন তার শক্তি বেড়ে যাবে। সে যেন এক ধাক্কাতেই খুলে ফেলবে দরজা।

সোলাঙ্কীর হাত ছাড়িয়ে শাম্ভবী হঠাৎ ছুট লাগাল পুরানো শ্মশানের দিকে। শ্মশানের মাটি স্পর্শ করতে না করতেই শাম্ভবী আবার দেখতে পেল সেই বন্ধ স্ফটিকদ্বার। সে এক ধাক্কায় খুলে দিল দরজাটা। দরজার অন্য পারে আরেক জগৎ। রূপ-বর্ণ-গন্ধহীন জগতের মাঝখানে এক প্রচণ্ড অগ্নিবলয়। তার মধ্যে সেই নীলপদ্ম।

ভয়ংকর অগ্নিবলয়টা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে। পুড়িয়ে দেবে ওই পদ্মকোরকটিকে। শাম্ভবীর রাগ হল। না! একে সে মরতে দেবে না। এই অজানা-অচেনা পৃথিবীতে এই একমাত্র দোসর তার। 'চন্দ্রমৌলি'।

শাম্ভবী ঝাঁপিয়ে পড়ল অগ্নিবলয়ের মধ্যে।

***

অবশেষে আড়াইশো টাকা দিয়ে বাবাজির থেকে যখন মাদুলিটা পেল অচিন্ত্য, ততক্ষণে যজ্ঞের ধোঁয়াতে তার কাশি শুরু হয়ে গেছে। ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে দেখে, একা কৃষ্ণা তার জন্যে হানটান করছে।

'পেয়েছি। উফ বাপ রে।' অচিন্ত্য চারদিকে তাকাল, 'কই রে? ওরা কোথায়?'

'আরে, শামু এখুনি ছুটে গিয়ে পুরানো শ্মশানে ঢুকেছে।' কৃষ্ণা বলল।

'কী? সে কী রে? এই সন্ধেবেলা!' অচিন্ত্য হাঁ হয়ে গেল। মেয়েটার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই?

'আর বলিস না। চল্ চল্ এখুনি।' কৃষ্ণা অচিন্ত্যকে টেনে নিয়ে গেল।

সূর্য ডুবে গেছে একটু আগেই, এখনও সামান্য আলো লেগে আছে আকাশে। শ্মশানে ঢোকার আগেই অচিন্ত্য কৃষ্ণাকে চেপে ধরল, 'ওরে কৃষ্ণা, একটু দাঁড়া।'

কৃষ্ণা একটা ঝাঁকি দিল, 'উফ চল্ তো।'

'না রে। আমি আগে বাড়িতে ফোন করি। এই জন্যেই আমি কিছুতেই শামুকে নিয়ে আসতে চাইছিলাম না। এত ছটফটে মেয়ে!' অচিন্ত্য বলল।

'তাহলে এক কাজ কর্, বাড়িতে নয়, জয়ন্তদাকে ফোন কর্।' কৃষ্ণা বলল।

ঠিক তখনই অচিন্ত্যর ফোনটা বেজে উঠল।

'হ্যালো।'

'হ্যালো টুকলু, আমি জয়ন্তদা বলছি। কঙ্কালীতলা মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা কোথায়?'

'ইয়ে, জয়ন্তদা... আমরা পুরানো শ্মশানে।'

'এখন শ্মশানে কী করছ?'

'ইয়ে... বলছিলাম, তুমি কি আসবে?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এখুনি আসছি। টেনশন করো না।' লাইনটা কেটে গেল। কঙ্কালীতলার পুরানো শ্মশানটা খুব একটা বড় নয়। শাম্ভবী একটা অশ্বত্থ গাছের তলায়

শ্মশানের মাটিতে পদ্মাসনে বসে আছে, তার চোখ বোজা দেখে মনে হয় সে ধ্যান করছে। সোলাঙ্কী ভয়ে ভয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী করছে শামু?' অচিন্ত্য দ্রুতপায়ে সোলাঙ্কীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল। নিজের অজান্তেই তার মুখ থেকে ফিসফিসিয়ে শব্দ ক-টা বেরল।

সোলাঙ্কী ঘাড় নাড়ল, 'জানি না। আমি ওকে নাড়াচ্ছিলাম, ও নড়ছিল না কিছুতেই। ওর গা প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে। ওই সাধুটা ওকে ছুঁতে মানা করল। আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

অচিন্ত্য দেখল, একটু দূরে একজন লম্বা ছাই-মাখা কালো কৌপীন-পরা সাধু মাটিতে ধুনি জ্বালার আয়োজন করছে। এই সাধুটাকে সে কিছুক্ষণ আগেও দেখেছিল। তারা যখন আইসক্রিম খাচ্ছিল, সাধুটা অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সাধুটা কি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে নাকি? সাধুটাকে কেন যেন ভালো লাগল না অচিন্ত্যর। চোখ দুটো যেন বড়ই তীক্ষ্ণ। অচিন্ত্য বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না সাধুর চোখের দিকে।

আলো কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে মশারা পনপন করছে। একটা অচিন্ত্যর গালে কামড়ে দিল। সোলাঙ্কী মাথার স্কার্ফটা খুলে শাম্ভবীর চারপাশে মশার ঝাঁক তাড়াতে শুরু করল। শাম্ভবী একদম সটান সোজা বসে আছে, দেখে মনে হল না মশা বা সোলাঙ্কী কেউ তাকে নাড়াতে পারবে।

ভাগ্যিস শীতকাল, তাই সাপের ভয়টা কম। শাম্ভবী কতক্ষণ বসে থাকবে? জয়ন্তদা এখনও আসছে না কেন? হল কী মেয়েটার? শাম্ভবীর কপালে একটা লাল শিরা ফুলে উঠেছে, দপদপ করছে।

'কী হয়েছে আমার বোনের? এতক্ষণ হয়ে গেল, ও তো নড়ছে না?' সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা সাধুকে জিজ্ঞেস করল।

'ওর ভাবসমাধি হয়েছে। মহা-সুলক্ষণা মেয়ে। ও সাধনায় অনেক উন্নতি করবে। অলখনিরঞ্জন।' সাধুর গমগমে গলায় উত্তরটা শুনে কৃষ্ণার গায়ে কাঁটা দিল।

সাধুর কথা শেষ হতে না হতেই জয়ন্ত এসে ঢুকল শ্মশানের সরু রাস্তাটা দিয়ে। জয়ন্তকে দেখে সাহস পেয়ে অচিন্ত্য একবার এগিয়ে গিয়ে শাম্ভবীকে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। অচিন্ত্যর মনে হল কোনও মানুষের হাত নয়, সে যেন গরম খুন্তি খালি হাতে ধরে ফেলেছে।

সবাই বিস্ফারিত চোখে দেখল, অচিন্ত্যর হাতে লাল দগদগে একটা ফোসকা পড়ে গেছে। সাধুটা গম্ভীর গলায় ওদের ধুনির কাছে এসে বসতে আদেশ করল।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাও বাড়ছে। নিজেদের ছায়াগুলোকেও যেন অন্য জগতের জীব মনে হচ্ছিল। থেকে থেকে অন্ধকার গাছের ডাল থেকে একটা বিশ্রী ওঁয়া ওঁয়া কান্নার মতো শব্দ বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছিল। ওটা শকুনের ডাক, কৃষ্ণা জানে, তবুও কিছুতেই সে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারছিল না। তার হাত কাঁপছে।

সাধুটা কী একটা গাছের পাতা পুড়িয়ে অচিন্ত্যর হাতে ছাই মাখিয়ে দিয়েছে। এরকম অতিপ্রাকৃত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে কৃষ্ণা তো বটেই, জয়ন্তও যেন প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে। অন্য সময় হলে নিশ্চয়ই দুজনে অচিন্ত্যর পোড়া ঘায়ে নোংরা ছাই-মাখানো সাধুগিরির ষষ্ঠীপুজো করত।

ধুনির গরমে বসে বসেও ওরা ঠান্ডায় কাঁপছিল। শাম্ভবীর কোনওরকম ঠান্ডা-গরম-আলো-অন্ধকার বোধ আছে, দেখে মনে হচ্ছিল না। বরং মাঝখানে একবার জয়ন্ত টর্চের আলো ফেলে দেখল, শাম্ভবীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। শাম্ভবী শ্মশানে এসে ঢোকার পর থেকে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে।

কৃষ্ণা একবার ফিসফিস করে বলল, 'জয়ন্তদা, বাড়িতে ফোন করব?'

জয়ন্তও ফিসফিসিয়ে বলল, 'না। আর-একটু দেখি।'

'অলখনিরঞ্জন'

হঠাৎ সাধুটা যেন ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি শাম্ভবীর দিকে। সবাই চমকে উঠে দেখল, শাম্ভবী চোখ খুলে চেয়েছে। সে অদ্ভুত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সরাসরি তাদের দিকে। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি বদলে গেল। অস্বাভাবিক হিংস্রতা ফুটে উঠল দুই চোখে। আচমকা একটা বিকট চিৎকারে খানখান হয়ে গেল শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

আট
চন্দ্রমৌলির কথা

অস্ট্রিয়ার বরফঘেরা পাহাড়ের কোলে এক দুর্গাকৃতি বাড়ি। অষ্টাদশ শতকের ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের বিশাল বাড়িটা পাহাড়, হ্রদ আর জঙ্গলে ঘেরা। এখন জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি, মানুষসমান বরফে ঢাকা পড়ে গেছে সব। শীতল হাওয়া বইছে হু হু করে। তুষারের গুঁড়ো উড়ছে বাড়িটাকে ঘিরে।

দুর্গের মধ্যে এক বিশেষ ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন এক মধ্য ত্রিশের দীর্ঘকায়া ইউরোপিয়ান রমণী। দুর্গের মধ্যে এই ঘরটিই সব থেকে বেশি সুরক্ষিত। বলা যেতে পারে, এই বিশেষ ঘরটিকে সুরক্ষাপ্রদানের জন্যই কয়েকশো বছর আগে স্বর্গদেও গোষ্ঠী তৈরি করেছিল এই দুর্গটা।

ঘরটা অতি প্রাচীন। ঘরের তিনটে দেওয়ালে চৌকো চৌকো কালো পাথরের মসৃণ গাঁথনি। শুধুমাত্র একটা দিকের দেওয়াল এবড়োখেবড়ো। দেখে মনে হয় দুর্গ সংলগ্ন পাহাড়েরই একটা অংশ এটা।

রমণী এবড়োখেবড়ো অংশটায় হাত রেখে মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতেই একটা দ্বারের আকৃতির রেখা ফুটে উঠল পাথরের বুকে। রমণী পা রাখলেন অন্য পাশে। যেন এবড়োখেবড়ো দেওয়ালটা গিলে নিল রমণীকে।

দ্বারের অন্য পাশে একটা গির্জার মতো উঁচু ছাতের বিশাল ঘর। মন্ত্রণাকক্ষ। সারা ঘর জুড়ে সুন্দর একটা সবুজরঙা আলো প্রতিভাত হচ্ছে। আলোক উৎস বোঝা যাচ্ছে না। ঘরের দু-পাশের লম্বা টানা দেওয়ালে পরপর ছয়খানা দরজা। ঠিক যেমন একটা দিয়ে রমণী একটু আগে এসে ঢুকলেন। এই দ্বারগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে খোলে। কোনওটা অস্ট্রিয়া, তো কোনওটা সাইবেরিয়া। একটা দ্বার তো খোলে অ্যারিজোনার মরুভূমির মাঝে।

এই ছয়টা দ্বারের প্রত্যেকটাই স্বর্গদেও-প্রধানদের দ্বারা সুরক্ষিত। রমণী নিজেও একজন স্বর্গদেও-প্রধান। স্বর্গদেও গোষ্ঠীর প্রধান।

স্বর্গদেওরা ছিল ভারতের পূর্ব প্রান্তের এক প্রাচীন জনজাতি আহোম গোষ্ঠীর শাখা। ভারতের এই প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চলে চিরকালই বহু ছোট ছোট আদিম গোষ্ঠী বসবাস করত। তাদের নিয়মকানুন, পুজো-আরাধনা সবই ছিল অতি প্রাচীন ও গূহ্য। প্রত্যেক গোষ্ঠীই চাইত ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা জুড়ে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে। তার জন্যে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে শুরু করে পৈশাচিক তন্ত্রসাধনা কোনও কিছুতেই তারা পিছপা হত না।

স্বর্গদেও গোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে জানা যায়, এইরকমই এক যুদ্ধবাজ প্রাচীন গোষ্ঠীর সাধনায় ত্রয়োদশ শতকে পৃথিবীর মাটিতে উঠে এসেছিল রৌম্য- পিশাচরা। কয়েকশো বছর ধরে তাদের অত্যাচার চলে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা জুড়ে। পঞ্চদশ শতকের শেষে রৌম্যপিশাচের সংখ্যা এতই বেড়ে যায় যে, তাদের উদরপূর্তির জন্য ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার আদিম জাতিগুলির প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ক্রমে জনশূন্য হয়ে উঠতে শুরু করে।

অসমের পূর্বাঞ্চলে অসংখ্য ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল আহোম নামক এক গোষ্ঠী। চীনের ইউনান প্রদেশের মং মাও অঞ্চল থেকে পাটকাই পর্বতমালা টপকে এসে এরা বসতি স্থাপন করেছিল অসমের পূর্বাঞ্চলে। রৌম্যপিশাচদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও আহোম গোষ্ঠী জানত না, কী করে বাধা দেওয়া যায় রৌম্যদের।

পঞ্চদশ শতকের শেষে আহোম রাজা সুপিমফার এক অন্তঃসত্ত্বা রানির সঙ্গে ভালোবাসা হয় এক সাধকের। রাজা সেই সাধককে এক অদ্ভুত শর্ত দেন। তিনি রানিকে সাধকের সঙ্গে যেতে দেবেন, যদি সেই সাধক রৌম্যনিধনের উপায় বলে দেয়।

সাধক উপায় জানায়। কিন্তু রাজা সুপিমফা কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যান। সাধকের নির্দেশে সেই অন্তঃসত্ত্বা আহোম রানির পুত্র হিমালয়ে গিয়ে ভৈরব আরাধনা শুরু করে। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে একদিন হিমালয় থেকে নেমে আসে ভৈরবের দল। পৃথিবীর মাটি থেকে তারা নিশ্চিহ্ন করে রৌম্যদের।

আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে ভৈরবদের আদেশে সেই আহোম রাজপুত্রের ছয়জন বংশধরকে নিয়ে তৈরি হয় এক অত্যন্ত গুপ্ত গোষ্ঠী। স্বর্গদেও গোষ্ঠী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ছয়জন স্বর্গদেও। ভৈরবের আদেশে ছয়টি দ্বারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পৃথিবীর ছয়টি জায়গায় বাসা বেঁধেছিল তাঁরা। মিশে গিয়েছিল স্থানীয় জনজাতির সঙ্গে।

সেই প্রাচীন ছয়টি রক্তধারা এতদিনে বংশবৃদ্ধি করে এক বিশাল গোষ্ঠী তৈরি করেছে। স্বর্গদেও রক্তধারার সব মানুষ জানেও না তাদের বংশের ইতিহাস। প্রত্যেক বংশই তার উত্তরসূরি হিসাবে বেছে নেয় মাত্র একজনকে। সে-ই হয় সেই বংশের স্বর্গদেও-প্রধান। জানে এই গুপ্তদ্বারের কথা, মন্ত্রণাকক্ষের কথা, প্রাচীন ইতিহাস। রমণী ছাড়াও আরও পাঁচজন স্বর্গদেও-প্রধান রয়েছে পৃথিবীতে।

তিনশো বছর আগে স্বর্গদেও-প্রধানদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে ভৈরবরা চলে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে। তাদের কথা এতদিন শুধু প্রাচীন পুঁথিতেই পড়ে এসেছে রমণী এবং অন্য স্বর্গদেও-প্রধানরা। কিন্তু গত কয়েক বছরে এক অদ্ভুত ঘটনায় তাদের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। তিনশো বছর আগে চলে-যাওয়া ওই উপদেবতা ফিরে এসেছে তাদের জীবনে। এক ভৈরব।

'এসো সাধী।' একজন গম্ভীর কণ্ঠে রমণীকে আহ্বান জানালেন। রমণীর নাম সাধী। যিনি তাকে আহ্বান করলেন, তিনি আরেকজন স্বর্গদেও-প্রধান। স্বর্গদেও-প্রধানটি বলে উঠলেন। পাথুরে মেঝেতে বৌদ্ধ গুম্ফার মতো সারি সারি বসার জায়গা। সামনে সামান্য উঁচু কাঠের টেবিল। ঘরে পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন বয়সি নারী-পুরুষ বসে আছেন।

সাধী এগিয়ে এসে নির্দিষ্ট আসনে বসল।

'তুমিই শুধু বাকি ছিলে। ওই বালকের ব্যাপারে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছি।'

স্বর্গদেও-প্রধানের কথা শুনে সাধী চমকে উঠল। 'ওই বালক' বলে স্বর্গদেও-প্রধানটি যাকে নির্দেশ করল, সে-ই ভৈরব। সাধী রীতিমতো অবাক হল, বাকিরা ওই স্বর্গদেও-প্রধানটাকে কিছু বলল না পর্যন্ত।

বসতে না বসতেই তার কানে এল, অন্য একজন স্বর্গদেও-প্রধান বলছেন, 'কিন্তু অশ্বিনীকুমাররা তো বলেই গেলেন ওই বালকের সুস্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কোনও চিকিৎসাই ফিরিয়ে আনতে পারবে না ভৈরবকে। একমাত্র উপায়, কেউ যদি ভৈরবের মনোভূমিতে ঢুকতে পারে, তবেই...'

সাধী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, ভৈরবের মনোভূমিতে কে ঢুকবে? অত শক্তিশালী কেউ নেই পৃথিবীতে। একমাত্র অতিলৌকিকভাবে জন্ম যাদের, কোনও উপদেবতা, যারা স্বয়ং দেবদেবীর শক্তিতে বলীয়ান, শুধু তারাই পারবে।

'ঠিক। তবু যদি ওই বালক সুস্থ হয়ে ওঠে, আমাদের ভাবতে হবে, আমরা কী পদক্ষেপ নিতে পারি।'

'হুম, তবে অন্য কোনও কথার আগে, গতবারের রৌম্যহত্যার ঘটনাটা আমি আবার একবার সাধীর কাছ থেকে শুনতে চাই।' অন্য একজন প্রধান বললেন।

সাধী কাঁধ ঝাঁকাল। এর আগে শ-খানেকবার দ্বিতীয় রৌম্যহত্যার কথা সাধী বলেছে বাকিদের।

সে বলল, 'ভৈরব প্রথম রৌম্যটাকে মারার পরে, ২০১৪ সালের ৮ অক্টোবর এই দ্বিতীয় রৌম্যটার জন্ম হয়। কিন্তু প্রায় দু-বছর পরে, মাত্র পনেরো মাস আগে, আমরা খোঁজ পাই রৌম্যশিশুটার। পাতরগণ্য সাধকরা ওটাকে লুকিয়ে রেখেছিল ইথিয়োপিয়ার এক অরণ্যসংকুল অঞ্চলে। ইথিয়োপিয়াতে পৌঁছে স্থানটাকে নির্দিষ্ট করতে আমাদের প্রায় এক মাস সময় লেগে গিয়েছিল। একটা বাড়ি ছিল জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলের চারপাশে স্থানবন্ধন দেওয়া ছিল। স্বর্গদেওরা সেই স্থানবন্ধন পেরতে পারেনি।

তখন ভৈরব একাই ভিতরে ঢোকে। তার ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানবন্ধন কেটে যায়। তখুনি আমরা ভিতরে ঢুকি। জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে একটা ঘরে আমরা ভৈরবকে দেখতেও পাই। কোনও রৌম্যশিশু আমাদের চোখে পড়েনি। কিন্তু আচমকা আমাদের চোখের সামনেই ভৈরব জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়।'

'তুমি বলেছিলে, ভৈরবের পাশে একটা রক্তবৃত্ত তৈরি হয়েছিল। তোমার কী মনে হয়, পাতরগণ্যরা ভৈরবকে নরকে পাঠাতে চেয়েছিল?'

'হতেও পারে। আমি ঠিক জানি না। ওখানে তিনটে পাতরগণ্য সাধুর মৃতদেহ পড়ে ছিল।'

'এর থেকে প্রমাণ হয় না, ওই বালক রৌম্যটাকে মেরেছে। ওই বালক আদৌ কোনও ভৈরব কি না, আমার সন্দেহ আছে।'

'ও কিন্তু প্রথম রৌম্যটাকে আমাদের চোখের সামনেই মেরেছিল।' সাধী গর্জে উঠল।

'কে বলতে পারে, আমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে সেটা ওই বালকের অন্য কোনও চাল ছিল কি না?'

'আমরা পাঁচজন স্বর্গদেও-প্রধান মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সাধী। আশা করি, তুমিও আমাদের মত সমর্থন করবে।'

সাধীর মনে আচমকা রাগ জন্মাল। ওই পাতরগণ্য সাধকগুলোর জন্যেই আজ ভৈরবের এই অবস্থা। না ওরা রৌম্যজাগরণ করত, না আজ ভৈরবের এই দুর্দশা হত।

স্বর্গদেও গোষ্ঠী যেমন সাহায্য করে ভৈরবকে, তেমনি পাতরগণ্য গোষ্ঠী সাহায্য করে রৌম্যদের। শুধু সাহায্যই নয়, ওরা রৌম্যদের সৃষ্টি করে। পাতরগণ্য গোষ্ঠীটা স্বর্গদেওদের থেকেও প্রাচীন। ওরা অসমের দেওরী গোষ্ঠীর এক বিশেষ শাখা। অসমের জঙ্গলে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে কালো জাদুর চর্চা করে আসছে তারা। অনেক গুপ্তবিদ্যা ওদের জানা আছে। স্বভাবতই ওরা বেশি শক্তিশালী।

স্বর্গদেওরা জানত, পাতরগণ্য গোষ্ঠীর কিছু মানুষ বেঁচে আছে আজও। কিন্তু চারশো বছর আগে শেষ ভৈরব-রৌম্যের যুদ্ধের পরে হারিয়ে গেছে প্রাচীন যোগিনী তন্ত্রের রৌম্যজাগরণের ক্রিয়াকলাপ, যা কোনওদিনও লেখা হয়নি কোনও পুঁথিতে। শুধু কিছু যোগিনীই গুপ্তভাবে চর্চা করত সেই তান্ত্রিক আচার। তাই পাতরগণ্য রক্তধারার মানুষগুলোর থেকে স্বর্গদেওদের কোনওরকম আশঙ্কা ছিল না।

কিন্তু বছর সাতেক আগে একটা রৌম্যজাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেছে, লুপ্ত হয়নি যোগিনী তন্ত্রের সেই গুহ্য তন্ত্রচর্চা।

প্রায় ছয় বছর আগে ২০১১, ১০ ডিসেম্বর প্রথম রৌম্যজাগরণ হয়। খবরটা পেয়ে স্বর্গদেও-প্রধানরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। চারশো বছর আগের এক প্রাচীন আতঙ্ক রক্তবৃত্ত ফুঁড়ে আবার উঠে আসছে পৃথিবীতে। প্রায় বছরখানেক ধরে সারা পৃথিবীতে খুঁজে খুঁজে তারা নির্বিচারে হত্যা করেছিল পাতরগণ্য রক্তধারার নরনারীদের। অবশ্য সেই হতভাগ্য মানুষগুলোর বেশির ভাগই এইটুকুও জানত না যে, তারা এক বিশেষ রক্তধারা বহন করে শরীরে। নিজদের অতীত সম্পর্কে অজ্ঞাত সাধারণ মানুষগুলোর মৃত্যু সহ্য করতে পারেনি সাধী। সে অন্যদের কাছে প্রস্তাব রেখেছিল, যে সমস্ত পাতরগণ্য রক্তধারার মানুষরা জেনেশুনে রৌম্যজাগরণে অথবা রৌম্যশিশুটাকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে শুধু তাদেরকেই মারা হোক। কিন্তু বাকি স্বর্গদেও-প্রধানরা কেউ-ই তার প্রস্তাবে সম্মত হয়নি।

প্রায় এক বছর ধরে নির্বিচারে পাতরগণ্য রক্তস্রোত বওয়ানোর পরে, স্বর্গদেও-প্রধানরা গোবি মরুভূমি প্রান্তরে একদল পাতরগণ্য যাযাবরকে খুঁজে পায়। কালো জাদুর চর্চা করত তারা। তাদের কাছেই পাওয়া যায় প্রথম রৌম্যশিশুটাকে। স্বর্গদেও-প্রধানরা যাযাবরগুলোকে মেরে রৌম্যশিশুটাকে এনে আটকে রেখেছিল এই মন্ত্রণাকক্ষে।

ছয়টা দ্বার ছাড়াও মন্ত্রণাকক্ষে আরও দুটি দ্বার আছে। এক ধারে এক বিশাল স্বর্ণদ্বার। অন্যটা অপেক্ষাকৃত ছোট, সাধারণ কাঠের দরজা। মন্ত্রণাকক্ষ সংলগ্ন একটা ঘরে যাওয়ার জন্যে।

সাধী একবার স্বর্ণদ্বারের দিকে তাকাল। কথিত আছে, ওই দ্বারের অন্য প্রান্তেই ভৈরব অঞ্চল।

স্বর্গদেও-প্রধানরা ভেবেছিল, রৌম্যশিশুটাকে মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এলেই দ্বার খুলে যাবে। ভৈরবরা বেরিয়ে এসে মেরে দেবে শিশুটাকে। কিন্তু কিছুই হয়নি। প্রায় এক বছর কেটে যাওয়ার পরেও স্বর্ণদ্বার খোলেনি। তখন স্বর্গদেও-প্রধানরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ওঠে। তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, রৌম্যশিশুটাকে মারবে কীভাবে?

প্রায় এক বছর বাদে হঠাৎ একদিন স্বর্গদেও-প্রধানরা মন্ত্রণাকক্ষে এসে দেখেছিল, সিংহাসনে এক যুবক বসে আছে। স্বর্গদেও-প্রধানদের চোখের সামনেই রৌম্যশিশুটাকে মেরে নিজের ভৈরবত্ব প্রমাণ করে দেয় সেই যুবক। ভৈরবের কঠোর আদেশে নির্বিচারে পাতরগণ্য মানুষ মারাও বন্ধ হয়।

'সাধী, সাধী?' সাধী চমকে উঠে তাকাল। স্বর্গদেও-প্রধানরা তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

'সিদ্ধান্তটা কী?' সাধী নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা মনে করি ওই বালক হয়তো ভৈরব নয়।'

'কিন্তু ও যে...' সাধী কথা শেষ করতে পারল না, একজন হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে।

'বিগত তিনশো বছরের উপরে কেউ কোনও ভৈরবকে দেখেনি। আমাদের পূর্বপুরুষরা ইতিহাসে লিখে গেছে ভৈরবরা পূর্ণবয়স্ক যুবা পুরুষ এবং স্বর্ণাভ। তারা অমর। ওই বালক এতকাল নিজের স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছিল আমাদের থেকে। ও যদি ভৈরব হয় তাহলে ও কখনওই বালক হতে পারে না। আর ও স্বর্ণাভও নয়।'

স্বর্গদেও-প্রধানের যুক্তিতে সাধী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এ যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

'অবশ্য ওই বালকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। হয়তো বা ওই বালক কোনওভাবে রৌম্যহত্যা করতে পারে।' অন্য একজন বলল।

সাধী একটু আশার আলো দেখতে পেল। আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আমাদের তো সেটাই উদ্দেশ্য। রৌম্যহত্যা।'

'হ্যাঁ। তাই আমরা ঠিক করেছি, ওই বালক যদি সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে ওকে ওই মন্ত্রণাকক্ষের সংলগ্ন কক্ষে বন্দি করে রাখব আমরা।'

সাধী চমকে উঠল, কিন্তু নিজের মনোভাব গোপন রাখল।

'আমরা ওই কক্ষের দ্বারবন্ধন করে দেব, যাতে কেউ ভিতর থেকে বাইরে না বেরতে পারে।'

'যাতায়াত করতে পারবে একমাত্র স্বর্গদেও-প্রধানরা।' অন্য একজন বলল।

'এরপরে যদি পাতরগণ্যরা আরও রৌম্যজাগরণ করে, তখন?' সাধী প্রশ্ন করল।

'তাহলে আমরা প্রথমবারের মতো সেই রৌম্যশিশুকে ধরে আনব। এনে, ওই কক্ষে পুরে দেব। ওই বালককে বাধ্য করা হবে রৌম্যহত্যার জন্যে। আমাদের কোনও সমস্যা থাকবে না।'

'আর, ও যদি প্রকৃতই ভৈরব হয় তাহলে?' সাধী শেষ চেষ্টা করল।

'তাহলে নিশ্চয়ই স্বর্ণদ্বার খুলে অন্য ভৈরবরা ওর সাহায্যে আসবে। তখন আমরা স্বীকার করে নেব, ওই বালক ভৈরব।' প্রথম যে স্বর্গদেও-প্রধান সাধীকে আহ্বান করেছিল, সে বলল, 'এবার বল, তুমি এই প্রস্তাব সমর্থন কর কি না?'

সাধী ঘাড় নাড়ল। সে সমর্থন করে এই প্রস্তাব। এ ছাড়া আপাতত কোনও উপায় নেই। সাধী জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি ভৈরবের জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব?'

'সেটাই যুক্তিযুক্ত। ওই বালক যদি মারাই যায়, তাহলে এই মুহূর্তে শক্তিক্ষয় করে দ্বারবন্ধনের প্রয়োজন পড়বে না।' একজন বলে উঠল।

সাধী তীব্র চোখে স্বর্গদেও-প্রধানটাকে দেখে, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাগে তার ফরসা মুখ লালচে হয়ে গেছে। বিশাল স্বর্ণদ্বারের উলটোদিকে একটা ছোট সাধারণ কাঠের দরজা। সাধী সেইদিকে এগিয়ে গেল। মন্ত্রণাকক্ষ সংলগ্ন এক মাঝারি মাপের অপেক্ষাকৃত নিচু ছাতের ঘর। এই মুহূর্তে এইখানেই রাখা হয়েছে ভৈরবকে।

ঘরটার চারদিকে শুধুই দেওয়াল, একটাও জানলা বা হাওয়া চলাচলের ছিদ্র পর্যন্ত নেই; অথচ ঘরটি সবসময় হিমশীতল। ঘরটিতে ঢোকা-বেরনোর একমাত্র রাস্তা ওই কাঠের দরজাটা। ঘরটির কোনায় কোনায় মধ্যে ছোট ছোট প্রদীপ জ্বলছে। অদ্ভুত একটা গন্ধ ভাসছে ঘরে। কস্তুরী! মেঝে গালিচায় মোড়া। ঘরে আসবাব বলতে অজস্র বই। পুরাতন পুঁথি। থরে থরে সাজানো, মেঝে থেকে প্রায় ছাত পর্যন্ত। আর একটিমাত্র পালঙ্ক।

এটা ভৈরবের নিজস্ব ঘর। অবশ্য গত পাঁচ বছরে ভৈরব এই ঘরটাতে খুব কম সময়ই থেকেছে। বেশির ভাগ সময়ে সে বিভিন্ন স্বর্গদেও-প্রধানদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। বেশি সময়টাই সে কাটিয়েছে সাধীর সঙ্গে, অস্ট্রিয়ার দুর্গপ্রাসাদে।এখন কতকাল এই বদ্ধ ঘরে ভৈরবকে কাটাতে হবে, কে জানে! কিন্তু ভৈরব কি কোনওদিনও সুস্থ হবে? সে আদৌ বেঁচে উঠবে তো? সাধী উদ্‌গত কান্না রোধ করতে করতে পালঙ্কের দিকে এগোল।

পালঙ্কটি অত্যন্ত মহার্ঘ। পালঙ্কের তলায় মোট চারজোড়া সাদা ধাতুর যুগলমূর্তি পালঙ্কের প্রায় চৌকো ফ্রেমটাকে কাঁধে নিয়ে মিথুনে রত। পালঙ্কের উপরে বড় বড় হাতির দাঁতের উপরে খোদাইয়ের কাজ করা অর্ধচন্দ্রাকৃতি থামগুলো উপরের চন্দ্রাতপটাকে ধরে রেখেছে। সম্পূর্ণ চন্দ্রাতপটি একটি বিশাল আয়না। সোনা আর রুপোর জলে কাজ করা তার চারপাশ। কালো মুক্তোর ঝালর ঝুলছে তার থেকে। সম্পূর্ণ পালঙ্কটা অত্যন্ত দামি চীনাংশুকের পরদায় ঢাকা। ভিতরে কেউ আছে কি না, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। চরম উদ্‌বেগের মধ্যেও কয়েক মুহূর্ত দু-চোখ ভরে পালঙ্কটাকে দেখল সাধী।

ধীরপায়ে পালঙ্কের পাশে এসে পরদাটা সামান্য সরিয়ে দিল। ভৈরব শুয়ে আছে।

সাধী শেষবার মন্ত্রণাকক্ষে ভৈরবকে নিয়ে ঢুকেছিল চোদ্দো মাস আগে। একটা কফিনে করে বয়ে নিয়ে এসেছিল ভৈরবকে। স্বর্গদেও-প্রধানরা ছাড়া আর কাউকে সে দেখতে দিতে চায়নি ভৈরবের প্রকৃত রূপ। যে কয়েকজন সাধারণ স্বর্গদেও দেখেছিল ভৈরবকে, তাদের ব্যবস্থা সে তখনই নিয়েছিল। সাদা মার্বেলে মোড়া মন্ত্রণাকক্ষে কফিনটা খুলতেই সবাই একসঙ্গে চমকে উঠেছিল।

সমস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠেছিল, ‘এ কে?’

‘ভৈরব।’

‘কিন্তু... এ তো বাচ্চা ছেলে! ভৈরব তো এরকম দেখতে না।’ স্বর্গদেও-প্রধানরা আর্তনাদ করে উঠেছিল।

সাধী পালঙ্কের একপাশে বসল। কালো সিল্কের চাদরে নরম বিছানায় শুয়ে আছে বছর আঠারো-উনিশের এক তরুণ। মাথার উপরে চন্দ্রাতপের বিশাল আয়নায় তার পরিপূর্ণ

প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ভৈরব! এই ভৈরবের আসল চেহারা!

সাধী কপালে ভাঁজ ফেলে ভৈরবকে দেখতে লাগল। নীলচে সাদা বর্ণের তরুণটিকে অবিকল শিবলিঙ্গের মাথায় জড়ানো আকন্দ ফুলের মালার মতোই লাগছিল। এই মালা সতেজ নয়, কবেকার বাসি মালার ন্যায় নিষ্প্রভ মলিন হয়ে পড়ছে শ্বেতবর্ণের মুখটা। মুক্তোর মতো শুভ্র শিথিল তরুণ দেহটি হয়ে উঠেছে হালকা নীলবর্ণ। পাংশু মুখে শুকিয়ে আসা দুই ঠোঁট বিষ-পান-করা মানুষের মতোই নীলাভ। নীলাভ হয়ে গেছে বন্ধ চোখের পাতা।

বদ্ধ অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতোই শ্বেতকায় তরুণটি নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস কেটে গেছে। আজ বছর পেরিয়ে প্রায় চোদ্দো মাস হতে চলল।

আচমকাই সাধী হাহাকার করে করে উঠল। তার মনের মধ্যে চাপা কথাগুলো বেরিয়ে এল কণ্ঠ চিরে।

'অশ্বিনীকুমাররা বলে দিয়েছে তোমার ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। তোমার নক্ষত্রদশা বলছে, আগামী পূর্ণিমায় তোমার নরকগমন হবে।'

নিস্তব্ধ ঘরে সাধীর কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

***

মৃত্যু কি নতুনতর কোনও বন্ধন, নাকি শুধুই মুক্তি? এই অসম্ভব যন্ত্রণা সে আর সহ্য করতে পারছে না। ক্রমাগত একের পর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার মানসপটে। প্রত্যেকটা ঘটনা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে ক্রমাগত। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, এটাই কি তার জীবন! এত কষ্টদায়ক! বছরের পর বছর কারা যেন তাকে আটকে রেখে অত্যাচার করে যাচ্ছে। সে ক্রমশ ভেসে যাচ্ছে এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্যে। এক যন্ত্রণা থেকে আরেক যন্ত্রণায়। কী হচ্ছে এইসব! এই অবিশ্বাস্য কষ্টের পথ শেষ হচ্ছে না কিছুতেই। সে যেন একের পর এক অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে গেলেও কারা যেন আবার সেই ছাই থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে তাকে নতুন এক অগ্নিপরীক্ষার জন্য। সে আর পারছে না।

একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তার। মৃত্যুকামনা করতে সে যেন খানিক শীতলতা পেল। তার আরামবোধ হল, কতদিন সে বন্দি ছিল ঘৃণায়, অনাদরে, ক্রোধে, নির্দয় নিষ্ঠুরতায়; এবার মৃত্যু। তার মুক্তি!

আচমকা সবকিছু মুছে গিয়ে এক বালিকা এগিয়ে এল। তার মনে হল, এই স্বয়ং মৃত্যু।

'...মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট
রক্তকমল কর, রক্ত অধর পুট...'

বালিকার রক্ত অধরে অস্ফুটে উচ্চারিত হল একটি শব্দ, 'চন্দ্রমৌলি!'

সে শিহরিত হল। এ কে? এ কি মৃত্যু নয়?

'ফিরে চল। জেগে ওঠ।' বালিকা এগিয়ে এল তার দিকে।

‘না!’ সে আর ওই কষ্টের মধ্যে ফিরে যেতে চায় না। সে মৃত্যু চায়।

বালিকা দু-হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। ‘না। মরতে চেয়ো না। ফিরে চল। তুমি স্বপ্ন দেখছিলে। তুমি জেগে ওঠ।’

স্বপ্ন!

সে অনুভব করল, সমস্ত আলো, অন্ধকার, অগ্নিবলয়ের অন্তহীন উত্তাপ, মৃত্যুর শীতলতা তাকে ছেড়ে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। তার আর মরা হল না।

***

কে যেন কাকে বলছে, ‘সাধী! দেখ! জ্ঞান ফিরছে।’

‘ভৈরবের জ্ঞান ফিরছে!’ এক মধুর কণ্ঠ তার কানের কাছে ডেকে উঠল, ‘ভৈরব। ভৈরব।’

‘শেষ পর্যন্ত, তাহলে... সবাই তো আশা ছেড়েই দিয়েছিল।’ অপর এক কণ্ঠ বলে উঠল।

‘এখনও তো কোনও কথা বলছে না, চোখ খুলছে না।’ মধুর কণ্ঠে উদ্‌বিগ্নতা ঝরে পড়ল।

‘খুলবে। জ্ঞান ফিরছে যখন, তখন সুস্থ হয়েও উঠবে।’ পুরুষকণ্ঠ বলল।

‘আমাদের কিন্তু আর সময় নেই। এখনই...’ অন্য কেউ বলল।

‘হ্যাঁ। সাধী, চল।’

‘ভৈরব।’ মধুরকণ্ঠী কাঁপা গলায় ডেকে উঠল।

তরুণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

নয়

সকালের জলখাবারপর্ব মিটলে অচিন্ত্যসহ তিনটে মেয়ে হইহই করে উঠে পড়ল গাড়িতে। বেড়াতে বেরতে পেরে কৃষ্ণা বেশ উৎফুল্ল। শ্মশানের ঘটনাটার পরে দু-দিন কেটে গেছে। শাম্ভবীর মধ্যে কোনওরকম বেচাল কিছু দেখেনি তারা। সেইদিন ঠিক কী যে হয়েছিল। শ্মশানের সাধুটা বলছিল ‘ভাবসমাধি’। যারা নাকি সাধক হয়, তাদের অমনধারা হয়। কীসব ছাইপাঁশ ব্যাপার। ভাগ্যিস জয়ন্তদা ছিল সঙ্গে। নয়তো কৃষ্ণা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

কৃষ্ণা একবার আড়চোখে তাকাল সোলাঙ্কীর দিকে। সোলাঙ্কী বেজায় রেগেছে শাম্ভবীর উপরে। দু-দিন কথা বলেনি দিদি আর বোনে। জয়ন্তদার কথায় যেহেতু কৃষ্ণার বাড়িতে কিছু বলা হয়নি, তাই সোলাঙ্কীও আর মা-বাবাকে কিছুই জানায়নি। জয়ন্তদা বলল, সোলাঙ্কী কি কৃষ্ণার বাবা-মা জানলে ঠিক অচিন্ত্যর মা-বাবা জানতে পারবে। তারপর যদি ওঝা ডেকে বসে। সেটা শাম্ভবীর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেও ভালো নয়। এরা যে এত কুসংস্কারী, সেটা সোলাঙ্কী আগে জানত না। বাবা ফিরে এলে ব্যাপারটা সে ঠিক করে গুছিয়ে বলবে, ভেবে রেখেছে।

সব থেকে বেশি রেগে, গাড়ির সামনের সিটে মুখ হাঁড়ি করে বসে ছিল অচিন্ত্য। অচিন্ত্যর একদমই ইচ্ছা ছিল না এই বাচ্চা মেয়েগুলোর এসকর্ট হিসাবে হাজারবার-দেখা শান্তিনিকেতন আবার দেখতে যাওয়ার। জয়ন্তদা সঙ্গে এলেও খানিক শান্তি পেত অচিন্ত্য। কিন্তু সে তার পেপারের কীসব কাজের জন্য ভোর হতে না হতেই কলকাতা ছুটেছে।

সেদিন কঙ্কালীতলা শ্মশানে শাম্ভবী চোখ খোলার পরেই হাড়-হিম-করা একটা চিৎকার করে ওঠে। তারপর অদ্ভুত হিংস্র মুখে তেড়ে আসে তাদের দিকে। সবার আগে লাফ মেরে ছুটে পালিয়েছিল অচিন্ত্যই। তার পিছুপিছুই কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কী ছুটে আসে।

তাদের তিনজনকে শ্মশান থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখে তাবিজবাবা নিজে উঠে আসেন। তখন অবশ্য তাবিজবাবার ডেরা একদম ফাঁকা ছিল। তাবিজবাবা আর তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের সঙ্গেই কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কী আবার ফিরে যায় শ্মশানের মধ্যে। বাইরে একা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হয়নি অচিন্ত্যর। সে-ও সবার পিছুপিছু গুটিগুটি ফিরে যায়। শ্মশানে ফিরে গিয়ে অন্য সাধুটাকে সে আর দেখতে পায়নি।

জয়ন্তদা অবশ্য বাড়ি ফিরে এসে স্বীকার করেছিল যে, সে-ও একটু ভড়কে গিয়েছিল শাম্ভবীকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখে। কিন্তু ওদের কাছে আসার আগেই শাম্ভবী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। শ্মশানের সাধুবাবাটা তখনই পালায়।

পরে তাবিজবাবা আর বাকিরা মিলে জলটল থাবড়ে শাম্ভবীর জ্ঞান ফেরায়। বাড়িতে সে সব বলে দিতই। জয়ন্ত অনেক করে বোঝাতে সে মেনে নিয়েছে। অবশ্য তাবিজবাবাও একটা সুতো বেঁধে দিয়েছেন শাম্ভবীর হাতে। ওইটুকুই যা ভরসা।

গ্রামের পিচ-ঢালা রাস্তা ছেড়ে হাইওয়েতে ওঠার আগেই কৃষ্ণা গাড়ি থামাতে বলল। অচিন্ত্য মনে মনে ভাবল, এই শুরু হল। একটু আগেই একটা আখের রসের ঠেলাওয়ালাকে দেখে সবার আখের রস খাওয়ার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। ঠেলাওয়ালাকে দেখে গাড়ি থামাতে

থামাতে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল গাড়ি। তবু তিনটে মেয়ে তিড়িং-বিড়িং করে আখের রস খেতে নামল।

'কলকাতা শহরে কি আখের রস পাওয়া যায় না? এখন সারাদিন ধরে এদের এই ধিঙ্গিপনা সামলাতে হবে।' বাধা দিতে গিয়ে কৃষ্ণার কাছে মুখঝামটা খেল অচিন্ত্য।

'কখনও বোন তেড়ে আসছে, তো কখনও বোনের বান্ধবীর বোন। কপালটাই খারাপ আমার।' মনে মনে অচিন্ত্য স্বগতোক্তি করল। তখনও অচিন্ত্যর জানা ছিল না, ওইদিনটা সত্যি তার খারাপ যাবে।

গাড়ির ড্রাইভার বিশু আগেই দেখে রেখেছিল একটু পরেই হাইওয়ের ধারে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। সে জানে, মেয়েরা কোথাও একবার নামলে আধ ঘণ্টার আগে গাড়িতে উঠতে চায় না, তাই সে বলল, 'আমি গাড়িতে তেল ভরে আনি।' বলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। জায়গাটা একদমই ফাঁকা। দু-পাশে জঙ্গল। অচিন্ত্য খেয়াল করেনি, একটু দূরেই কালভার্টের উপরে তিনটে ছেলে বসে বসে ধুঁয়ো ওড়াচ্ছিল। ওদের দলটাকে দেখে দুটো ছেলের থেকে কিছু শব্দ উড়ে এল। কালভার্টের অন্য পাশে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। তাদের গাড়িটা সামান্য এগিয়ে এসেছে। সেই বাঁকের অন্য পাশে আখের রসের ঠেলাওয়ালা দাঁড়িয়ে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না তাকে।

সোলাঙ্কী একবার আড়চোখে দেখল দলটাকে। দুটো চোয়াড়েমতো ছেলে তাদেরকে দেখে টোন কাটছে। কিন্তু তার চোখ আটকে গেল তৃতীয় ছেলেটায়। সে কী যেন একটা ফিসফিস করে বলছিল অন্য ছেলে দুটোকে। তৃতীয়জনকে অন্য দুজনের সঙ্গে মেলানো যায় না।

কালো লম্বামতন ছেলেটার চোখে-মুখে ভদ্র বাড়ির ছাপ স্পষ্ট। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা, শীতকালীন মোটা টি-শার্ট আর পুলওভারেও তার চাবুকের মতো ছিপছিপে সুগঠিত শরীরটা ঢাকা পড়ছিল না। সামান্য কঠোর চোখ, রুক্ষ চুল আর গালে কয়েক দিনের না-কাটা দাড়ি ছেলেটাকে আরও পুরুষালি করে তুলেছে। সদ্য নাইন পাশ-করা সোলাঙ্কীর মনে হল, ইংরেজি নভেলে যে টল, ডার্ক, হ্যান্ডসাম হিরোগুলোর কথা থাকে, এই ছেলেটাও ঠিক সেরকমই। একই সঙ্গে সোলাঙ্কীর মনে পড়ল, এই ছেলেটাকেই সে কোপাইয়ের ধারেও দেখেছিল।

'অ্যাই, অচিন্ত্য। শোন্।' সোলাঙ্কী দেখল, ছেলেটা অচিন্ত্যকে ডাকছে।

কৃষ্ণা ফিসিফিস করে অচিন্ত্যকে বলল, 'তৌফিকদা তো?'

অচিন্ত্য ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল। শাম্ভবীকে নিয়ে কয়েকদিনের ঝামেলায় বিপদের এইদিকটা তার মাথা থেকেই উড়ে গিয়েছিল। তৌফিক যে গ্রামেই আছে— এ কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। সে ওদের দিকে ফিরেও তাকাল না, হাঁটার গতিও কমাল না। গলা নামিয়ে বলল, 'কথা বলিস না।'

সেদিন কোপাইয়ের ধারে একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিল সে। উফ, কী কপাল! আবার আজকেই এদের হাতে পড়তে হল।

'অচিন্ত্য'— কালভার্টের উপর থেকে আবার ডাক পড়ল।

'ডাকছে তো তোকে।'

অচিন্ত্য ফিসফিস করে কৃষ্ণাকে বলল, 'থামিস না। চলতে থাক্।'

মাঘের শীতেও অচিন্ত্য কুলকুল করে ঘামছিল। মনে মনে একটা ভরসা আনার চেষ্টা করছিল। কৃষ্ণাদের সামনে অন্তত তৌফিকদা তাকে কিছু করবে না।

'এই শালা শুয়োরের বাচ্চা। দাঁড়াতে বলা হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিস না?' অন্য দুজনের একজন উঠে এসে অচিন্ত্যর কলার ধরে টান দিল। পট করে শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে চলে গেল।

'না। মানে আমি?' অচিন্ত্য থতমত খেয়ে কী বলবে, কিছু বুঝল না। সবাই থেমে গেছে মাঝরাস্তায়। সোলাঙ্কী শাম্ভবীর হাতটা চেপে ধরল শক্ত করে। এ আবার কী ঝামেলা!

তৌফিক উঠে এল কালভার্ট ছেড়ে। মেয়েরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। তিনটে ছেলে অচিন্ত্যকে ঘিরে দাঁড়াল। অচিন্ত্যর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। কী করবে এরা তাকে নিয়ে? মারবে? ঠিক যেমন তৌফিকদাকে...

'মেন রাস্তায় দাঁড়াস না আশিস। জঙ্গলে চল্।' তৌফিক উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের শেষাংশটুকু পায়ে পিষতে পিষতে আদেশ করল।

আশিস আর অন্য ছেলেটা হিড়হিড় করে অচিন্ত্যকে টেনে রাস্তা থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। রাস্তার দু-পাশেই বড় বড় গাছের জঙ্গল। দু-মিনিটের মধ্যেই মেন রোড দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। দাদাকে এইভাবে টেনে নিয়ে যেতে দেখে কৃষ্ণা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল, তারপর সে ছুটে ঢুকল জঙ্গলে। সোলাঙ্কী আর শাম্ভবী হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার উপরে।

কৃষ্ণা জঙ্গল ঠেলে দৌড়ে এল ওদের কাছে। 'তৌফিকদা! কী হয়েছে? দাদাকে...'

অচিন্ত্য আরও ভয় পেয়ে গেল, 'আঃ কৃষ্ণা! কী করছিস! যা এখান থেকে।'

তৌফিক কৃষ্ণার দিকে তাকাল একবার, তারপর অচিন্ত্যর ঘাড়ে হাত রেখে বলল, 'তুই যা। আমার সঙ্গে অচিন্ত্যর জরুরি দরকার আছে। তা-ই না অচিন্ত্য?'

অচিন্ত্যর নিজেকে স্রেফ বাঘের হাতে হরিণছানার মতো মনে হচ্ছিল। কৃষ্ণারা চলে গেলে কী করবে এরা? তাকে মেরে ফেলবে নাকি? হে ভগবান, এবার কী হবে! কৃষ্ণা বাড়িতে জানাতে জানাতে সে কি মরে যাবে?

অচিন্ত্য প্রায় মরিয়া হয়েই তৌফিকের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। 'না! না! তোমার সঙ্গে আমার কোনও দরকার নেই তৌফিকদা। কী করতে চাও তুমি? আমাকে মারবে? কেন?'

তৌফিকের চোখ দুটো ধকধক করে উঠল। ঠান্ডা স্বরে সে বলল, 'আমার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছিল ওরা। তোকে তো কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি আমি।'

অচিন্ত্য ঢোক গিলল। সুদর্শন তৌফিকের গালের উপর লম্বা কাটা দাগটায় তার চোখ আটকে গেল। পেটের ভিতরটা একবার পাকিয়ে উঠল অচিন্ত্যর।

'খবর কে দিয়েছিল? তুই?' তৌফিক অল্প একটু ঝাঁকুনি দিল অচিন্ত্যকে। অচিন্ত্যর মনে হল, হাড়গোড়গুলো বুঝি স্থানবদল করল।

'আমি না।' অচিন্ত্য চিঁচিঁ করে উঠল।

তার সব সাহস উবে গেছে। জীবনে সে কোনওদিন মারপিট করেনি, এমনকী খেলার মাঠে মারপিট হতে দেখলেও সে সবসময় উলটোবাগে ছুটেছে। অচিন্ত্যর গালে একটা বোমা ফাটল। কেতার রোদচশমাটা ছিটকে চলে গেল পাশের ঝোপে। সে-ও মাটিতেই ছিটকে পড়ত, যদি না ওই আশিস নামে ছেলেটা তাকে ধরে রাখত।

'তুই ছাড়া আর কেউ জানত না।' তৌফিক হিসহিস করে উঠল।

'প্লিজ তৌফিকদা। বিশ্বাস কর। আমি কিচ্ছু বলিনি। কাউকে বলিনি। আমার বাড়িতেও কেউ জানত না। বাবা লোক লাগিয়ে তোমাকে মারেনি। প্লিজ বিশ্বাস কর।' অচিন্ত্যর গালটা জ্বালা জ্বালা করছে, জিবে নোনতা স্বাদও টের পেল। নিজেকে ছাড়াবার একটা দুর্বল চেষ্টা করল অচিন্ত্য। আশিসবেটা তার হাত দুটো চেপে ধরে রেখেছে পিছন থেকে।

কৃষ্ণা চিৎকার করে উঠল, 'তৌফিকদা। কী করছ তুমি? দাদাইকে মারছ কেন? ছাড় বলছি।'

অন্য ছেলেটা এগিয়ে গেল কৃষ্ণার দিকে। 'এই যে মামণি, দেখছ না, বড়রা কথা বলছে?'

অচিন্ত্য আশিসের হাতের মধ্যে ছটফট করে উঠল, 'অ্যাই, ওর গায়ে হাত দেবে না।'

ছেলেটার কৃষ্ণাকে একটু ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল বোধহয়, কিন্তু তার আগেই তৌফিক এগিয়ে এসে ছেলেটার হাত চেপে ধরল, 'এই, মেয়েটার সঙ্গে কী করছিস? খবরদার!'

কৃষ্ণা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সত্যি তার সাহসের তুলনা হয় না। সে তখনও মিনমিন করে বলল, 'তৌফিকদা, আমাদের যেতে দাও।'

'তোকে কেউ আটকাচ্ছে না। চলে যা।' তৌফিক বলল।

'কিন্তু...' কৃষ্ণা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল।

তৌফিক হাত তুলল, 'চড় খেতে চাস? নয়তো পালা। বলছি না, আমার সঙ্গে অচিন্ত্যর কথা আছে।' তৌফিকের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

'আমি সত্যি কিছু জানতাম না তৌফিকদা। আর তা ছাড়া এতদিন পরে এখন তুমি কেন ওসব টানছ? আমি কী করব বল? প্লিজ আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তো আগেই জানতাম। কাউকে কিছু বলিনি তো। হঠাৎ সেদিন কেন বলব? তাহলে তো প্রথমেই বলতাম।' অচিন্ত্যর করুণ গলা শোনা গেল।

'কারণ, তুই একটা জাত শয়তান। মওকা বুঝে কোপ দিয়েছিস, যাতে আমাদের আর কিছু করার না থাকে।' তৌফিক ঘুরে দাঁড়াল। অচিন্ত্য ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

কৃষ্ণা ছুটে এসে তৌফিকের হাতটা চেপে ধরল। 'তৌফিকদা, আমি জানি না দাদাই কী করেছে, কিন্তু তুমি দাদাইকে কেন মারছ? যদি দাদাই কিছু করেও থাকে, সেটা কি ফেরত নেওয়া যাবে, নাকি দাদাইকে মারলে সেটা আগের মতো হয়ে যাবে?'

কৃষ্ণার গলা কেঁপে যাচ্ছিল, তার চোখে জল এসে গেছে। তৌফিকদাকে সে অনেক অল্প বয়স থেকে দেখেছে। সর্বানন্দপুরে দাদুর বাড়িতে তার বারবার ছুটে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তৌফিকদা। হিরো তৌফিকদা। যেমন রূপ, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি। এখনও এখানে তৌফিকদার উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট কেউ টপকাতে পারেনি। ছোটবেলায় সে

যখন গ্রামে থেকে শান্তিনিকেতনের স্কুলে পড়ত, তখন মা প্রায়ই বলত, তৌফিকের পা ধুয়ে জল খা, যদি তাতে মগজে ঘিলু একটু বাড়ে।

মামাবাড়িতে এলে কৃষ্ণা তৌফিকদার দর্শন পাওয়ার জন্যে বসে থাকত। মাধ্যমিকের কয়েক মাস আগে থেকে তৌফিকদা দাদাইকে তো পড়াচ্ছিলও। গত বছর গরমের ছুটিতে কৃষ্ণা যখন মামাবাড়ি এসেছিল, তখনও তারা তৌফিকদার সঙ্গে কত গল্প করেছে, আড্ডা মেরেছে! কত মজা, গান, হাসি, ঠাট্টা! শুধুমাত্র গত দুর্গাপুজোতে মামাবাড়ি এসে সে তৌফিকদাকে দেখতে পায়নি। মাত্র কয়েক মাস, তার মধ্যেই তৌফিকদার এরকম বদল কৃষ্ণা ভাবতেও পারছে না।

তৌফিক কৃষ্ণার চোখে কী দেখল কে জানে, নিজেকে গুটিয়ে নিল।

'জ্ঞান দিস না কৃষ্ণা। ছাড় আমাকে।' কৃষ্ণার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে তৌফিক অচিন্ত্যর কাঁধে হাত রাখল। অচিন্ত্য নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল। 'এদিকে আয়। মারব না, আয়।'

তৌফিক অচিন্ত্যকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেল। 'তোদের কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু কৃষ্ণা ঠিক বলেছে, তোকে মারলে সবকিছু আগের মতো হয়ে যাবে না।' অচিন্ত্যর বুকে একটু আশা জাগছিল, কিন্তু তৌফিকের পরের কথাতেই সেটা নিবে গেল, 'আমি লতার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সেই ব্যবস্থা তুই করে দিবি।'

'তৌফিকদা!' অচিন্ত্যর গলা কেঁপে গেল। 'প্লিজ তৌফিকদা! আমার দিদির লাইফটা তুমি শেষ করে দিয়ো না।'

তৌফিকের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, 'আমি তোর দিদির লাইফ শেষ করছি? তোরা... তোর বাবা আর দাদু মিলে লতার লাইফ শেষ করে দিয়েছে রে বাস্টার্ড। লতা আমাকে ভালোবাসে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ, আর তার মধ্যেই তোরা জোর করে বিয়ে দিয়ে ওকে সরিয়ে ফেললি।'

'কিন্তু এখন তো দিদি ভালো আছে। তুমি এখন কেন...' অচিন্ত্য কথা শেষ করতে পারল না।

'ভালো আছে মানে? বিয়ে করে লতা ভালো আছে, এটা তুই আমাকে বলতে চাস?' তৌফিক রুক্ষ হয়ে উঠল।

'দিদির বেবি হবে তৌফিকদা।' নিজের অজান্তেই অচিন্ত্যর মাথা নিচু হয়ে গেল। যেন তার দিদি নয়, সে-ই এই মহাপাপটা করেছে।

'কী?' তৌফিকের হিংস্র গলা শোনা গেল। তৌফিকদা কি আবার মারবে? ওই ডাম্বেল-ভাঁজা হাতের একটা ঘুষি খেলেই অচিন্ত্য মরে যাবে নিশ্চিত।

'দিদির বেবি হবে। আমি মিথ্যে বলছি না। তুমি তোমার ভাবিকে জিজ্ঞেস কর বাড়ি গিয়ে। ভাবি জানে। দু-দিন আগেই মায়ের সঙ্গে ভাবির দেখা হয়েছিল।' অচিন্ত্য হড়বড় করে বলল।

তৌফিকের থতমত খেয়ে-যাওয়া মুখটা দেখে অচিন্ত্যর খুব খারাপ লাগছিল। গ্রামসুদ্ধ সবাই জেনে গেছে তৌফিকদা আর লতাদির কথা। কিন্তু তৌফিকদা কি ভেবেছিল, দিদি বিয়ের পরেও তৌফিকদার জন্যে অপেক্ষা করবে?

‘তুমি ভুলে যাও দিদির কথা। দিদি ভালো আছে। প্লিজ, তুমি দিদিকে ছেড়ে দাও।’ অচিন্ত্য একটু থেমে যোগ করল, ‘আর আমাকেও।’

‘মিথ্যে। আমি বিশ্বাস করি না।’ তৌফিকের ভাঙাচোরা মুখটা দেখে অচিন্ত্যর খারাপ লাগছিল, কিন্তু জয়ন্তদা খুব ভালো মানুষ। তা ছাড়া বাবা বা দাদু তো কখনওই তৌফিকদার সঙ্গে দিদির ব্যাপারটা মেনে নিত না, বরং এটাই ভালো হয়েছে অচিন্ত্যর মতে।

আখের রস খাওয়া মাথায় উঠল। অচিন্ত্য যখন কৃষ্ণার হাত ধরে রাস্তায় ফিরে গেল, তখন শাম্ভবী আর সোলাঙ্কী সেই ঠেলাওয়ালা আর বিশুদাকে নিয়ে জঙ্গলে নেমে ওদের খুঁজতে যাওয়ার উপক্রম করছে। গাড়ির কাছে এসে কৃষ্ণা বলল, ‘চল্ দাদাই, বাড়ি ফিরি। আজকে আর ঘুরতে যেতে হবে না।’

‘নাহ্। চল্, এমন কিছু টাইম ওয়েস্ট হয়নি।’ অচিন্ত্য বলল।

‘কিন্তু আবার যদি?’ কৃষ্ণা ভয় পাচ্ছিল।

‘কিচ্ছু হবে না।’ অচিন্ত্য বলল।

সোলাঙ্কী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘না না, কোনও দরকার নেই ঘুরতে যাওয়ার। বাড়ি ফিরে চল এখুনি।’

‘এখন বাড়ি গেলে সবাই হাজারটা প্রশ্ন করবে। আর বাড়িতে এখন দিদি-জামাইবাবুও এসেছে। আমি চাই না, এইসব বিষয় নিয়ে বাড়িতে এখন কোনও কথা উঠুক।’ অচিন্ত্য মাথা নাড়ল।

‘কী সব বিষয়? তৌফিকদা এমন ব্যবহার করছিল কেন? আর ওই শয়তান ছেলেগুলোর সঙ্গেই বা মিশছে কেন? তুই কী এমন বললি তৌফিকদাকে যে, একেবারে আর কিছু না বলেই ছেড়ে দিল?’ গাড়িতে ওঠার আগেই একরাশ প্রশ্ন নিয়ে কৃষ্ণা ঝাঁপিয়ে পড়ল অচিন্ত্যর উপরে।

অচিন্ত্য অন্যমনস্কভাবে বলল, ‘এখন নয়। বোলপুর চল্, সব বলব।’ অচিন্ত্য বিশুর সামনে খোলাখুলি সব আলোচনা করতে চাইছিল না। যতই সোলাঙ্কীদের দু-বছরের পুরানো ড্রাইভার হোক, তবু এইসব পারিবারিক বিষয় তার সামনে বলা যায় না।

সোলাঙ্কী একটা বোরোলিনের টিউব বার করে কৃষ্ণাকে দিল অচিন্ত্যকে দেওয়ার জন্যে। অচিন্ত্যর ঠোঁটটা কেটে গেছে, রক্তও গড়াচ্ছে।

কৃষ্ণা নিচুস্বরে অচিন্ত্যকে ডাকল, ‘এই দাদা, ঠোঁট কেটে গেছে তোর।’

অচিন্ত্য অন্যমনস্কভাবেই বলল, ‘তৌফিকদার হাতে আংটি ছিল।’

দশ

জুলাইয়ের মাঝামাঝি। আর এখন জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ। মানে ওই মাস ছয়েক আগে। অচিন্ত্যর স্পষ্ট মনে আছে দিনটা। পরের দিন দিদির আশীর্বাদ। জয়ন্তদার সঙ্গে দিদির সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে মাসখানেক আগেই। রীতিমতো ঘটক দিয়ে সম্বন্ধ করে কোষ্ঠীবিচারে ষোলোগুণ মিলিয়ে খুঁজে পাওয়া পাত্র। দিদির বিয়ের কথাটথা তখন সব পাকা। জয়ন্তদার মা-বাবা এসে শুধু আশীর্বাদ করবে।

কী একটা প্র্যাকটিক্যালের খাতা জমা দিতে হবে বলে দিদি কলেজ গেল আগের দিন সকালবেলা। আর ফিরল না। দশটা বাজার আগেই বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। মা অজ্ঞান হয়ে গেল। বাবার বুকে যন্ত্রণা শুরু হল। অচিন্ত্যর অবস্থা তখন শাঁখের করাত। যেতে গেলেও কাটবে, আসতে গেলেও। বাড়িতে একমাত্র সে-ই জানে, দিদি কী করেছে।

মাধ্যমিকের প্রায় মাস চারেক আগে থেকেই অচিন্ত্যর জন্য তৌফিককে বহাল করেছিলেন তারকনাথ নিজে। অচিন্ত্য নাকি দিন দিন বখাটে হয়ে যাচ্ছে। নাতি যদি মাধ্যমিকের বেড়া এক লাফে না ডিঙাতে পারে, তার থেকে লজ্জার আর কী আছে। মাধ্যমিকের আগেই অচিন্ত্য বুঝে যায়, প্রতি শনি-রবিবার কলকাতা-বোলপুর জার্নি করার পিছনে শিক্ষকতার মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য আকর্ষণ আছে। অচিন্ত্যকে ঠেলে মাধ্যমিকের বেড়া পার করানোর সঙ্গে সঙ্গে, তৌফিক নিজেও আর কারও সহায়তায় অন্য একটা বেড়া ডিঙাতে চাইছিল।

সেদিন রাত্রে দিদির কোনও খবর না পেয়ে দুশ্চিন্তায় মা-বাবা দুজনেই যখন শুয়ে পড়ল, তখন সে চুপ থাকতে পারেনি। দিদি যে তৌফিকদার সঙ্গেই পালিয়েছে তা বলে দিয়েছিল। বাবা আর দাদু রাত্রিবেলাই পুলিশ নিয়ে ছুটে গিয়েছিল সেই কলকাতা পর্যন্ত। কিন্তু তৌফিক বা লতা কাউকেই পাওয়া যায়নি। ভোরবেলা বাবা-দাদু দুজনেই ফিরে আসে খালি হাতে। দিদির পালানোর ব্যাপারটা কোনওরকমে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল পাত্রপক্ষের থেকে। সকালবেলা আশীর্বাদটা ক্যানসেল করতে হবে বলে সবাই যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে, তখন দিদি ফিরে আসে।

দিদি একা একাই ফিরে এসেছিল। সারারাত্রি সে বসে ছিল বর্ধমান স্টেশনে, ওয়েটিং রুমে। তৌফিকদা আসেনি।

বাবা, দাদু অথবা দিদির সঙ্গে কী কথা হয়েছিল জয়ন্তদার, তা জানে না অচিন্ত্য। কিন্তু জয়ন্তদার মা-বাবাকে ডাকিয়ে এনে, দু-দিন পরে গোধূলিলগ্নে জয়ন্তদার সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যায় দিদির।

বিশ্বভারতীর চৌহদ্দিতে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসে ছিল অনেকক্ষণ অচিন্ত্য। জেদ ধরে সে এল বটে, কিন্তু তার শরীরটা খুব একটা ভালো লাগছিল না। এতদিন সে ভীষণ ভয়ে ভয়ে ছিল। তৌফিকদা তাকে হাতে পেলে কী করবে, শুধু এই ভেবে। কৃষ্ণার জন্যে ব্যাপারটা অনেক অল্পের উপর দিয়ে গেছে।

শান্তিনিকেতনে ভবন, আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, ঘণ্টাতলা, তালধ্বজ, দেহলি সব ঘুরে দেখে কৃষ্ণারা ফিরে এল, অচিন্ত্য যেখানে বসে ছিল। কৃষ্ণাকে সবকিছু খুলে বলতেই হল।

'লতাদিকে তৌফিকদা?' কৃষ্ণা আকাশ নয়, একেবারে মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে আছাড় খেল। গত বছর গরমের ছুটিতে সে শেষ এসেছিল। তারপর থেকে আর আসা হয়নি। মা-বাবা কিছু জেনে থাকলেও, তাকে কিছুই জানায়নি।

'তা এই তৌফিক এল না কেন সেইদিন বোলপুরে?' সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

'দিন পাঁচেক পরে, দিদি চলে গেল জয়ন্তদার সঙ্গে গৌহাটি। তারপরে তৌফিকদাকে পাওয়া গেছিল। কারা যেন রাত্রিবেলা ওদের বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যায়। প্রাণে মারেনি— এইটুকুই যা। সেই থেকেই তো পুরো গ্রামে রটে গেল ওদের ব্যাপারটা। সবাই জেনেও গেল।'

'ওহ্ মাই গড।' কৃষ্ণা দু-হাতে মুখ ঢাকা দিল।

'সে কী! তারপর?' সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

'হাসপাতালে ছিল অনেকদিন। মাল্টিপ্‌ল ফ্র্যাকচার, চারটে না পাঁচটা অপারেশন হয়েছিল। সম্পূর্ণ সেরে উঠতে প্রায় মাস পাঁচেক সময় লেগেছিল। শুনেছিলাম, বি স্ট্যাটের পরীক্ষাও সিকবেড থেকেই নাকি দিয়েছে। তখনও হাঁটতে পারত না। কলকাতায় ওর কোনও এক চাচার বাড়িতেই তৌফিকদাকে রাখা হয়েছিল, যাতে করে পরীক্ষাটা অন্তত দিতে পারে। গ্রামে এসেছে এই কিছুদিন হল। এই প্রথম দেখা হল আমার সঙ্গে।' অচিন্ত্য বলল।

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে উঠল, 'কারা তুলে নিয়ে গেছিল তৌফিকদাকে?'

'জানি না। তৌফিকদা নিজেও জানে না। শুনেছি, কাউকে নাকি দেখতে পায়নি। চোখ বাঁধা ছিল। যথারীতি বাবার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন্টা জমা পড়েছিল। পুলিশও এসেছিল এনকোয়্যারি করতে। বাবা তো জোনাল পার্টির মেম্বার, তাই বেশি ঘাঁটায়নি। কিন্তু তৌফিকদার এক বন্ধুও এখন পুলিশে আছে। বোলপুর থানাতেই পোস্টিং। তাই ব্যাপারটা অত চটজলদি মেটেনি। তবে পুলিশ মনে করে, যারা তৌফিকদাকে তুলে নিয়ে গেছিল, তারা সবাই বাইরের গুন্ডা। কিন্তু তৌফিকদা সেটা বিশ্বাস করে না। তৌফিকদা মনে করে, বাবাই লোক লাগিয়ে...', অচিন্ত্য জানাল।

কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, 'লতাদি জানে এই সমস্ত কিছু? তৌফিকদাকে যে...'

অচিন্ত্য ঘাড় নাড়ল, 'তখন তো ও শ্বশুরবাড়ি চলে গেছিল। আমরা কিছুই বলিনি। তবে পরে কোনওভাবে জেনেছে মনে হয়। এবারে আসার পর থেকে দেখিস না, একদম কথা বলে না কারও সঙ্গে। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া থাকে। নিজের ঘর থেকে বেরয় না। কিন্তু জানলেও তো কিছু করার নেই, বিয়ে হয়ে গেছে। তা ছাড়া জয়ন্তদা সত্যিই খুব ভালো মানুষ। এখন তো দিদি কনসিভও করে গেছে। আর কী হবে?'

'তৌফিকদা জানে লতাদি প্রেগন্যান্ট?' কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

অচিন্ত্য ঘাড় নাড়ল, 'আজকেই জানল। আমার থেকে।'

'তোমাকে জোর মেরেছে। ঠোঁটটা কতখানি কেটে গেছে।' শাম্ভবী বলল।

'তৌফিকদার হাতে আংটি ছিল।' অচিন্ত্য একটু অন্যমনস্ক হল। 'গত বছর ওই আংটি পরিয়ে ওরা বিয়ে করেছিল।'

'মানে?' কৃষ্ণা চেঁচিয়ে উঠল।

'আরে, আমার তখন মাধ্যমিক সবে শেষ হয়েছে। এপ্রিল মাস নাগাদ। একদিন দেখি দিদির হাতে নতুন আংটি। তৌফিকদার হাতেও। তখনই আমার সন্দেহ হয়। চেপে ধরতেই দিদি স্বীকার করে। ওরা নাকি তারাপীঠে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে এসেছে।'

'রেজিস্ট্রি করেছে! ও মাই গড। দেন দে আর লিগ্যাল। তৌফিকদা তাহলে চাইলেই জয়ন্তদা আর লতাদির বিয়েটা ক্যানসেল করিয়ে দিতে পারে।' সোলাঙ্কী বলে উঠল।

সোলাঙ্কীর কথায় অচিন্ত্যও চমকে উঠল, তা-ই তো, এই ব্যাপারটা তো তার মাথাতেই আসেনি। এবার কী হবে?

'লতাদির বেবি হবে— এটা জানতে পারলে, তৌফিকদা আশা করি, ওদের মধ্যে আর কাবাব মে হাড্ডি হবে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কৃষ্ণা বলে উঠল।

'কিন্তু রেজিস্ট্রি?' সোলাঙ্কী প্রশ্ন করল।

'হুম। ওটা একটা ফ্যাক্টর তো বটেই। তবে লতাদির উচিত তৌফিকদার থেকে ডিভোর্স চেয়ে নেওয়া।' কৃষ্ণা বলল।

অচিন্ত্য উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ বসে আছে, পা-টা একটু ছাড়াবার দরকার। অচিন্ত্য উঠে যাওয়ার পরে সবাই আবার চুপচাপ হয়ে গেল। সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা কী যেন ভাবছে নিবিষ্টমনে।

'তাহলে ওই দাদাটা কী করবে?' এতক্ষণে শাম্ভবী জিজ্ঞেস করল।

'কী আর করবে? চাকরি নিয়ে চলে যাবে বাইরে, যা ব্রিলিয়ান্ট পিস, বিদেশেও চলে যেতে পারে। কয়েক বছর বাদে বিয়েও করে নেবে অন্য কাউকে।' কৃষ্ণা বলল।

'নয়তো লতাদির লাইফটা ঘেঁটে দিতে পারে। তার হাতে একটা বেশ বড়সড়ো অস্ত্র আছে।' সোলাঙ্কী বলে উঠল।

'তৌফিকদা ভালো ছেলে। ও লতাদির কোনও ক্ষতি করবে না। ইন ফ্যাক্ট, আজ সকালে তৌফিকদাকে ওইরকম দেখে আমি জাস্ট মেনে নিতে পারছিলাম না।' বলতে বলতে কৃষ্ণা সোলাঙ্কীর দিকে তাকাল, 'জানিস, আমার জীবনের প্রথম ক্রাশ ছিল তৌফিকদা।'

সোলাঙ্কী কৌতুকে চোখ বড় বড় করে তাকাল কৃষ্ণার দিকে।

'রিয়েলি। তৌফিকদাকে তো দেখলিই। সো হ্যান্ডসাম। তৌফিকদা যখন হাসে, উফ, ইচ্ছে করে জাস্ট একটা চুমু খেয়ে নি।' কৃষ্ণা বান্ধবীর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে গুনগুন করে 'কবীর সুমন' গেয়ে উঠল,

> 'ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ব্যারিকেড কর প্রেমের পদ্যটাই
> বিদ্রোহ আর চুমুর দিব্যি শুধু তোমাকেই চাই।'

'হয়েছে। আর চুমু খেতে হবে না। চল্, আখের রস খাবি?' সোলাঙ্কী উঠে পড়ল।

'আমি দেখেছি, গেটের কাছে একটা দাঁড়িয়ে আছে। চল চল।' শাম্ভবী আগে আগে দৌড় দিল।

ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়া আর মাথার উপরে সূর্য তাপ ছড়াচ্ছে। পরিবেশে দিব্যি দুটো বিপরীত আবহাওয়া সহাবস্থান করছে। কৃষ্ণার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে সোলাঙ্কী ভাবছিল। মানুষও কি এমন? নিজের আবেগ নিয়ে যেখানে মানুষ সারাক্ষণ তপ্ত হয়ে থাকে, ঠিক সেখানেই অন্যের আবেগের প্রতি সে একই রকম হিমশীতল ঠান্ডা। নাকি

মানুষ নিজের আবেগেই এত অন্ধ হয়ে থাকে, যে অন্যের আবেগ তার কাছে শুধুমাত্র দূরাগত কিছু শব্দ হয়েই ধরা দেয়? নাকি মানুষ আশাবাদী? খানিক ভালো আর খানিক ঠিকের আশা নিয়েই সে যে পথে একবার এগিয়ে গেছে, সেই পথেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে?

***

বিকেলবেলা নদীর ধারে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন তারকনাথ। সকালবেলাই অচিন্ত্যরা শান্তিনিকেতন দেখতে চলে গেছে। জয়ন্ত কাজে গিয়েছিল, এই একটু আগে ফিরেছে। ক্ষীণকায়া কোপাই নদীর দিকে তাকিয়ে তারকনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। গতকাল বিকেলে নাতনিদের সমবেত আবদারে, বিশেষ করে শাম্ভবী তাঁকে জ্বালিয়ে মেরেছে বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য। তিনি বাধ্য হয়েছেন ঘুরতে যাওয়ার মত দিতে। অবশ্য ওদেরকে বেরতে না দিলে অচিন্ত্যর মা-বাবারও সন্দেহ হতে পারে।

দু-দিন আগে শ্মশানে যা ঘটেছে, জয়ন্ত এসে সবই তাঁকে বলেছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ঘটনাটা অচিন্ত্যর মা-বাবাকে জানতে দেননি। ওরা জানতে পারলে এখুনি মেয়ে দুটোকে বাড়ি-ছাড়া করিয়ে ছাড়বে। তিনি তো তা হতে দিতে পারেন না।

শ্মশানের ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বেশি অদ্ভুত শাম্ভবীর গতকালের ব্যবহার।

গতকাল সকালে তিনি ঘরে বসে কাগজপত্র দেখছিলেন। আচমকা শাম্ভবী এসে ঘরে ঢোকে। এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছিল সে। প্রথমে তারকনাথ পাত্তা দেননি। পরে শুনলেন, শাম্ভবী বিড়বিড় করছে।

'সাধুটা ভালো না। সাধুটা ভালো না।'

যথারীতি তিনি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে শাম্ভবী জানায়, 'কিছুদিন আগে যে সাধুটা তাদের বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল, সেই সাধুটাই শ্মশানে ছিল। সাধুটা ভিক্ষা চাইতে আসার দিন শাম্ভবীকে সাধনসঙ্গিনী করার কথা, ভৈরবী হওয়ার কথা বলেছে।'

তারকনাথ একটু চিন্তিত হয়েছিলেন বটে। এইসব সাধুকে তিনি ভালোই চেনেন। রাঢ় অঞ্চলে এদের দৌরাত্ম্য কিছু কম নয়। আগেকার দিনে সেরকম গুণসম্পন্ন মেয়ে দেখলে তুলে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করত না এরা। এখন অবশ্য সাধুদের অত সাহস হবে না। তবু তারকনাথ শাম্ভবীর সুরক্ষার কথা ভাবছিলেন।

কিন্তু তারপরেই শাম্ভবীর কথাগুলো তাঁকে একদম নাড়িয়ে দিয়েছিল। এক অদ্ভুত সুর করে শাম্ভবী দুলে দুলে ফিসফিসিয়ে বলছিল, 'সাধুটা সাবধান... আমার তেষ্টা পাচ্ছে... আমার ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে...'

এগারো

ওরা যখন সোনাঝুরি পৌঁছাল, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। মাঝ-আকাশ থেকে সূর্য নেমে এসেছে গাছের মাথায়। সোনাঝুরির জঙ্গলের এক প্রান্তে বড় বড় শাল গাছের মাঝে অনেক দোকানি পসার নিয়ে বসেছে, শনিবারের হাট।

মেলার এক ধারে একটা সাপুড়ে সাপখেলা দেখাচ্ছে। শাম্ভবী কৃষ্ণাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল সেইদিকে। সোলাঙ্কী মেলায় ঘুরে ঘুরে সাঁওতালিগয়না থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসংগীত প্রিন্ট করা বাটিক শাড়ি সবই দেখছিল। অচিন্ত্য গাড়ি থেকেই নামেনি। তার নাকি ভালো লাগছে না।

একটা লাল-হলুদে বাটিক প্রিন্ট করা রবীন্দ্রসংগীতের লাইন-লেখা শাড়ি সোলাঙ্কীর বেশ পছন্দ হল। দামটা একটু চড়া হাঁকছে। সোলাঙ্কী একবার এদিক-ওদিক তাকাল। কৃষ্ণা এখানকার মেয়ে। সে দামগুলো ভালো জানবে।

সোলাঙ্কী সাপুড়ের ভিড়টার দিকে এগিয়ে গেল। কৃষ্ণা মন দিয়ে মোবাইল ফোনে সাপখেলা ভিডিয়ো করছে।

সোলাঙ্কীর ডাকে ফিরে তাকাল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, 'ঘ্যামা ভিডিয়ো নিয়েছি। ফেসবুকে দিলে হাজারখানেক লাইক বাঁধা। ভাইরালও হয়ে যেতে পারে।'

কৃষ্ণার কথাকে পাত্তা না দিয়ে সোলাঙ্কী বলে উঠল, 'কৃষ্ণা, শামু তোর সঙ্গে ছিল না একটু আগেই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু... এই তো সাপখেলা দেখছিল। এই তো একটু আগে... কই গেল?' কৃষ্ণা থতমত খেয়ে বলল।

সোলাঙ্কী বেকুবের মতো এদিক-ওদিক তাকাল। শাম্ভবীকে দেখা গেল না কাছেপিঠে। সোলাঙ্কী একটু ঝাঁজিয়ে উঠল, 'আরে, মেয়েটাকে একটু খেয়াল রাখবি তো। জানিস তো কীরকম দুরন্ত!'

কৃষ্ণার মুখ নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে দ্রুতপায়ে পসারিদের চারপাশে জমা ভিড়গুলো খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে গেল। ইস্, ওর আরও কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল। পরশুর ঘটনার পরে অবশ্যই শাম্ভবীকে সবসময়ে নজরে রাখা উচিত ছিল ওদের। সারা হাট তন্নতন্ন করে খুঁজেও শাম্ভবীকে দেখতে পেল না কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কী।

অচিন্ত্যর কাছে ফিরে সব কথা জানাতে, মুহূর্তে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে অচিন্ত্য। সকালের নিগ্রহ থেকে শুরু করে এখনকার উদ্‌বেগ। অচিন্ত্যর মনে হল, শাম্ভবীকে হাতের কাছে পেলে আর ডাকিনী-যোগিনী মানবে না সে, কষিয়ে একটা চড় মারবে।

শীতের সন্ধে দ্রুত দখল করছে জঙ্গল। লোকজন ফিরে যেতে শুরু করেছে। পসারিরাও জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে নিচ্ছে। ফাঁকা হয়ে আসছে হাট। পরশুর ঘটনা রিপিট হবে নাকি?

সোলাঙ্কী কৃষ্ণার হাত চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী হবে কৃষ্ণা? অন্ধকার হয়ে আসছে যে।'

টেনশনে অচিন্ত্যরও হাল খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবু সে হালকা গলায় বলল, 'আবার কোথায় জঙ্গলের মাঝখানে ধ্যান করছে দেখ্ গে।'

অচিন্ত্যর কথা শুনে সোলাঙ্কীর আপাদমস্তক জ্বলে গেল, সে দৃঢ় গলায় বলল, 'না। সেদিনের পরে শামু আমাকে কথা দিয়েছিল, ও একা একা কোথাও যাবে না।'

ড্রাইভারহীন ফাঁকা গাড়িটার মধ্যে উঁকি মেরে কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, 'বিশুকাকু গেল কোথায় এর মধ্যে?'

ফোন করে ডাকতেই বিশু ফিরে এল। সে মেলাটা একটু ঘুরে দেখছিল। অবস্থা বুঝে সে বলল, একবার সোনাঝুরির জঙ্গলটাও দেখতে পারলে হত। গাড়ির ড্যাশবোর্ডে একটাই টর্চ ছিল, সেটা নিয়ে এল বিশুদা। সবাই মিলে জঙ্গলের দিকে হাঁটা দিল।

চারজনে মিলে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরেও শাম্ভবীকে পাওয়া গেল না। গোধূলির শেষ রক্তাভাটুকুও মুছে গেছে আকাশ থেকে। লম্বা লম্বা গাছ বেয়ে জমাট অন্ধকার আর কুয়াশা নেমে আসছে সোনাঝুরিতে।

'সন্ধের সময় সোনাঝুরির জঙ্গলে মেয়েদের নিয়ে এসেছিস অচিন্ত্য। ধন্য তোকে!' ভারী গলার আওয়াজ শুনে সবাই ফিরে তাকাল। তারা খেয়াল করল, একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট আগুন জ্বালিয়ে বেশ কিছু ছেলে বসে আছে। তৌফিকও আছে সেই দলে।

কৃষ্ণা ছুটে গেল ওদের দিকে, 'তৌফিকদা, তোমার হেল্প চাই। শাম্ভবী হারিয়ে গেছে।'

অচিন্ত্য কৃষ্ণাকে প্রায় টেনেই সরিয়ে নিয়ে এল। কৃষ্ণার নজরে না পড়লেও অচিন্ত্য বুঝে গেছে, ওই ছেলেগুলো কেন জড়ো হয়েছে এই অন্ধকারে। তৌফিকদা ওই জানোয়ারগুলোর দলে ভিড়ে এখানে মদ গিলতে এসেছে।

'পাগল নাকি তুই!' ফিসফিস করে বলল অচিন্ত্য। 'ওরা ড্রিংক করছে। ওদের কাছে যাস না।'

'এই, কী হয়েছে বে?' তৌফিক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাল। আগুনের ধিকিধিকি আলোয় তৌফিকের হাতে ধরা কাচের বোতলটা এবার কৃষ্ণা দেখতে পেল। সে পিছিয়ে এসে সোলাঙ্কীর হাত চেপে ধরল।

বিশুকাকু এগিয়ে গেল দলটার দিকে, 'আপনারা কি কোনও বাচ্চা মেয়েকে দেখেছেন এইদিকে আসতে? এই ধরুন আট-নয় বছর বয়স।'

তৌফিকের পিছন থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, 'শালা! মাল খাওয়ার সময় যত বাওয়ালি। কাউকে দেখিনি আমরা। ভাগ এখান থেকে।'

'কী হয়েছে বললি?' তৌফিক কয়েক পা এগিয়ে এল ওদের দিকে, ও কি টলছে? অচিন্ত্য সরে পড়ার তাল খুঁজছিল।

'শামু হারিয়ে গেছে। আমরা ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা কাউকে দেখনি তো? ঠিক আছে, আমরা চলে যাচ্ছি। তোমাদের ডিস্টার্ব করব না।' কৃষ্ণা শুকনো মুখে বলল।

কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কীর হাত ধরে টান দিল অচিন্ত্য। তার ভয় লাগছে। এখানে পাঁচ-ছয়টা ছেলে আছে। শীতকালের সন্ধে বড্ড তাড়াতাড়ি নামে। এর মধ্যেই আশপাশ নিকষ অন্ধকারে ঢেকে গেছে। ওরা ডালপালা জড়ো করে ছোট আগুন জ্বালিয়েছে একটা। তাতেই আবছায়া দেখা যাচ্ছে চারধার। ছেলেগুলো তাদেরকে দেখে নিজেদের মধ্যে কীসব ফিসফিস করছে। দুটো সিটিও হাওয়ায় ভাসল। কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কীকে নিয়ে এখানে আসা উচিতই হয়নি, এই বোকামিটা সে করতে পারল কী করে!

বিশুদাও সরে এসেছে।

সে অচিন্ত্যর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল, আমরা চলে যাই।'

'এই দাঁড়া।' তৌফিক বোতলটা রেখে, ছুটে এল ওদের কাছে। 'কে হারিয়ে গেছে বললি?'

অচিন্ত্য থতমত খেয়ে সোলাঙ্কীর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'এর বোন।'

তৌফিকের মুখ-চোখ দেখে মনে হল, সে সকালের কথা মনে করার চেষ্টা করছে। 'ওই বাচ্চা মেয়েটা? লাল জামা আর কালো প্যান্ট!'

এত কিছুর মধ্যেও কৃষ্ণা চমৎকৃত হল। এই না হলে তৌফিকদা! সকালের ওই ঝামেলার মধ্যে একবার দেখেছে কি দেখেনি, ঠিক মনে রেখেছে!

তৌফিক এবার জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি হারিয়ে গেছে? কতক্ষণ হল?'

'এই তো মিনিট পনেরো-কুড়ি হবে, দেখতে পাচ্ছি না। এতক্ষণ তো আলোও ছিল। কিন্তু এখন...' অচিন্ত্য একটু দ্বিধা করে বলল, 'তুমি যাও। আমরা দেখছি।'

'মেয়েদের নিয়ে এখুনি গাড়িতে ফিরে যা তুই। গাড়ির কাচ তুলে বসবি।' তৌফিক ভারী গলায় আদেশ দিল। 'আর আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমরা খুঁজে দেখছি।' বিশুদার দিকে তাকিয়ে তৌফিক কথা শেষ করল।

অচিন্ত্য একবার কিন্তু কিন্তু করেও রাজি হয়ে গেল। বিশুদার থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে মোবাইল টর্চের আলোয় কোনওরকমে প্রায় ছুটে পেরিয়ে এল ওরা বাকি রাস্তাটুকু। গাড়ির মধ্যে কাচ তুলে বসতে একটু টেনশনটা কমল অচিন্ত্যর। রাতের অন্ধকারে সোনাঝুরি কখনওই সেফ নয়। এই গাড়ির মধ্যেও কতটা সেফ কে জানে?

কৃষ্ণা ততক্ষণে বাড়িতে ফোন করে ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে। বাড়ি থেকে বাবা আর জামাইবাবু আসছে বলে জানানো হল তাদেরকে। জয়ন্তদা তার মানে কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে। অচিন্ত্য একটু আশ্বস্ত বোধ করল।

তৌফিকরা ফিরে এল প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। তখনও উপাধ্যায়বাড়ির গাড়ি এসে পৌঁছায়নি সোনাঝুরিতে। অচিন্ত্য প্রায় প্রাণ হাতে করে বসে ছিল। আশ- পাশের খসখস আওয়াজে তার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ওই ছেলেদের দলটা এসে চড়াও হল তাদের উপরে। হেডলাইটের আলোয় তিনটে মানুষ এগিয়ে আসছে। একজনের কোলে একজন আর অন্যজন সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

অচিন্ত্য হাঁপ ছাড়ল।

সোলাঙ্কী এক প্রকার ছুটেই গেল তৌফিকের কাছে। গাড়ির কাছে এসে তৌফিক শাম্ভবীর অচেতন দেহটা কোল থেকে নামিয়ে দিল। সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা শাম্ভবীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'একটু জলের ব্যবস্থা কর দিদি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল জঙ্গলের মধ্যে। এই দাদাবাবু না থাকলে আজকে আর বোনকে ফেরত পেতে না। সারারাতেও খুঁজে পেতে কি না সন্দেহ।' বিশু ড্রাইভার জানাল।

সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। কৃষ্ণা প্রশ্নবোধক চোখে তাকাতেই বলল, 'অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গেছি খোয়াইয়ের খাদে, নয়তো আরও আগেই চলে আসতাম।'

‘আমাকেও একটু জল দে অচিন্ত্য।’ তৌফিক গাড়ির বনেটের উপরে হাত রেখে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল।

অচিন্ত্য তৌফিকের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ অবাক হয়ে গেল। তৌফিকের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। সে যেন খুব ভয় পেয়েছে।

অনেকখানি জল খেয়ে তৌফিক একটু ধাতস্থ হল। অচিন্ত্যকে কী একটা বলার জন্য সে মুখ খুলল। পরক্ষণেই হর্নের আওয়াজে দুজনে চমকে উঠে ফিরে তাকাল।

বাড়ির গাড়িটা এসে গেছে। গাড়ি থেকে জয়ন্ত আর অচিন্ত্যর বাবাকে নামতে দেখে তৌফিক সরে গেল। অচিন্ত্য কিছু বলার আগেই তৌফিক মিলিয়ে গেল সোনাঝুরির অন্ধকারে।

বারো

পরের দিন সকালে দোতলার বারান্দায় পাটি পেতে বসে সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা টোস্ট-অমলেট খেতে খেতে গল্প করছিল। শাম্ভবীর খাওয়া হয়ে গেছে। সে বিস্কুট ভেঙে ভেঙে কয়েকটা কাক আর শালিককে খাওয়ানোর তোড়জোড় করছে। গাছপালার আড়াল থেকে সকালের রোদছাপ লুটোপুটি খাচ্ছে। যেন একরাশ গোল গোল সোনার মোহর ছড়ানো দোতলার চক-মেলানো বারান্দার মেঝেতে।

গতকাল রাতে ডাক্তারখানায় গিয়ে স্মেলিং সল্ট না শোঁকানো পর্যন্ত শাম্ভবীর জ্ঞান ফেরেনি। জ্ঞান ফিরে পেয়ে শাম্ভবী জানিয়েছে, সে একটু জঙ্গল দেখতে চাইছিল। তারপরে অন্ধকার হয়ে যেতে ভয়ে ছুটোছুটি করে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

সোলাঙ্কী গতকাল খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাবাকে ফোন করে পরের দিনই চলে আসতে বলবে ভেবেছিল। কিন্তু রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় বলি বলি করেও সোলাঙ্কী কিছুতেই শাম্ভবীর কথাটা বলতে পারেনি, অথচ বলাই উচিত ছিল। কেন যে বলল না। সেই মুহূর্তে তার বলতে ইচ্ছা করল না। সে যেন কেমন সবকিছু ভুলে গেল। অন্য গল্প শুরু করে দিল বাবা-মায়ের সঙ্গে।

এরকম একটা ঘটনায় তারকনাথ খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। শাম্ভবী বাচ্চা মেয়ে। তাকে দেখে-শুনে না রাখলে, সে তো ছটফট করতেই পারে। এতে আর কারও কী-ই বা করার আছে? বিমলচন্দ্র আর সুরমাদেবী তারকনাথকে বারবার সেই কথাই বোঝাচ্ছিলেন। তবু তারকনাথ চুপচাপ বসে ছিলেন।

সুরমাদেবী আড়ালে গজগজ করছিলেন। 'বাবার এই এক দোষ, যেচে পরের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর এখন সামলাতে পারছেন না। আবার কাউকে কিছু বলতেও দেবেন না। কীভাবে যেন মাথায় ঢুকেছে, এ ওঁর অক্ষমতা। উপাধ্যায় পরিবার অতিথিদের রক্ষা করতে পারে না। এরকমটাই মনে হবে সবার।'

পরে তারকনাথ বারবার করে বলে দিয়েছেন, যতদিন না সোলাঙ্কীদের বাবা ফিরছে, ততদিন যেন বড়দের ছাড়া ওরা বাড়ির বাইরে কোথাও না যায়।

শাম্ভবী নিজেও কাল থেকে বেশ গুম মেরে গেছে। সে বিশেষ কথা বলেনি কারও সঙ্গে। আজ সকাল থেকে সে আবার স্বাভাবিক।

'চন্দ্রমৌলি কে?' শাম্ভবী হঠাৎ প্রশ্ন করল গল্পের মাঝে।

'তুই কী করে জানলি?' কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

'ওই ছাতের ঘরে চৌকাঠে নামটা লেখা আছে।' শাম্ভবী দাঁতে নখ কাটল।

'ইয়ে... মানে... ওই নামটা এই বাড়িতে কেউ নেয় না।' কৃষ্ণা জানাল। ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে মানুষ যেমন অভ্যাসবশে ঠাকুরের মূর্তি বা দেবালয় দেখলেই হাত জড়ো করে কপালে ঠোকে, তেমনিই প্রায় আজন্মলালিত সংস্কার থেকে ওই নামটাও মুখে আনতে কিন্তু কিন্তু বোধ করল কৃষ্ণা।

সোলাঙ্কী অবাক হয়ে তাকাল কৃষ্ণার দিকে, 'কেন?'

‘মা তো শুনলেই বলে, রাক্ষস!’ একটু থেমে গলা নামিয়ে কৃষ্ণা বলল, ‘খুন করেছিল নাকি!’

‘খুন!’ সোলাঙ্কী আঁতকে উঠে মুখে হাত চাপা দিল।

‘আমি মামিমার থেকে শুনেছি। মা-ও বলেছিল। আমাদের আরেকটা মাসি আছে। কাউকে বলিস না... ঘটনাটা আমার সেই মাসিকে নিয়েই। মাসির তখন বেবি হবে। তাই মাসি এসে এই বাড়িতে ছিল। সাত মাস না আট মাস। সেই ছেলে নাকি মাসিকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। বাচ্চাটা বাঁচেনি। মাসিকে অতিকষ্টে বাঁচানো গেছিল। পুরো ঘটনাটা ঘটেছিল দাদাইয়ের সামনেই। দাদাই তখন খুব ছোট ছিল। এত শক্‌ড হয়ে গিয়েছিল যে, তারপর থেকে বহুদিন কোনও কথা বলেনি, প্রায় বছরখানেকের মতো।’ একটু থেমে কৃষ্ণা আবার বলল, ‘দেখবি, ছাতের ঘরে দরজায় দুটো হাতের ছাপ আছে। ওটা নাকি ওই ছেলেটারই হাতের ছাপ। মাসির রক্ত ওর হাতে লেগে গেছিল। তারপরে ও সেই হাতে...’

‘বলিস কী, মারাত্মক ব্যাপার তো।’ সোলাঙ্কী শুকনো গলায় বলল।

‘কী হয়েছিল ন-দশ বছর আগে, সেই নিয়ে কথা না বলাই ভালো।’ কখন যেন অচিন্ত্য এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজায়। ‘ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।’

‘কিন্তু সবাই যে বলে, সেই ছেলেটা নাকি অস্বাভাবিক ছিল।’ কৃষ্ণা বলল।

‘সে তো ছিলই অস্বাভাবিক।’ ফ্যাকাশে গলায় কথাটা বলে অচিন্ত্য মনে মনে একটা প্রণাম ঠুকল ছাতের ঘরের উদ্দেশ্যে।

চন্দ্রমৌলিকে যেদিন প্রথম দেখে অচিন্ত্য, সেদিন তার পাঁচ বছরের জন্মদিন। কত ধুমধাম! বাড়ি ভরতি আত্মীয়স্বজন। তার মধ্যে কালো আলখাল্লা-পরা, ঝাঁকড়া চুল, মুখে জঙ্গলের মতো দাড়ি, কপালে বিশাল ত্রিপুণ্ড্রক আঁকা, হাতে ইয়াব্বড় একটা ত্রিশূল হাতে এক তান্ত্রিক এসে দাঁড়াল দরজায়। তাঁর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল উল্কি-আঁকা, মাথায় ওড়না, কালো ঘাগড়া-পরা একটা রাজস্থানি ভৈরবী। আর তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল চন্দ্রমৌলি।

তারকনাথ ছাড়াও অচিন্ত্যদের যে আরেক দাদু ছিল, এই কথাটা কেউই জানত না। ওই ভয়ংকর তান্ত্রিকই নাকি সেই দাদু। চন্দ্রমৌলির বয়স প্রায় অচিন্ত্যরই সমান ছিল। এক-দু-বছর এদিক-ওদিক হবে। তখন অচিন্ত্য খুবই ছোট ছিল। তার খুব ভালো মনে নেই সব কথা। দিদি তার থেকে কয়েক বছরের বড় ছিল। দিদিই পরে গল্প বলেছিল অচিন্ত্যকে।

সেই তান্ত্রিকদাদু নাকি অঘোরী প্রথায় সাধনা করতেন। কঙ্কালীতলার পুরানো শ্মশানে শবসাধনা করতেন ওই ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে। বছরখানেকের মধ্যেই এক অমাবস্যায় কঙ্কালীতলার শ্মশানে ঘটে গিয়েছিল এক ভয়ংকর ঘটনা। কারা যেন পৈশাচিকভাবে গলা মুচড়ে মেরেছিল তান্ত্রিক আর ভৈরবীর আলিঙ্গনাবদ্ধ শরীরকে। মৃত্যুটা এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে, পুলিশও বিশেষ জলঘোলা করেনি।

দাদু অবশ্য তারপরেও চন্দ্রমৌলিকে থাকতে দিয়েছিল বাড়িতে। বাড়ির সবাই মানা করেছিল, কিন্তু দাদু কোনও কথা শোনেনি। হয়তো তান্ত্রিকদাদুর মৃত্যুর পরে দাদুও ভয় পেত চন্দ্রমৌলিকে। ভয় অবশ্য সবাই পেত। কী অস্বাভাবিক দেখতে ছিল চন্দ্রমৌলিকে!

‘কী রে, অস্বাভাবিক ছিল কেন, বললি না তো?’

কৃষ্ণার প্রশ্নে অচিন্ত্য শুকনো গলায় বলল, 'ওর গায়ের রং ছিল একদম ধবধবে সাদা। দেখলে মনে হত শ্বেতপাথরের মূর্তি।'

'অ্যালবিনো!' সোলাঙ্কী বলে উঠল।

'জানি না। তবে একদম দুধের মতো সাদা। সামান্য নীলচে। মাথার চুলও নীলচে সাদা ছিল। ভুরু, চোখের পলক সব নীলচে সাদা। শুধু চোখের মণি নীল রঙের ছিল। অদ্ভুত লাগত তাকে দেখতে। সবাই ওই জন্যেই ওকে অপয়া বলত।'

'অ্যালবিনো ছিল বলে?' সোলাঙ্কী অবাক হল।

'না। ওর অনেকরকম ম্যাজিক্যাল পাওয়ার ছিল। ওই ছাতের ঘরে বাবা ওকে মাঝে মাঝে তালা দিয়ে আটকে রাখত। তালাবন্ধ ঘর থেকেও উধাও হয়ে যেত সে।'

'যাহ্!' কৃষ্ণার অবিশ্বাস।

অচিন্ত্য একটু রেগে গিয়ে বলল, 'মাসির ঘটনাটা যেদিন ঘটে, সেদিনও ওই ব্যাপারই হয়েছিল। ওকে বাবা আটকে দিয়েছিল ছাতের ঘরে। ওই বন্ধ ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর ওকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি।'

'আমি বিশ্বাস করি না। একটা মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না।'

অচিন্ত্য কৃষ্ণার কথার কোনও উত্তর দিল না। সে চুপ করে গেল। চন্দ্রমৌলির ব্যাপারে এত কথা সে আগে কখনও বলেনি।

চন্দ্রমৌলির কথা যে প্রথম তুলেছিল, সেই শাম্ভবীও চুপ করে বসে ছিল এতক্ষণ।

আচমকা শাম্ভবীর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সেই অজানা বালকের জন্য, তার অনন্ত কষ্টের জন্য বালিকার চোখে জল এল। নীলকমল, তুমি কি ফিরবে না?

তেরো

উপাধ্যায়বাড়ির পিছনদিকে পুকুর পারে বকুল গাছটার আড়ালে তৌফিক অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। আগের দিন অচিন্ত্যর কথাগুলো তাকে বাস্তবিকই নাড়িয়ে দিয়েছে। লতা প্রেগন্যান্ট! সেদিন বোলপুর স্টেশনে সে যখন লতাকে দেখেছিল, তখন লতা গাড়ির মধ্যে বসে ছিল। সে ভালো করে দেখতে পায়নি লতাকে। জয়ন্ত আর তারকনাথকে দেখেছিল গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে।

লতা প্রেগন্যান্ট! ওরা তার অনুপস্থিতিতে লতাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিল। কিন্তু প্রেগন্যান্ট! সেটা কি করে সম্ভব? ওই শয়তানটা কি ধর্ষণ করেছে লতাকে?

অচিন্ত্যকে দরকার। একবার লতার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কিন্তু ফোন করলেও বেটাচ্ছেলে ধরছে না। তৌফিক পুকুর পাড়ে বড় গাছগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। সে খেয়াল করল না, দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে এক গর্ভবতী মেয়ে সামান্য ঝুঁকে তাকেই দেখছে।

‘তুমি এখানে কী করছ?’ তৌফিক এমন চমকাল যে, তার হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে গেল।

কখন যেন লতা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে, সে খেয়ালই করেনি। কয়েক সেকেন্ড তৌফিকের বাক্যস্ফূর্তি হল না। সে নির্নিমেষে লতাকে দেখছিল। লতা অনেক রোগা হয়ে গেছে। তার বেঢপ ভারী শরীরের সঙ্গে সরু সরু হাত, উঁচিয়ে থাকা কণ্ঠের হাড় আর শুকনো মুখ বড্ড বেমানান লাগছিল।

‘লতা!’ তৌফিক এগিয়ে আসছিল লতার কাছে, কিন্তু লতা হাত তুলে তাকে থামতে বলল।

‘কী হয়েছে? এখানে কেন? কী চাও?’ লতা অস্বাভাবিক রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

‘লতা!’ তৌফিক বুঝতে পারল না কী বলবে।

‘কেন এসেছ এখানে?’ লতা আবারও একই প্রশ্ন করল।

‘আমি মানে, তুমি... ওটা কী করে হল?’ তৌফিক লতার বিস্ফারিত পেটের দিকে আঙুল তুলল।

লতার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি ফুটল, ‘যেভাবে হয়।’

‘মানে... ওই লোকটা তোমাকে...’ তৌফিকের চোয়াল কঠিন হয়ে যাচ্ছিল।

‘না।’ লতা হাত তুলে থামাল তৌফিককে, ‘আমি চেয়েছি তাই হয়েছে। আমি চেয়েছি তাই বিয়েও করেছি। তোমার কোনও আপত্তি আছে কি?’ লতা দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

‘লতা!’ বিস্ময়ে তৌফিক কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। লতা স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে! ধীরে ধীরে তার শক্ত হয়ে থাকা হাতের মুঠি খুলে গেল। ‘কী করে পারলে তুমি লতা? তুমি কি জানতে না আমার অবস্থা? আমি হাসপাতালে ছিলাম। প্রায় মাসখানেক আমার ঠিকমতো জ্ঞান ছিল না। তারপরেও কয়েক মাস আমায় কেউ কিচ্ছু জানায়নি। ওরা যখন তোমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, তুমি তো তখনই বাড়িতে বলতে পারতে আমাদের রেজিস্ট্রির কথাটা। আমরা তো আইনত স্বামী-স্ত্রী, কেউ আমাদের আলাদা করতে পারত

না। তুমি পুলিশকে জানালেই, ওরা তোমার বিয়ে দিতে পারত না আর। কেন কিছু করলে না লতা?'

তৌফিকের সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। সে তো জবাবদিহি চাইতে আসেনি। অথচ তার প্রশ্নগুলো কেমন যেন কৈফিয়ত চাওয়ার মতো হয়ে গেল। কেন এসেছিল সে? সে কি অচিন্ত্যর কথা বিশ্বাস করেনি? না, সে বিশ্বাস করেছিল অচিন্ত্যর কথা যে লতা প্রেগন্যান্ট। কিন্তু অবশ্যম্ভাবীর মতো সে একটাই যুক্তিতে এসে থেমেছিল। লতা ধর্ষিতা। লতা এখনও তাকেই ভালোবাসে— এই দৃঢ়বিশ্বাস আর বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে সে ছুটে এসেছে। লতা অনুমতি দিলেই সে তাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাবে। লতা ধর্ষিতা বা প্রেগন্যান্ট, সেইসব সে গ্রাহ্য করে না। আইনত তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কারও আটকানোর ক্ষমতা নেই। শুধু লতার অনুমতির অপেক্ষা।

কিন্তু লতা এইসব কী বলছে? স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে! শুধু বিয়েই না, সে জয়ন্তকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার সাক্ষ্যই বহন করছে শরীরে।

'শোন তৌফিক। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। এখন আমার জীবনটা আর নষ্ট করো না। তুমি চলে যাও। এইটুকুই শুধু তোমার কাছে আমার ভিক্ষা চাওয়ার আছে।' লতা অদ্ভুত শক্ত গলায় বলল।

'লতা! এইভাবে বল না। তুমি একবার শোন। তোমার রাগ-অভিমান সব স্বাভাবিক। কিন্তু...'

'চুপ। তুমি শোন। আমি ভুল করেছিলাম তোমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে। তোমার সঙ্গে থাকলে আমার খারাপ বই ভালো কিছু হত না। জয়ন্ত আমাদের স্বধর্ম, স্বজাতি। এই বিয়েতে আমি নিজের ইচ্ছায় মত দিয়েছি। তার জন্যে আমি অনুতপ্ত নই। আসলে তোমার সঙ্গে আমার কিছুতে মেলে না। জাত-ধর্ম, আচার-বিচার কিচ্ছু না। আমি একটা মুসলিম ছেলের সঙ্গে থাকতে পারব না। তুমি কি কিছুই বোঝ না?' লতার গলা আচমকা চড়ে গেল।

'লতা!' উশকোখুশকো চুল, ধূলিধূসরিত জামাকাপড়-পরা ছেলেটার রাতজাগালাল চোখ দুটো জ্বলছে।

তৌফিক এক পা এগিয়ে আসতেই, লতা ফিসফিস করে ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, 'মেরো না আমাকে।'

বুকের মধ্যে একটা অসহ্য চাপ অনুভব করল তৌফিক। সে নিষ্পলকে লতাকে দেখছিল। তাড়া-খাওয়া হরিণীর মতো মুখ-চোখের অবস্থা। এই দৃষ্টি কি তৌফিকের প্রাপ্য ছিল? এতটা অপমান লতা তাকে করতে পারছে? লতা ভাবল কী করে, সে লতাকে মারবে?

তৌফিক মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার কিছু শোনার নেই আর। কিছু বলার নেই। মাঘের হিম-জলে কানায় কানায় ভরা উপাধ্যায়দের পুকুরটা গুঁড়িপানার ঘোমটা টেনে রেখেছে। ভিতরে তার কতশত মাছের জলকেলির আলোড়ন, উপর থেকে বোঝার উপায় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পরে, লতার করুণ স্বর শোনা গেল। সে উদ্‌গত কান্না চাপার চেষ্টা করছে। 'তৌফিক। তুমি চলে যাও। এইটুকুই চাইছি আমি। প্লিজ তুমি চলে যাও।'

তৌফিক অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

'বাইরে কোথাও। দূরে কোথাও। তোমার তো চাকরি পাওয়ার কথা ছিল সাউথে। কী হল সেটার? তুমি যাওনি?' লতা জিজ্ঞেস করল।

তৌফিক কিছু বলল না। সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পুকুরের দিকে। লতা নিজেকে আবার সামলে নিয়েছে। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তুমি পাশের গ্রামে থাকলে কথা ছড়াবে। আমি চাই না কোনওভাবে ওর কানে কথা উঠুক। তুমি আজকে, নয়তো কালকেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। তোমাকে যেতেই হবে।'

'তুমি ডিভোর্স চাও না?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

'ডিভোর্স!' লতা অবাক গলায় কথাটা বলেই সামলে নিল। 'ও হ্যাঁ! নিশ্চয়ই। কিন্তু...'

'কিন্তু ডিভোর্স করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে তা-ই তো?'

লতা মাথা নিচু করে আঙুলে আঁচল জড়াল। 'তুমি এখন চলে যাও। আমি ডিভোর্সের জন্যে তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব। জয়ন্ত এখন থাকবে এখানে। প্লিজ, তুমি অন্তত কলকাতা চলে যাও।'

'আংটিটা এখনও পরে আছ কেন?' তৌফিকের প্রশ্নের উত্তরে লতা নিজের আঙুলের দিকে তাকাল। তৌফিক যে আংটিটা দিয়েছিল, সেটা এখনও তার হাতে আছে।

সে আংটিটা খুলে দিয়ে দিল তৌফিককে। সামান্য রুক্ষকণ্ঠে বলল, 'এই নাও। আমাকে মুক্তি দাও।'

তৌফিকের চোখ একবার পলকের জন্য জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সে কোনও কথা বলল না। আংটিটা ছুড়ে ফেলে দিল পুকুরের জলে। ছোট একটা বৃত্ত তুলে ধাতব আংটিটা টুপ করে ডুবে গেল। ছোট বৃত্তটা জলে ছড়িয়ে পড়ার সময় পেল না, আরেকটা আংটির সলিলসমাধি হল তার পাশে।

ছোট বৃত্তগুলো বড় হয়ে পুকুরের শান্ত শীতল জল পেরিয়ে ঘাট ছোঁয়ার আগেই তৌফিক ভাঙা পাঁচিল টপকে উপাধ্যায়বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে গেল।

চোদ্দো

‘কী খুঁজছিস রে?’ কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল সোলাঙ্কীকে। বিকেলবেলা ঘরে ঢুকে কৃষ্ণা দেখল, সোলাঙ্কী স্যুটকেস হাতড়াচ্ছে।

‘আরে, সেইদিন শামু যে লাল সোয়েটারটা পরেছিল। সেটা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।’

‘সোনাঝুরিতে?’ কৃষ্ণার প্রশ্নে সোলাঙ্কী ইতিবাচক ঘাড় নাড়ল। কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, ‘ওটা কি ও বিকেলবেলায় পরেছিল? কারণ ফেরার পরে আর দেখিনি।’

‘তাহলে নিশ্চয়ই দুপুরবেলা গাড়িতে খুলে রেখেছিল। কোথাও পড়ে গেছে। এই মেয়েটা এত জিনিসপত্র হারায়।’ সোলাঙ্কী জামাকাপড়গুলো রেখে বসে পড়ল। ‘আমি ওর কালো প্যান্টটাও খুঁজে পাচ্ছি না।’

‘আরে, বাদ দে তো। আছে কোথাও। বামুনপিসি হয়তো কাচতে নিয়ে গেছে। এখন নিচে চল্। পুলিশ এসেছে।’

‘পুলিশ! কেন?’

***

বিকেলবেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে অচিন্ত্য দেখল, বসার ঘরে পুলিশ বসে আছে, দাদু আর বাবার সঙ্গে কথা বলছে। ছোটরা সবাই প্রায় জড়ো হয়েছে পাশের লাইব্রেরিতে। অচিন্ত্য অবাক হয়ে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার?’

কৃষ্ণা ফিসফিস করে জানাল, ‘গতকাল রাত্রে সোনাঝুরিতে নাকি একটা মার্ডার হয়েছে।’

‘ওরে বাবা। বলিস কী রে? ওখানে তো আমরাও ছিলাম।’ অচিন্ত্য লাফিয়ে উঠল।

‘হ্যাঁ। সে কথা পুলিশকে বলা হয়েছে। এমনকী শামু যে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেছিল, সেটাও। আমরা খুঁজতে গেছিলাম। বিশুকাকু খোয়াইয়ের খাদে পড়ে পা মচকেছে। তারপর তৌফিকদা শামুকে খুঁজে পেয়েছে। সবই বলা হয়েছে। পুলিশ শামুর সঙ্গে আলাদা কথাও বলেছে।’

‘তৌফিকদার কথা বলেছিস?’ অচিন্ত্য আবার লাফাল।

‘সকালের পার্টটা বলিনি আমরা। শামুও বলেনি। সন্ধেবেলার ঘটনাটা বলেছি।’

‘বাবা শুনেছে তৌফিকদার কথা?’

‘হুঁ। মামা তোকে খুঁজছিল।’

‘উফ।’ অচিন্ত্য ধুলো-মাখা জামাপ্যান্টেই সোফার উপরে বসে পড়ল। একটু পরেই আবার জিজ্ঞেস করল, ‘হ্যাঁ রে, মার্ডারটা হয়েছে কোথায়? শামু যেদিকে হারিয়ে গেছিল, সেইদিকেই?’

‘বিশুকাকু তো মোটামুটিভাবে বলল, শামুকে ওরা কোথায় পেয়েছে। ওই সোনাঝুরির পশ্চিমে পরপর বেশ কয়েকটা ভিলেজ রিসর্ট আছে, ওইদিকে। মার্ডারটা হয়েছে একদম উলটোদিকে। বেশ অনেকটাই দূরে। সোনাঝুরির পুবে, ওই যে আদিবাসী গ্রাম আছে। প্রকৃতি বনবাংলোর পিছনের জঙ্গলটা, ওইদিকে। আমরাই বরং ছিলাম মাঝখানে।’

‘বাপ রে। কী ভয়ানক! ভাব্ একবার, কালকে রাত্রে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার কয়েকশো মিটারের মধ্যেই একটা মার্ডার হচ্ছে!’ অচিন্ত্যর চোখ গোল গোল হয়ে উঠল।

'হুম।'

'কে মার্ডার হয়েছে?' অচিন্ত্য আবার প্রশ্ন করল।

'জানি না ঠিক। কোনও সাধুটাধু হবে। পুলিশ জিজ্ঞেস করছিল, কাল আমরা কোনও সাধুকে দেখেছি কি না। আমি তো না বলে দিলাম।' লাইব্রেরি রুমের খোলা দরজা দিয়ে অচিন্ত্য দেখল, পুলিশটা বাবা, দাদু আর জয়ন্তদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরচ্ছে। তখুনি পুলিশটাকে অচিন্ত্য চিনতে পারল। আরে, এ তো তৌফিকদার বন্ধু! রজতদা!

গেট অবধি রজতকে এগিয়ে দিতে দিতে তারকনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও মার্ডার ওয়েপ্‌ন পাওয়া গেছে নাকি?'

রজত ঘাড় দোলাল, 'না না। ওসব কিছুই পাওয়া যায়নি। সাধুদের নিজস্ব দলাদলির কাজ মনে হচ্ছে। জানেন তো, মাঝে মাঝেই এমনটা ঘটে এসব অঞ্চলে।'

জয়ন্ত বলল, 'ছবিটা একবার দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ। বাচ্চাদের দেখালাম না আর। এসব ডেডবডি না দেখাই ভালো।' রজত কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ছবি বার করল।

জয়ন্তর কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে দেখে তারকনাথের মুখ শুকিয়ে গেল। রজতকে ছবিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে তারকনাথ জানালেন, সাধুটা একদিন ভিক্ষা করতে এসেছিল এই বাড়িতে।

রজত জানাল, সাধুটা এই অঞ্চলেই মাসখানেক ধরে ঘোরাঘুরি করছিল, খবরটা সে আগেই পেয়েছে।

জিপ হাঁকিয়ে রজত চলে গেল।

পুলিশ যাওয়ার পরেই অচিন্ত্য টুক করে বাথরুমে ঢুকে গেল। তৌফিকদার ব্যাপারটা নিয়ে বাবা তখুনি হাঁক পাঠাল না দেখে, অচিন্ত্য হাঁপ ছাড়ল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কবে আর ছিল অচিন্ত্যর কপালে। রাতে খাওয়ার টেবিলে আবার কথাটা উঠল।

খেতে খেতে হঠাৎ জয়ন্ত বলল, 'কালকে যে ছেলেটা আমাদের দেখে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল, সে-ই কি তৌফিক?'

অচিন্ত্য একবার আড়চোখে বাবার দিকে তাকাল। কাল রাত্রে বাবাদের দেখামাত্রই তৌফিকদা জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল। বাবা খেয়ালই করেনি যে ওখানে তৌফিকদা ছিল, তবে জয়ন্তদার তো হেভি চোখ, ভাবল অচিন্ত্য।

অচিন্ত্য ঘাড় নাড়ল, 'হুঁ।'

'তোমার ঠোঁট কী করে কাটল টুকলু?' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল।

এই রে, খেয়েছে! অচিন্ত্য দেখল, বাবা গোল গোল চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কালকে রাত্রিতে শাম্ভবীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তার দিকে কারও নজর পড়েনি। রাত্তিরে সবার অগোচরে বরফ ঘষে সে ঠোঁটটাকে নর্মাল কন্ডিশনে ফেরানোর চেষ্টা করেছিল। সেটা যে খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি তা বাবার চোখ দেখেই সে বুঝতে পারল।

'সত্যি তো, তোর ঠোঁটটা অতটা কেটে গেল কী করে?' বিমলচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন।

অচিন্ত্য আমতা আমতা করল। সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণাও ভয়ার্ত মুখে এ ওর দিকে চাইল। তৌফিকদাকে নিয়ে নতুন করে ঝামেলা শুরু হোক— এটা ওরা একদমই চায় না। কালকে সোনাঝুরিতে তৌফিকদা যা উপকার করেছে, তারপরে তো আরওই নয়।

'কালকে অচিন্ত্যদা কৃষ্ণাদির সঙ্গে মারপিট করতে করতে বিশ্বভারতীর সিঁড়িতে পড়ে গেছে।' শাম্ভবীর কথায় সবাই তার দিকে ফিরে তাকাল।

বিমলচন্দ্রর মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। জয়ন্ত একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল শাম্ভবীর কথায়, তারপরে হো হো করে হেসে উঠল।

সুরমাদেবী বললেন, 'সত্যি টুকলু। তুই আর বড় হলি না। এত বড় বোনের সঙ্গে কেউ মারপিট করে? তা-ও আবার রাস্তাঘাটে! ছি ছি!'

অচিন্ত্য একটা বড়সড়ো হাঁপ ছাড়ল।

জয়ন্ত আবার জিজ্ঞেস করল, 'তা তৌফিক কাল চলে গেল কেন? ও-ই তো শামুকে উদ্ধার করল। তারপর কী হল?'

অচিন্ত্য বাবার দিকে তাকাল। বিমলচন্দ্র সুরমাদেবীর দিকে তাকালেন।

জয়ন্ত নিবিষ্টমনে খেতে খেতে বলল, 'তৌফিককে তো নিমন্ত্রণ করে একটা ট্রিট দেওয়া উচিত। যতই যা-ই হোক, আমার এই ছোট্ট শ্যালিকাকে সে উদ্ধার করেছে। তা-ই না শাম্ভবী?' জয়ন্ত শাম্ভবীর দিকে তাকাল।

সে বিজ্ঞের মতো বলতে শুরু করল, 'সেটা কি উচিত হবে? তৌফিকদা তো...'

শাম্ভবী কথা শেষ করার আগেই কৃষ্ণা তাকে একটা চিমটি কাটল। শাম্ভবী হাঁউমাউ করে উঠল।

জয়ন্ত নিজের মনেই বলল, 'বেশ ইন্টারেস্টিং গাই। দস্যু মোহনের মতো। উপকার করে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ও কি তোমার বন্ধু অচিন্ত্য?'

অচিন্ত্য একটা বড়সড়ো বিষম খেল। কাশি থামার পরে জয়ন্তর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে অচিন্ত্য কোনওরকমে বলল, 'না, বন্ধু নয়। আমায় পড়াত।'

জয়ন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল, 'আরিব্বাস! তোমার মতো জুয়েলকে পড়াত মানে তো হেভি ব্যাপার। বয়স তো খুব বেশি বলে মনে হল না। আমার থেকে তো ছোটই হবে। একদিন নিমন্ত্রণ কর তোমার মাস্টারকে।'

'না।' দরজার কাছ থেকে একট দৃঢ় গলার স্বর ভেসে এল। সবাই তাকিয়ে দেখল, লতা এসে দাঁড়িয়েছে।

জয়ন্ত একটু হকচকিয়ে গেল, 'না কেন? এত বড় একটা উপকার করল। কালকে শামুকে যদি...'

'না।' লতার চোখে যেন আগুন জ্বলছে। তার গলার স্বর আর-এক পরদা চড়ল।

সুরমাদেবী বেগতিক দেখে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সে ঠিক আছে, দেখা যাবে খন। তৌফিককে তো যে কোনওদিনই ডাকা যায়। আমাদের বাড়ির ছেলের মতোই।'

'না।' লতা প্রায় চিৎকার করে উঠল। সুরমাদেবী মেয়ের কাছে গিয়ে লতাকে টেনে ঘর থেকে বার করার চেষ্টা করলেন, 'কী হচ্ছেটা কী লতা? জামাই কী ভাবছে বল্ তো?'

জয়ন্তর মুখটা একদম চুন হয়ে গিয়েছিল, সে বলল, ‘ঠিক আছে মা। ও যখন চাইছে না, তখন কোনও দরকার নেই।’

বিমলচন্দ্র হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে বললেন, ‘জামাই, তুমি যখন চাইছ, তখন অচিন্ত্যর জন্মদিনে তৌফিককে ডাকা হবে। আমি নিজে গিয়ে তাকে বলে আসব।’

বিমলচন্দ্রর কথা শেষ হতে না হতেই লতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পনেরো

‘এই হারামজাদা, ওঠ্।’ কে যেন খোঁচা দিল একটা। তৌফিক গুটিসুটি হয়ে পাশ ফিরল।

‘তৌফিক, ওঠ্ বলছি। গায়ে জল ঢেলে দেব কিন্তু।’

তৌফিক চোখ খুলল। রজত বাড়ি ফিরেছে। পুলিশের খাকি উর্দিটা আলনায় রেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জানালার বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝি ডাকছে, রাত্তির হয়ে গেছে। খাটের পাশে রজত দাঁড়িয়ে আছে। সকালবেলা লতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে ঠিক করেছিল, সেই মুহূর্তেই চলে যাবে গ্রাম ছেড়ে। কিন্তু কী ভেবে কে জানে চলে এল রজতের বাড়িতে। রাখালেশ্বর।

আসলে তৌফিক চেনাপরিচিত কারও মুখোমুখি হতে চাইছিল না। রজত সাতসকালেই বেরিয়ে যায় থানায়। সারাদিন বাড়ি ফেরে না। থুত্থুড়ে এক বুড়ি ঠাকুমা ছাড়া রজতের বাড়িতে আর কেউ থাকে না। তিনি কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। রজতের বাড়িটাই তৌফিকের সব থেকে ঠিকঠাক জায়গা মনে হয়েছিল। রজতের নাম করতেই ঠাকুমা দরজা খুলে দিল। তৌফিক এর আগেও রজতের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে। ঠাকুমা তাকে ভালোই চেনে। রজতের ঘরে বিছানায় শুয়ে বহু বহু দিনের পরে তৌফিকের খুব ঘুম পাচ্ছিল। এতদিনের অনাবশ্যক উত্তেজনায় ক্লান্ত আহত মন এবার বিশ্রাম চাইছিল।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ তার বিশেষ কোনও জ্ঞান ছিল না। তখনই তাকে বোলপুর হাসপাতাল থেকে বর্ধমানের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। পরে হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে সে প্ল্যান করত, কীভাবে লতার খবর পাওয়া যায়। লতার ফোন সুইচ্‌ড অফ। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিলিটেড। হোয়াট্‌সঅ্যাপে কোনও মেসেজ সিন হয় না। তৌফিক বুঝতে পারছিল না কী করবে। রজত যখন এসেছিল হসপিটালে তার সঙ্গে কথা বলতে, তখন সে বারবার জিজ্ঞেস করেছিল লতার কথা, কিন্তু শুধু রজত কেন, বাড়ির লোকও কেউ বলেনি তাকে কিচ্ছু। পরে একদিন ভাবি বলেছিল, ডাক্তাররা বারণ করে দিয়েছিল লতার খবর দিতে। ডাক্তার ভেবেছিল, ওই অবস্থায় এই খবর তার বড়সড়ো ক্ষতি করে দেবে।

কতটা চাতুরী করে সবাই সবকিছু লুকিয়ে রেখেছিল তার কাছ থেকে। একটু সুস্থ হতেই বর্ধমান হসপিটাল থেকেই তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হল। কেন? না, কলেজের ফাইনাল পরীক্ষাটা সে যেন দিতে পারে। সবে সে ভাবছিল, বাড়ি ফিরবে, লতার সঙ্গে দেখা না হলেও অন্তত লতার কাছাকাছি ফিরবে। তৌফিকের মনে হয়েছিল, উপাধ্যায়বাড়ির লোক- গুলোর মতো তার পরিবারটাও হৃদয়হীন হয়ে গেছে।

গত পূর্ণিমার পরে সে ছাড়া পেয়েছে কলকাতার চাচার বাড়ি থেকে। এখন সে মোটামুটি আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে, আগের মতো শারীরিক সুস্থতা সে হয়তো কোনওদিনই ফিরে পাবে না। ক্যারাটেতে আন্ডার-এজ ন্যাশনালে পার্টিসিপেট করেছিল তৌফিক ক্লাস এইটেই। রজতকেও সে-ই টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ক্লাবে। তৌফিক চোখ বন্ধ করল।

রজত আবার ঠেলা দিল তৌফিককে, 'কী রে? আর কত ঘুমাবি? ওঠ্ এবার। খেয়ে নে। সারাদিন কিছু খাসনি শুনলাম।'

রজতের হাত থেকে রেহাই নেই। ছেলেটা বড্ড গোঁয়ার। এখন কিছু বলতে গেলে হয়তো বিছানা-বালিশ সমেত মাটিতে টেনে ফেলে দেবে। তৌফিক উঠে বসল। কাঁধের কাছে খচ্ করে লাগল। ডান কাঁধ আর হাতটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠলে এখনও প্রত্যেকদিন তাকে ঠান্ডা-গরম জলে সেঁক দিতে হয়। সে ধীরে ধীরে অন্য হাতে মালিশ করতে শুরু করল কাঁধটা।

'ক-টা বাজে?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

'দশটা।' রজত গামছা দিয়ে হাত-পা মুছতে মুছতে বলল, 'ব্যাপার কী? ক-টা পুরিয়া চড়িয়েছিস?'

'দুটোমাত্র।' রজতের বাড়িতে এসে বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার আগে সে পকেট থেকে দুটো গাঁজার পুরিয়া পেয়েছিল। কী ভেবে সেই দুটো টেনে তারপরে শুয়ে পড়েছিল। সে রজতের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমি ভালো ছেলে, জানিস না তুই?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাই তো কাল রাত্রে সোনাঝুরিতে মচ্ছব করছিলি।' বলতে বলতে রজত পাশের ঘরে চলে গেল।

কাল রাত্রে! কাল রাত্রে কী হয়েছিল যেন? তৌফিক মনে করার চেষ্টা করল। ও হ্যাঁ। সে সোনাঝুরিতে আশিসদের গ্রুপটার সঙ্গে বসে মাল খাচ্ছিল। মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো অচিন্ত্য আর ওর বোনগুলো এসেছিল। ওদের গ্রুপের কে একটা মেয়ে যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তৌফিক আর আরেকটা লোক খুঁজতে গেল মেয়েটাকে। সেই প্রথম জঙ্গলের মধ্যে টর্চের আলোয়, ফ্যাকাশে কুয়াশার মধ্যে দেখেছিল সে মেয়েটাকে।

রজত দুটো থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। রুটি, সবজি, দুধ আর ঘরে তৈরি মিষ্টি। তৌফিক চট করে বিছানা ছেড়ে বাইরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এল। দেরি করলেই রজত খিস্তি দেবে।

'তোর ঠাকুমা এখনও মিষ্টি বানায়?' শেষ পাতে মিষ্টিটা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল তৌফিক। রজত খেতে বসে একটাও কথা বলেনি। তৌফিকের সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ সোনাঝুরির কথা বলল কেন রজত?

'ঠাকুমার নয়। পাশের বাড়ি থেকে দিয়েছে। স্বয়ম্ভুতে পুজো ছিল। পুজো করে কুয়ো বুজিয়ে দিল।' রজত জানাল।

'মানে?' তৌফিক মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না।

'আরে, এই প্রায় তিন-চার মাস হবে। শুনেছিলাম, নদীর চড়ায় একটা বৃত্ত হয়ে, মাটি নাকি রক্তে ভিজে গেছিল। আমি তখন দু-দিনের জন্য অন্য জায়গায় গেছিলাম। ফিরে এসে গল্প শুনে ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে দেখি, হাতে হাতে এত বড় গর্ত হয়ে গেছে। মাটিফাটি তুলে নিয়ে চলে গেছে লোকে। ভাব্, বাড়ির পাশের ঘটনা, তা-ই ঠিক করে দেখতে পেলাম না। লোকজন আজকাল এত কুসংস্কারী হয়ে উঠেছে। এতদিন ধরে ওই মাটি বিক্রি হচ্ছিল। কুয়োর মতো খুঁড়ে ফেলেছিল পুরো। আজকে কুয়োটা বুজিয়ে দিল গ্রাম থেকে।' রজত বিরক্তির সুরে কথাগুলো বলল।

খেয়েদেয়ে উঠে তৌফিক পকেট চাপড়াল সিগারেটের খোঁজে, তখনই তার মনে পড়ল, সে ফোনটা সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে। ফোনটা বের করে রজতের টেবিলে রেখে দিল তৌফিক, অন করতে ইচ্ছা করল না। এখুনি বাড়ি থেকে ফোন করে হাজার একটা প্রশ্ন করবে, এখন বাড়ির কারও সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না তৌফিকের।

'তোকে অনেকবার ফোন করেছিলাম, পাইনি। তোর বাড়ি থেকেও ঘুরে এসেছি।' তৌফিককে একটা সিগারেট দিয়ে, নিজে একটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে মুখাগ্নি করতে করতে রজত জানাল।

তৌফিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রজতের দিকে।

'কাল রাত্রে সোনাঝুরিতে একটা খুন হয়েছে। খুব নৃশংসভাবে। কেউ বা কারা ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে একটা সাধুর হৃৎপিণ্ড খুলে বার করে এনেছে। হৃৎপিণ্ডটা পাওয়া যায়নি। অস্ত্রটাও না।' রজত নিরুদ্‌বিগ্ন গলায় বলল।

সিগারেটের ধোঁয়াটা তৌফিকের গলায় আটকে গেল। রজত সময় নিল তৌফিকের কাশি থামার অপেক্ষায়।

'মেয়েটাকে কোথায় পেয়েছিলি?'

'সোনাঝুরির পশ্চিমে যে ভিলেজ রিসর্টগুলো আছে, ওখানে।'

'তুই মেয়েটাকে কীভাবে পেয়েছিলি?'

'অজ্ঞান। জঙ্গলের মধ্যে।' তৌফিক ঢোক গিলে জানাল। রজত কি এর মধ্যেই অচিন্ত্যদের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে? ওই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছে? কী বলেছে মেয়েটা? তৌফিক মনে মনে সাহস আনার চেষ্টা করল।

'তুই মেয়েটাকে খোঁজার সময়ে কোনও লাশ দেখেছিলি?'

'না।' তৌফিক সজোরে ঘাড় নাড়ল।

'তুই গতকাল রাত্রে কোথায় ছিলিস?'

'আশিসদের বাড়িতে...' বিড়বিড় করল তৌফিক।

'কখন গেছিলি?'

'মনে নেই... এই আটটা কি ন-টা হবে। আশিসরা নিয়ে গেছিল...'

'কী মনে আছে শুনি?' তিরের মতো ছুটে এল রজতের প্রশ্নটা। 'আশিসকে তো থানায় তুলে নিয়ে যাওয়ার আগে তার কিছুই মনে পড়ছিল না। তোকেও লকআপে ঢোকাতে হবে নাকি?'

তৌফিক যা বলল, তার সঙ্গে বিশুর কথার কোনও তফাত খুঁজে পেল না রজত। কিন্তু একটা খটকা... রজত আবার জিজ্ঞেস করল।

'আশিসরা বলছিল, সারাদিন তোর গায়ে একটা লাল-নীল পুলওভার ছিল। কিন্তু আশিসদের বাড়ির লোকেরা বলছে, তুই যখন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলি, তখন তোর গায়ে কোনও পুলওভার ছিল না। সেটা কই?'

'হ্যাঁ... মানে আমার ঠিক মনে নেই, কাল রাতে আমি কী কী করেছিলাম। মানে এত খেয়েছিলাম... ইয়ে মানে পুলওভারটা সোনাঝুরিতেই পড়ে আছে হয়তো।'

'ড্রাগ নিয়েছিলিস নাকি?'

'ড্রাগ!' তৌফিক একটু অবাক হল, 'ড্রাগ! কেন?'

'না মানে কিছু ড্রাগ আছে, যা টানলে মানুষের মনে থাকে না সে খুন করেছে কি না।' সিগারেট টানতে টানতে রজত খুব স্বাভাবিক স্বরে কথাগুলো বলল।

'কী যা-তা বলছিস তুই?' তৌফিক ছিটকে সরে গেল রজতের পাশ থেকে। 'আমি খুন করিনি।'

'কী করে জানলি? কাল রাত্তিরে কী করেছিস, কিছুই তো তোর মনে নেই।'

'রজত। ইয়ারকি নয়। আমার ইয়ারকি ভালো লাগছে না।' তৌফিক সিগারেটের শেষাংশটুকু অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বিছানায় উঠে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল।

'পুলওভারটা তুই আগুনে দিয়ে দিয়েছিলিস। পুরোটা পোড়েনি।'

তৌফিক উঠে বসল। 'কী বলতে চাস তুই?'

রজত আরেকটা সিগারেট ধরাল। 'কিছুই বলতে চাই না আমি। পুলিশ লাশটা দেখেছে রাত্রি দশটা নাগাদ। প্রকৃতি বাংলোর দরোয়ান পুলিশ ডেকেছিল। তখনও তোদের দলের বাকি ছেলেরা মচ্ছব করছিল। অথচ তুই আর আশিস চলে গেলি বাড়িতে। মাত্র আটটা-ন-টার মধ্যেই তুই কী এমন খেয়েছিলি যে তোর কিছুই মনে নেই? এদিকে ভোর হতে না হতেই তুই আশিসদের বাড়ি থেকে বাইক চালিয়ে বেরিয়ে গেলি। যেখানে বেলা ন-টার সময়ে আশিসকে আমায় রুলের বাড়ি মেরে তুলতে হয়েছে। তোকে আমি সারাদিন সর্বানন্দপুরের আশপাশে বিভিন্ন লোকের বাড়িতে খুঁজেছি, কিন্তু তুই আমার বাড়িতে এসে ঘুমাবি— এটা ভাবিনি। তুই খুব বুদ্ধিমান তৌফিক। এবার বল্, পুলওভারটা পোড়ালি কেন?'

'নেশার ঘোরে।' তৌফিক পায়ের কাছে পড়ে-থাকা লেপটা টেনে নিল। 'আমি খুন করিনি। নেশা করলেও করিনি।'

'হ্যাঁ। কারণ গতকাল রাত্রে যা-ই গিলে থাকিস না কেন, তোর অন্তত নেশা হয়নি।' তৌফিক চুপ করে বসে রইল।

'ওইরকম খুন করাটা কোনও স্বাভাবিক মানুষের কাজ নয় তৌফিক। আমি জানি, তুই খুন করিসনি। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন, তোর নেশা হয়নি, তবু তুই নেশার ভান করেছিলি কেন? তুই পুলওভারটা পোড়ালি কেন?'

তৌফিক সরাসরি ফিরে তাকাল। রজত চেয়ার থেকে সামান্য ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, খরচোখে। তার তর্জনী আর মধ্যমায় পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। রজতের পুলিশি জেরা থামানো চাপের। তৌফিক সামান্য সময় তাকিয়ে রইল রজতের দিকে।

'খুনের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আর পুলওভারটা লতা দিয়েছিল।' তৌফিক লেপ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সিগারেটটা ধীরেসুস্থে শেষ করে রজতও এসে শুয়ে পড়ল।

'তুই বুদ্ধিমান তৌফিক।' তৌফিক নিঃশ্বাস চেপে শুয়ে রইল। রজত কি তার কথাটা বিশ্বাস করেনি? সামান্য নিস্তব্ধতার পরে রজত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কেন যে বোকার মতো লতার সঙ্গে নিজেকে জড়ালি। যাক গে, আশিসদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করিস না। ওরা ড্রাগের ব্যাবসা শুরু করেছে।'

চেপে-রাখা শ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ল তৌফিক। যাক, রজতকে বিশ্বাস করানো গেছে। একটু পরে রজতের নাক ডাকতে শুরু করল।

তৌফিকের ঘুম আসছিল না। খাট থেকে নেমে এসে জানালাটা খুলে দিল। বাইরে কনকনে ঠান্ডা। আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। তৌফিক কাঁপা কাঁপা হাতে আরেকটা সিগারেট ধরাল।

তার পুলওভারটা রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে হয়তো কেউ খেয়াল করেনি, কিন্তু সকালের আলোতে ওই রক্ত-মাখা পুলওভারটা সে লুকাতে পারত না কারও কাছ থেকে।

সকালে সে কারও সঙ্গে দেখা করবে না, কারও মুখোমুখি হবে না বলেই দ্রুত পালিয়েছিল আশিসদের বাড়ি থেকে। সে আন্দাজ করেছিল, গন্ধে গন্ধে রজত গিয়ে হাজির হবে আশিসদের বাড়িতে। একবার রজতের হাতে পড়লে লতার সঙ্গে দেখা হওয়াটা চৌপাট হয়ে যেত। লতার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সে আরেকটা সমস্যায় জড়াতে চাইছিল না নিজেকে।

গতকাল রাত্রে বাকিদের মাতলামোর সুযোগ নিয়ে ধুনির মধ্যে সামান্য মদ দিয়ে খুব ঠান্ডা মাথাতেই জ্বালিয়ে দিয়েছিল পুলওভারটা। পুলওভারটা ছাই হওয়ার পরে সে আর এক মুহূর্তও থাকতে চায়নি সোনাঝুরিতে। সোনাঝুরির জঙ্গলে যখন মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছিল, তখনই সে লাশটা দেখেছিল। তৌফিক মনে করত নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে তার যথেষ্ট দখল আছে। কিন্তু গতকাল রাতের দৃশ্যটা তার আপাদমস্তক নাড়িয়ে দিয়েছে। কী দেখেছিল সে? সত্যি দেখেছিল? নাকি হ্যালুসিনেশন!

গতকাল রাত্রি থেকে একেকবার তার মনে হয়েছে, সে কিছু দেখেনি। অমন ঘটনা হতে পারে না। সে ভুল দেখেছে। মদ খেয়ে, কুয়াশার মধ্যে, অন্ধকারে টর্চের আলোয়... না, না, সে নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে! গতকাল রাত্রি থেকে শুরু করে, একটু আগে রজতের ইন্টারোগেশনের সময়ও, সে বারংবার ভাবছিল সে যা দেখেছে, ভুল দেখেছে।

কিন্তু রজতই তো বলল, খুনটা নাকি অস্বাভাবিক... হৃৎপিন্ডটা খুঁজে পাওয়া যায়নি...

তৌফিকের মন বার বার বলতে লাগল গতকাল রাতে যা হয়েছে তা তোমার ভ্রমমাত্র। চোখের ভুল। তবু তৌফিকের সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। একের পর এক আগের রাতের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে।

কতটা ভয় পেলে মানুষ মূর্তি হয়ে যায়? তার হাত থেকে খসে গিয়েছিল জ্বলন্ত টর্চটা। তৌফিক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল, নাকি বসে পড়েছিল হাঁটু গেড়ে? মেয়েটা নিজের থেকেই হেঁটে এসে তৌফিকের কোলে উঠেছে। মেয়েটা যতবার তার কাঁধের উপরে মুখ ঘষছিল, যতবার হাত মুছছিল কুয়াশা-মাখা পুলওভারে; ততবার তৌফিক শিউরে উঠছিল। কিছুক্ষণ আগেই টর্চের আলোক-
বৃত্তের মাঝে ঘটে-যাওয়া দৃশ্যাবলি তার সব সাহস শুষে নিয়েছিল।

চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সাধুর লাশ। বুকের মাঝখানে একটা গর্ত। মাটি ভিজে গেছে রক্তে। লাশটার উপরে বসে আট-নয় বছরের একটা মেয়ে। দু-হাতে একটা ধুকধুক করতে থাকা

হৃৎপিণ্ড। তার ঠোঁট-দাঁত-চিবুক থেকে রক্ত ঝরছে। রক্ত গড়াচ্ছে হাত বেয়ে। মেয়েটা কচরকচর করে চিবিয়ে খাচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা!

কালকবচ

পাঁচ বছর আগে, জুন ২০১৩

(মিসেস ডি'সিলভার বাংলো, উত্তরাখণ্ড)

মিসেস ডি'সিলভা চুপচাপ বসে ছিলেন বারান্দায়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি যাওয়ার পথে ছোট এক জনপদের পাশে মিসেস ডি'সিলভার ছবির মতো সাজানো বাংলো বাড়ি। জুন মাসের শুরু। সারা ভারতবর্ষ প্রবল দাবদাহের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এখনও হিমালয় পর্বতের উপান্তে, ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত এই অঞ্চলের বাতাস শীতল। তবে আজকে রোদ উঠেছিল বেশ চড়া।

মিসেস ডি'সিলভার বয়স হয়েছে। তার মাথায় ববকাট-করা সাদা চুলের কিছু অংশ ঘাড়ে-কপালে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কখনও কখনও সূর্যটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেই কাঁপুনি দিয়ে শীতলতা ফিরে আসছে। শালটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে মিসেস ডি'সিলভা সর্বক্ষণের সঙ্গী হুইলচেয়ারটার হাতলে হাত বোলালেন।

চার বছর আগে অসমের পূর্ব প্রান্তে দিকরং নদীর কূলে ঘটে-যাওয়া দুর্ঘটনাটা তাঁর শরীরে স্থায়ী প্রভাব ফেলে গেছে। বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত নিজের বাংলো ছেড়ে বার হবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। তবে এখন তিনি খানিক সুস্থ। তাঁকে আরও সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। সামনে দীর্ঘ কর্মযজ্ঞ।

বাংলোর সামনের বাগানে দুটি বালিকা খেলা করছে। হঠাৎ অপেক্ষাকৃত বড়জন ছুটে এসে মিসেস ডি'সিলভার গলা জড়িয়ে ধরল। 'গ্র্যানি। কালকে মা এলে, শামু কি আমাদের সঙ্গে যাবে?' বড়জন জিজ্ঞেস করল।

'এইবার নয় সালু। পরের বার।'

'শামুর তো চার বছর হতে চলল গ্র্যানি। ও স্কুলে পড়বে না?' মিসেস ডি'সিলভা নরম চোখে তাকালেন বড়জনের দিকে। এই মেয়েটার মনে মায়াদয়া খুব। রক্তের সম্পর্কে কেউ হয় না জেনেও সে নিজের বোনের মতোই ভালোবাসে ছোটজনকে। মিসেস ডি'সিলভা হেসে বললেন, 'কিন্তু শাম্ভবী তো খুব ছোট। তোমার মা-বাবা দুজনেই কাজ করে অফিসে। তাই ভাবছি, ও আরও কিছুদিন থেকে যাক আমার কাছে।'

তাদের কথার মাঝখানেই আরেকটি বালিকা এসে দাঁড়িয়েছে। মিসেস ডি'সিলভার ছোট নাতনি। রক্তসূত্রে নয়, দিকরং কূল থেকে প্রায় চার বছর আগে মিসেস ডি'সিলভা এই বালিকাকে বুকে করে নিয়ে ফিরেছেন তাঁর বাড়ি। এই বালিকাই এখন তাঁর সর্বস্ব।

আগুনরঙা বালিকা রক্তপলাশের মতো কচি কচি হাতে মিসেস ডি'সিলভার গলা জড়িয়ে ধরল, 'তুমি বলেছিলে, লালকমল-নীলকমলের গল্পটা আজ বলবে।'

মিসেস ডি'সিলভা উঠলেন। 'হ্যাঁ, বলব তো। তবে রাত্রে, ডিনারের পরে।'

***

'অনেকদিন আগে লালমাটির দেশে নদীর ধারে ছোট্ট এক গাঁয়ে থাকত লালকমল। নদীর অন্য পারে আরেক গ্রাম। সেখানে এক রাজার বাড়ি। এই দুই গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় সরু নদী। একদিন বিকেলবেলা মাঠের মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লালকমলের ঘুড়ি গিয়ে পড়ল রাজবাড়ির ছাতে।

লালকমল ঘুড়ি আনতে যেতে চাইলেই সব বন্ধু হাঁউমাউ করে উঠল। তারা বলল, রাজবাড়ির ছাতে ভূত থাকে। এক ভীষণ সাধু এসেছিল রাজবাড়িতে। সে একটা পোষা রাক্ষস এনেছে সঙ্গে করে। সেই সাধু তো মরে গেল, কিন্তু রাক্ষসটা এখনও রয়ে গেছে রাজবাড়ির ছাতে। তাকে দেখলেই নাকি মানুষ পাথর হয়ে যায়।

লালকমল সাহসী ছেলে, ভূতপ্রেত মানে না। সে মোটেও বিশ্বাস করল না বন্ধুদের কথা। উলটে বাজি ধরল একাই গিয়ে রাজবাড়ির ছাত থেকে ঘুড়ি নামিয়ে আনবে। কথামতো লালকমল একাই গেল। বিশাল রাজবাড়ির পিছনদিকে ছাতে ওঠার লোহার সিঁড়ি। লালকমল সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠে গেল। দিনের আলোতে লালকমলের বিশেষ ভয় লাগছিল না, তবু যখন বিশাল ফাঁকা ছাতের উপরে সে পা দিল, তার গা-টা একবার ছমছম করে উঠল। রাক্ষসের চোখে চোখ পড়লে যদি পাথর হয়ে যায়!

ছাত শুনশান, কেউ নেই। ঘুড়িটাও দেখতে পেল না লালকমল। কিন্তু ছাতের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে দেখল একটা ঘর। অন্ধকার, ছায়া ছায়া ছোট্টমতো ঘর একখানা, ঠিক যেন ভূতের বাসা। লালকমল সাহসে বুক বেঁধে খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল ঘরের মধ্যে।

একটা ছোট স্টিলের ট্রাংক, ছোট একখানা খাট। একপাশে জানালার গায়ে একখানা টেবিল, সেটা উপচে পড়ছে রাজ্যের পুরানো দিনের বই আর তাড়া তাড়া কাগজে, একপাশে ভাঙা স্লেট, পেন, পেনসিল, চকখড়ি, গ্লোব। কেউ রীতিমতো পড়াশোনা করে এখানে বসে। লালকমল খুব অবাক হল। রাক্ষসরা পড়াশোনা করে নাকি?

টেবিলের উপরে রাখা আছে তার লাল ঘুড়ি। সে চুপিচুপি ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঠিক তখুনি দরজায় একটা শব্দ পেয়ে লালকমল ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, একজন দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিচ্ছে। ভয়ে লালকমলের বুক দুরদুর করে উঠল। সত্যি রাক্ষস! বন্ধুরা মিথ্যে বলেনি। রাক্ষসটা দরজা বন্ধ করে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। লালকমল ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। সে টেবিল থেকে একটা কাঠের স্কেল তুলে নিল। বাগিয়ে ধরল রাক্ষসটার দিকে।

রাক্ষসটা কচি গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি?'

লালকমল ভুরু কোঁচকাল। সে ভাবছিল, রাক্ষসটা এত বেঁটে কেন? তার থেকেও ছোট। সে তো শুনেছে রাক্ষসরা বিশাল লম্বা হয় পাহাড়ের মতো, মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো কান; কই, কিছুই তো মিলছে না। তবু রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'আমি লালকমল। তুই রাক্ষস?'

রাক্ষসটা হাসল। নাঃ, মুলোর মতো দাঁত কই? ছোট ছোট দুধে-দাঁত, প্রায় তার মতোই। তাহলে কি এ রাক্ষস নয়? কেমন যেন মানুষের মতোই দেখতে, আবার পুরোপুরি মানুষও

নয়। লালকমল যত দূর সম্ভব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কেমন রাক্ষস তুই? তুই মানুষ খাস? তোর চোখে চোখ রাখলে নাকি সবাই পাথর হয়ে যায়?’

লালকমলের একগাদা প্রশ্নের উত্তরে রাক্ষসটা মিটিমিটি হাসল শুধু। লালকমলের মনে হল এটা বোধহয় রাক্ষস নয়। ভূতও নয়। জিন? প্রেত? তা-ও নয়।

একটু ভাবনাচিন্তা করে লালকমল রাক্ষসটাকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুই একটু অন্যরকম মানুষ। তা-ই না?’

রাক্ষসটা এবার শব্দ করে হাসল। ‘আরে, তুমি তো খুব বুদ্ধিমান।’

‘তোর নাম কী?’ লালকমল জিজ্ঞেস করল।

‘তুমি লালকমল? তাহলে আমি নীলকমল।’ রাক্ষসটা একরাশ দুধে-দাঁত দেখিয়ে আবারও হাসল।

‘তুই এমন দেখতে কেন? কী হয়েছে তোর?’ লালকমল নীলকমলের কাছে এগিয়ে এল।

‘তুমি কি আমায় ছোঁবে?’ নীলকমল জিজ্ঞেস করল।

‘কেন? ছুঁলে কী হবে?’ লালকমল জিজ্ঞেস করল।

নীলকমল খাটে বসে থুতনিতে হাত রেখে একটু ভাবল। ‘কিছু হবে না। কিন্তু সবাই ভয় পায়। সেই জন্যেই তো আমি ছাতে থাকি। ছাত থেকে নামা বারণ। আমার সঙ্গে খেলেও না কেউ। আমার একটাও বন্ধু নেই।’

লালকমল এবারে নীলকমলের হাত ধরল, ‘আমি তোর বন্ধু হব। তুই আমার বন্ধু হবি?’

নীলকমল বন্ধু হতে রাজি হয় গেল। লালকমলের কাছে নীলকমল যেন শুধুই বন্ধু নয়, সে এক অতি সুন্দর দুর্লভ রত্ন। নীলকমল নিত্যনতুন খেলনা বানিয়ে দেয়, দুষ্টুমির উপায় বাতলে দেয় লালকমলকে।

নীলকমল পড়াশোনা করতে খুব ভালোবাসে। লালকমল তার জন্যে স্কুলের লাইব্রেরি, পাড়ার লাইব্রেরি ঘুরে ঘুরে বই এনে দেয়, খাতা কিনে দেয়। কখনও কখনও খেলতে এসে সে দেখে, নীলকমল খাতায় কী সব পড়াশোনার জিনিস লিখছে। জিজ্ঞেস করলে বলে, ‘তোর ভবিষ্যৎ সহজ করছি।’

প্রায় বছরখানেক মিশেও নীলকমলকে লালকমল কিছুতেই বাড়িটা থেকে বের করতে পারল না। সে লালকমলের সঙ্গে ছাতে ঘুড়ি ওড়ায়। বাগানে ঘুরে বেড়ায়। রাজবাড়ির বাঁধানো পুকুরে সাঁতার কাটে। কিন্তু বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে নীলকমল পা দেয় না কিছুতেই। লালকমল পীড়াপীড়ি করলে বলে, তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কালো পরি ঘুরে বেড়াচ্ছে। একমাত্র এই বাড়িতেই সে ঢুকতে পারবে না।

এদিকে রাজবাড়ির লোকেরা নীলকমলকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। যাতে লালকমলের সঙ্গে সে না মিশতে পারে তাই তারা তাকে ছাতের ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখে। কিন্তু অলৌকিক উপায়ে নীলকমল বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসত। রাজবাড়ির লোকেরা নীলকমলের উপরে আরও রেগে যেত। বাজে বাজে কথা বলত। নীলকমলের লোহার প্রাণ, সে সব সহ্য করত। কিন্তু সোনার পরান লালকমল ভেঙে পড়ত।’

ছোট নাতনি চুপিচুপি গ্র্যানির বুকে মাথা গুঁজল, 'নীলকমল আসলে রাক্ষস নয়, তা-ই না?'
মিসেস ডি'সিলভা ছোট নাতনিকে কোলে টেনে নিলেন, 'না রে। সেখানেই তো আসল দুঃখ। নীলকমল সত্যি সত্যি রাক্ষস ছিল। আর সে সেটা জানতও। জানত, কালো পরি খুঁজে পেলেই তাকে ধরে নিয়ে যাবে। তাই নীলকমল ভয়ে ভয়ে থাকত। যাতে করে কখনও কেউ তাকে বাড়িটা থেকে বার করে না দেয়। সে যতটা পারত, বাড়ির লোকের কথা শুনে চলত। সবাই তাকে আজেবাজে কথা বলত, এমনকী কখনও কখনও মারতও; কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করত।'
'তারপর কী হল?' দুই নাতনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল গ্র্যানির উপরে।

'এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে নীলকমল নিরাপদ। কোনওদিনও কালো পরি তাকে খুঁজে পাবে না। এক সাধু আর যোগিনী নিজেদের প্রাণ দিয়ে রাজবাড়িটাকে সুরক্ষিত করে গেছে। নীলকমল শান্তিতে না হলেও, স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিল।
হঠাৎ একদিন সেই রাজবাড়িতে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। সেই ঘটনার জন্যে সবাই নীলকমলকে দায়ী করল। সেই প্রথম রাজার চোখে নীলকমল খুনের ছায়া দেখল। ভয়ের চোটে নীলকমল ছুটে গিয়ে ছাতের ঘরে লুকিয়ে পড়ল। রাজা নীলকমলের ঘরের বাইরে তালা আটকে দিল। সন্ধে নামলেই নীলকমলকে সে খুন করবে।
কিন্তু নীলকমলকে কি অত সহজে আটকানো যায়? অন্ধকার নামতে না নামতেই নীলকমল বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে পালিয়ে গেল। সে বুঝতে পেরেছে, রাজা তাকে খুন করবে, সেই ভয়ে সে বাড়ির বাইরে পা রাখল।
প্রথমেই সে সাহায্য চাইতে গেল লালকমলের কাছে। কিন্তু কপাল খারাপ, লালকমল তখন পড়তে গেছিল পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি। নীলকমল তা জানতে পেরে পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় রাজার পোষা সাধুর দল এসে নীলকমলকে তুলে নিয়ে গেল। নদীর ধারে এক শ্মশানে নীলকমলের হাত-পা বেঁধে একটা ঝুপড়ির মধ্যে বন্দি করল। রাক্ষসকে মারার জন্যে সাধুর দল মন্ত্র পড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল ঝুপড়িতে।
লালকমল কোথা থেকে কে জানে খবর পেয়ে ছুটে এল। ততক্ষণে ঝুপড়িটা দাউদাউ করে জ্বলছে। লালকমল কিচ্ছু তোয়াক্কা করল না। সে একছুটে আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।
এবার গ্রামের লোকও ছুটে এল। তারা আগুন নেবানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মন্ত্রপূত আগুন কিছুতেই নিবল না।'
'লালকমল-নীলকমল ছাই হয়ে যাবে। কেউ জানবে না, কিন্তু ওরা ডিম হয়ে ফুটবে। লোহার ডিম, সোনার ডিম। তারপরে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি আসবে।' ছোটজন বেজায় উৎসাহে বলল।
'চুপ কর্। তারপর কী হল গ্র্যানি?' বড়জন জিজ্ঞেস করল।
'নীলকমল তো রাক্ষস। যে-সে রাক্ষস নয়, রাক্ষসকুলে সে সবার বড়। ওই কয়েকজন সাধুর সাধারণ মন্ত্রে জ্বালানো আগুনে তার কিছুই হত না। কিন্তু লালকমলের গায়ে আগুন ধরে গেছিল। নীলকমল বুঝতে পারছিল, গ্রামের লোক এই মন্ত্রপূত আগুন নেবাতে

চাইলেও নেবাতে পারবে না। আগুন জ্বলবে সারারাত। নীলকমল মরবে না, কিন্তু লালকমল ছাই হয়ে যাবে।

নীলকমলের চোখে জল এল। তার একটা বন্ধু হয়েছিল, যে তার জন্যে আগুনে ঝাঁপ পর্যন্ত দিতে পারে। এমন তো নীলকমল আগে দেখেনি কখনও। সে ছোটবেলা থেকে জানে সে রাক্ষস। সে খারাপ, অপয়া। তাকে মানুষ ভয় পায়, ঘেন্না করে। কিন্তু তাকে তো ভালোবাসেনি কেউ কখনও। সে কী করে মরে যেতে দেয় তার বন্ধুকে! তখন নীলকমল তার সবটুকু শক্তি দিয়ে কালকবচে বাঁধল লালকমলকে। মায়ার কবচ, প্রাণের কবচ, কালকবচে লালকমলকে আটকে দিল নীলকমল।'

'কালকবচ কী?' বড়জন জিজ্ঞেস করল।

'রাক্ষসরা সারাজীবনে একজনকেই এই রক্ষাকবচ দিতে পারে। এই কবচ যাকে দেওয়া হয়, অলৌকিক কোনও শক্তিতে তার মৃত্যু হয় না। আগুনটা মন্ত্রপূত আগুন ছিল। তাই লালকমল মরল না।

এদিকে নীলকমল রাজার বাড়ির বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কালো পরি খবর পেয়ে গেছিল। সে এক লহমায় উড়ে এল ওই গ্রামে। এসে দেখে, আগুন জ্বলছে।

তখন কালো পরি সাধুগুলোকে পটাপট মেরে ফেলল। সাধুগুলোকে মারতেই আগুন নিবে গেল। গ্রামের লোকের চোখে ধুলো দিয়ে নীলকমলকে নিয়ে চলে গেল কালো পরি। বাস। আমার গল্প ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল।'

বড়জন হাই তুলতে তুলতে বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক গল্প গ্র্যানি।'

'পচা গল্প।' ছোটজন ঠোঁট মোচড়াল।

***

দুজনকে ঘুম পাড়িয়ে মিসেস ডি'সিলভা উঠে এলেন বিছানা ছেড়ে।

বাইরের জগতের কাছে অনেকগুলো বছর তিনি মিসেস ডি'সিলভা সেজে বসে আছেন। তিনিই যে মহাযোগিনী কালসিদ্ধা, তাঁর এই রূপের কথা জানে না কেউ। পাতরগণ্য সাধকদের কাছে যখন যান, তখন তিনি কালসিদ্ধা। কালসিদ্ধা মা।

ঘর ছেড়ে বেরনোর আগে বছর চারেকের ঘুমন্ত শাম্ভবীর মুখের দিকে তাকালেন একবার মহাযোগিনী কালসিদ্ধা।

গত বছর রৌম্যজাগরণের পরে শাম্ভবী সামান্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মাস ছয়েক আগে খবর এসেছে, সেই রৌম্যকে স্বর্গদেওরা অবশেষে হত্যা করতে পেরেছে। খবর পেয়ে মনে মনে হেসেছিলেন তিনি। ভৈরব তার মানে জীবিত আছে।

তিনি অপেক্ষা করছিলেন সঠিক সময়ের জন্য। সামনের তাঁর একটাই বড় কাজ। ভৈরবকে রৌম্যশিশুর টোপ দেখিয়ে বের করে আনা। আর হত্যা করা।

কালসিদ্ধা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রায় বছরখানেক বাদে ২০১৪ সালের ৮ অক্টোবর একটা চন্দ্রগ্রহণ আছে। সেই সময়ে একটি রৌম্যজাগরণ করাতে হবে। তখন শাম্ভবীর ষষ্ঠ বছর চলবে। 'উমা' রৌম্য জাগ্রত হবে।

যোগিনী কালসিদ্ধা ঘরের আয়নায় নিজেকে দেখলেন একবার। মিসেস ডি'সিলভা বুড়ি হয়ে গেছে। শরীরে বিশেষ জোর নেই। হুইলচেয়ারটা প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই ব্যবহার করতে হয়। এইবার এই দেহটাকে ত্যাগ করার সময় এসে গেছে। জীর্ণানি বাসাংসি।

নতুন দেহের বড় প্রয়োজন। একটা শক্তিশালী দেহ। না, মানুষদেহ চাই না যোগিনী কালসিদ্ধার। মানুষদেহ বড় ঠুনকো, বড়ই মরণশীল। এক অজর অমর দেহের পরিকল্পনা মাথায় এসেছে যোগিনীর।

আয়নায় বৃদ্ধা ডি'সিলভাকে দেখতে দেখতে যোগিনীর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে উঠল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০১৮-র জানুয়ারিতে শাম্ভবীর নবম বর্ষে 'কালসন্দর্ভা' জাগরণ করাবেন তিনি। এই পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী 'কালসন্দর্ভা'র জন্ম দেওয়াবেন। তবে তার আগে ভৈরবকে মারা দরকার।

বছর চারেকের শাম্ভবীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কালসিদ্ধা আরেকটা বিষয়ে মনস্থির করলেন। সামনের রৌম্যজাগরণ হয়ে গেলেই তিনি শাম্ভবীকে কলকাতা পাঠিয়ে দেবেন।

ভৈরবকে টোপ দেখিয়ে টেনে আনার জন্য কিছুদিন তাঁকে বাইরে বাইরে কাটাতে হবে। পাতরগণ্য সাধকদের উপরে ভরসা করে এই কাজ সম্ভব নয়। ভৈরবহত্যার জন্যে তাঁকে নিজেকেই উপস্থিত থাকতে হবে। এই সময়টুকুর জন্যে কলকাতাই শাম্ভবীকে লুকিয়ে রাখার জন্যে সব থেকে ভালো জায়গা।

অবশ্য তারপরেও 'কালসন্দর্ভা' জাগরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গই হবে তাঁর কর্মকাণ্ডের যজ্ঞস্থল।

বর্তমান সময়কাল, জানুয়ারি ২০১৮

ষোলো

'আচ্ছা, লাল কে?' শাম্ভবীর প্রশ্নে কৃষ্ণা সামান্য হকচকিয়ে গেল। সে অতি মনোযোগ সহকারে হাতের বাটিটা চেটে পরিষ্কার করছিল। সামান্য চুরমুর তখনও লেগে ছিল। বামুনপিসি দারুণ বানিয়েছে জিনিসটা।

'লাল! তুই কী করে জানলি?' নিজের বাটিটা রেখে শাম্ভবীরটার দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বলল কৃষ্ণা।

'তোমরা তো কালকে রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে গেলে। তারপরে দাদু বলছিল কাকিমাকে, বিমুকে বোঝাও, লালকে ডাকা উচিত নয়।' শাম্ভবী নিজের বাটির বাকি চুরমুরটা দ্রুত মুখে পুরে জানাল।

কৃষ্ণা সামান্য বিমর্ষ হয়ে বলল, 'লাল, তৌফিকদার ডাকনাম। ও তো অনেক ছোটবেলা থেকে এই বাড়িতে আসে। দাদু ওকে ওই নামেই ডাকে।'

বিমলচন্দ্রর ঘোষণার পর থেকে চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। বাড়ির অবস্থা বেশ থমথমে। লতা তো কারও সঙ্গে কথাই বলছে না। সুরমাদেবীও সামান্য মনমরা। বিকেলে পুকুরঘাটে ছোটরা বসে সেইসব নিয়েই আলোচনা করছিল।

কৃষ্ণা সোলাঙ্কীর ক্যামেরাটা হাতে নিতে নিতে বলল, 'মামা যা কেস করল। এদের সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। যখন আসত, তখন এখানে ছুঁস না, ওখানে বসিস না। এখন নাকি নিজে গিয়ে ডেকে আনবে।'

সোলাঙ্কী তখনও নিজের বাটির চুরমুরটা খেয়ে শেষ করতে পারেনি।

সে-ও ঘাড় দোলাল, 'এটা বড্ড বাড়াবাড়ি। সবকিছু বাদ দিলেও লতাদির কথাটা ভাবা উচিত। এই সময় এত মেন্টাল প্রেশার ভালো নাকি? তবে তৌফিকদা হয়তো আসবে না।'

'হয়তো কেন? নিশ্চয়ই আসবে না।' কৃষ্ণা জোর দিয়ে বলল। 'সেটাই ভালো হবে। মামা একেবারে মুখের উপর জবাব পেয়ে যাবে।'

'লালকমল আসবে।' শাম্ভবী দিদির বাটি থেকে একটু পাপড়ি আর আলু তুলে নিল।

'লালকমল কে আবার?' কৃষ্ণা প্রশ্ন করল।

সোলাঙ্কী হাসল, 'শামু আবার ফ্যান্টাসি ফ্যান্টাসি খেলছে। লালকমল। নীল-কমল। লাল পরি। কালো পরি। কয়েকদিন ধরে এই শুরু করেছে। এতদিন নীলকমল ছিল শুধু। তাকে নাকি কারা আটকে রেখেছে। তাকে নাকি উদ্ধার করা উচিত। এবার লালকমলও এল।'

'ইস্। রাজপুত্তুরকে আটকে রেখেছে। কোথায় আমাদের কুমারীদেবীকে আটকে রাখবে আর রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে এসে হুস করে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।' কৃষ্ণা ঠোঁট মোচড়াল, 'তবে এই আইডিয়াটাও খারাপ না। টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে না-হয় রাজকন্যেরাই

রাজপুত্তুরদের উদ্ধার করে আনবে। তা শামু, কীভাবে উদ্ধার করবি? পক্ষীরাজে, নাকি মোটরবাইকে? ওহ্‌, তার থেকেও বড় কথা, কাকে উদ্ধার করবি? লালকমলকে, নাকি নীলকমলকে?'

শাম্ভবী খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'লালকমলকে। নীলকমলকে উদ্ধার করা হয়ে গেছে। বাকিটা সে নিজে বুঝে নেবে।'

'এহে। নিজে বুঝে নিলে কিন্তু তোকে আর পাত্তা দেবে না। এই জন্যে উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করে নিতে হয়। জানিস না?'

শাম্ভবীর মুখ দেখে মনে হল, সে রেগে গেছে। সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা পরস্পরকে ইশারা করে শাম্ভবীকে আরও রাগানোর তাল করছিল। এমন সময় খিড়কির দরজা দিয়ে অচিন্ত্য বেরিয়ে এল।

'জানিস, বাবা সকালে তৌফিকদাদের বাড়িতে গিয়েছিল।' অচিন্ত্যের ঘোষণায় আলোচনাটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল। শাম্ভবীকে ছেড়ে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল অচিন্ত্য।

'তৌফিকদা বলেছে, ও নাকি দিল্লি চলে যাচ্ছে। চাকরি পেয়েছে। আজ রাত্রেই কলকাতা চলে যাবে। কাল সকালে হাওড়া থেকে ট্রেন।' অচিন্ত্য গুছিয়ে বসল শানের উপরে।

'একদম ঠিক করেছে। দিয়েছে মুখে জুতো ঘষে।' কৃষ্ণা এমনভাবে হাত নাড়াল, যেন সে নিজেই মামার মুখে জুতো ঘষে দিল। অচিন্ত্য একটু রেগে গেলেও কিছু বলল না। তৌফিকদাকে ডেকে আনাটা সে-ও সমর্থন করতে পারছে না।

'দেখলি, আমি বললাম না, তৌফিকদা কোনওভাবেই আসবে না।' সোলাঙ্কী বলল শাম্ভবীর দিকে তাকিয়ে।

কৃষ্ণা বলল, 'হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। মামার সত্যি এতটুকু সেন্স নেই।'

'খুবই সেন্স আছে। আসল ব্যাপারটা অন্য।' অচিন্ত্য জানাল।

'মানে? কী ব্যাপার?' কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কী ঘনিয়ে বসল অচিন্ত্যর দু-পাশে।

'তৌফিকদা নাকি ওই সোনাঝুরির পরের দিনই দিদির সঙ্গে দেখা করেছে পুকুরপারে। আর সেটা বামুনপিসি দেখেছে।' অচিন্ত্য জানাল।

'বলিস কী?' কৃষ্ণা চমকে উঠল।

'হুঁ। তাই বাবা এখন যজ্ঞ করাতে চায়। সেই জন্যেই এত আঠা।' অচিন্ত্য একটা ঢিল ছুড়ল পুকুরের জলে। 'বাবা-মা সন্দেহ করছে, দিদিকে তৌফিকদা কোনওভাবে ইয়ে মানে বশীকরণ করেছে। তাই ওদের কাটান-ছেঁড়ানের জন্য যজ্ঞ করাবে। ওই কঙ্কালীতলার তাবিজ সাধুটা, আরে, সেইদিন যার কাছ থেকে দিদির জন্যে তাবিজ এনে দিলাম, সেই সাধুটার সঙ্গে বাবা কথা বলে এসেছে। আমার জন্মদিন পড়েছে গিয়ে তোর শনিবার। ওইদিনই হবে যজ্ঞ। সব ঠিকঠাক। সাধু নাকি বলেছে, যজ্ঞের বিভূতি শুধু দিদিকে দিলেই হবে না। তৌফিকদাকেও খাওয়াতে হবে। এবার বুঝেছিস?'

'আর জয়ন্তদা এইসব জেনে-শুনে সমর্থন করছে! ছি ছি!' কৃষ্ণা রাগত স্বরে বলল।

'আরে না। বাবার কথায় বুঝলুম, জয়ন্তদা এখনও কিছুই জানে না এইসব যাগযজ্ঞের ব্যাপার। কিছু না জেনেই কাল রাত্রে জয়ন্তদা জাস্ট কৌতূহল থেকেই ওই কথাগুলো

বলেছে। বাস, বাবা সেটাকেই ইস্যু করে এখন...'

'জয়ন্তদাকে সব জানিয়ে দিলেই, কাকু আর কিছু করতে পারবে না।' সোলাঙ্কী বলল।

'আমি এখুনি গিয়ে জয়ন্তদাকে সব বলে দিচ্ছি।' কৃষ্ণা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

'না, না।' অচিন্ত্য কৃষ্ণার হাত চেপে ধরল, 'এখুনি কিছু বলার দরকারটা কী? তৌফিকদা তো আর আসছে না। শুধু শুধু তৌফিকদা আর দিদির ব্যাপারটা জেনে যাবে জয়ন্তদা। সেটা আমি চাই না।'

'তা ঠিক।' কৃষ্ণা আবার বসে পড়ল।

সোলাঙ্কী হঠাৎ একটু বিমর্ষ সুরে বলল, 'কেন যে লতাদি জয়ন্তদাকে বিয়ে করল!'

'প্রথমে তো জানা যায়নি কী হয়েছে। দিদি হয়তো ভেবেছিল, তৌফিকদা ডিচ করেছে। দিদি কিন্তু বিয়ে করতে চায়নি, পরে জয়ন্তদার সঙ্গে কথা বলে কী হল কে জানে, রাজি হয়ে গেল।' অচিন্ত্য বলল।

'জয়ন্তদা ঠিক তৌফিকদার উলটো। দেখছিস না কীরকম বোকাসোকা মানুষ। দিদির কথায় তো ওঠে-বসে। আমার মনে হয়, ওটাই লতাদির মনে লেগে গেছিল। অ্যাট লিস্ট পত্নীব্রতা পতি বলে কথা। প্রত্যেক মেয়ে তা-ই চায়।'

'হুম।' অচিন্ত্য চুপ করে গেল।

'মামাটা একেবারে কংসমামা হয়ে গেছে। তৌফিকদা যে জব নিয়ে দিল্লি চলে যাচ্ছে— এটাই বেস্ট। ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে কেন নিজের লাইফ নষ্ট করবে? এমনিতেই অনেকগুলো মাস নষ্ট হয়ে গেছে তৌফিকদার।' কৃষ্ণা নিজের মনেই বকবক করে যাচ্ছিল।

'লালকমল আসবে। ওরা লালকমলকে যেতে দেবে না।' নিচু গলায় বলা শাম্ভবীর কথাগুলো কেউ শুনতে পেল না। শাম্ভবী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

'আমি একটু ওই সামনের মাঠটা থেকে ঘুরে আসি?'

'একদম না।' কৃষ্ণা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। 'তুই এক পা এদিক-ওদিক গেছিস তো, পা ভেঙে দেব একেবারে।'

শাম্ভবী মুখ হাঁড়ি করে গোঁ গোঁ করে উঠল, 'তোমরা নিজেরা কোথাও যাবে না। খেলবে না। সারাক্ষণ বসে বসে প্যাটর প্যাটর করবে।'

'বিশুকাকুকে বল্ ওকে একটু ঘুরিয়ে আনতে। দাদুকেও বলতে পারিস।' অচিন্ত্য বলল।

কৃষ্ণা শাম্ভবীকে নিয়ে গিয়ে বিশুর জিম্মায় দিয়ে এল। সোলাঙ্কী তখনও ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছে। আচমকা শাম্ভবীর ব্যাপারে সে যেন খুব উদাসীন হয়ে গেছে। কৃষ্ণার কেমন একটু অদ্ভুত লাগল।

সতেরো

নদীর অন্য পারে ঝুপসি হয়ে গাছের ছায়া পড়েছে জলে। উত্তুরে হাওয়াকে থামিয়ে মাঝে মাঝে এক-এক ঝলক গরম হাওয়া ছুটে আসছে দক্ষিণদিক থেকে। পড়ন্ত সূর্য কোপাইয়ের জলে সিঁদুর গুলে দিয়েছে। আজন্মপরিচিত নদীটা মুছে গিয়ে, আরেকটা সিঁদুর-পরা মুখ বারবার ভেসে উঠছে তৌফিকের চোখের সামনে।

লতাকে তৌফিক প্রথম দেখেছিল অনেক ছোটবেলায়। চন্দ্রমৌলির সঙ্গে খেলতে উপাধ্যায়বাড়িতে সে যখন যেত, তখন ওই বাড়িতে প্রায় তাদের বয়সিই দুটো ছেলেমেয়েকে সে দেখেছিল। লতা তার থেকে বছর দুয়েকের ছোটই হবে। চন্দ্রমৌলি প্রায় লতার বয়সিই ছিল। অচিন্ত্য আরও দু-এক বছরের ছোট। অবশ্য রোগা স্বাস্থ্যের জন্য চন্দ্রমৌলিকে অচিন্ত্যর থেকেও ছোট দেখতে লাগত। তখন তৌফিক দু-একবার লতাকে দেখলেও কখনও সেভাবে খেয়াল করেনি।

প্রথম খেয়াল করেছিল সেই ভয়ংকর দিনে। তৌফিক স্যারের কাছে পড়তে গিয়েছিল। ওই একই স্যারের কাছে লতাও পড়তে যেত। প্রথমে মেয়েদের ব্যাচ, তারপরে দু-ক্লাস উঁচু ছেলেদের। টিউশন শেষ করে লতা অপেক্ষা করছিল তৌফিকের জন্য। তৌফিক আসতেই তাকে এক ধারে টেনে নিয়ে যায়। সংক্ষেপে বর্ণনা করে দুপুরের মারাত্মক ঘটনার কথা। তারপরে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'বাবা তোমার বন্ধুকে মেরে ফেলবে বলেছে। ওকে ছাতের ঘরে আটকে রেখেছিল। কিন্তু সে পালিয়ে গেছে। বাবা ওকে খুঁজে পেলে শেষ করে দেবে।'

তৌফিকের আর টিউশনে যাওয়া হয়নি সেইদিন। ও পাগলের মতো দৌড় দেয় বাড়ির দিকে। কঙ্কালীতলা পুরানো শ্মশানের পাশ দিয়ে শর্টকাট করার সময় দেখে, কয়েকটা সাধু চন্দ্রমৌলিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সাধুগুলো চন্দ্রমৌলিকে ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। তৌফিক প্রায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতোই এসে ঝাঁপ দিয়েছিল ওই আগুনের মধ্যে।

কতদিন হল? প্রায় নয়-দশ বছর তো হবেই। তখন তৌফিকের বয়স ছিল এগারো।

কোপাইয়ের ধারে বসে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তৌফিক ডান হাতটা একবার তুলে ধরল। সে ওই হাতে সবসময় একটা রিস্টব্যান্ড পরে থাকে। কাউকে দেখতে দিতে চায় না দাগটা। তার কবজিতে বাদামি চামড়ার উপরে একটা অদ্ভুত দাগ। একগাছি সাদা সুতো যেন তিন ফেরতা দিয়ে বাঁধা।

সেইদিন আগুনের তাতে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আগুন নেবার পরে গ্রামের লোক তাকে শ্মশান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। জ্ঞান ফিরতে সে দেখে হাতে এই দাগটা। যেন চন্দ্রমৌলি মিশে আছে তার হাতের সামান্য অংশে। যেন সারাজীবন তাকে রক্ষা করবে বলে তাগা বেঁধে দিয়েছে হাতের মধ্যে। চন্দ্রমৌলিকে সেদিনের পর থেকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। চন্দ্রমৌলি কি মারা গিয়েছিল সেই আগুনে পুড়ে?

তৌফিকের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

লতার সঙ্গে সেই থেকেই তৌফিকের বন্ধুত্ব। গ্রামে থাকা, এক স্কুলে পড়া, দুটো অসমবয়স্ক ছেলেমেয়ের মধ্যে যতটা বন্ধুত্ব হতে পারে। তারপরে তো সে পড়াশোনা

করতে চলেই গেল কলকাতা। আচমকা বছরখানেক আগে অচিন্ত্যকে পড়াবার সূত্রে উপাধ্যায়বাড়িতে দ্বিতীয়বার এসে, কীভাবে কী যে হয়ে গেল। তৌফিক নদীর দিকে তাকাল। লতার বালিকা বয়সের মুখটা তার মনে পড়ল না, সিঁদুর-পরা দাম্ভিক মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল তৌফিকের।

আজ সকালে বিমলচন্দ্র এসেছিল তাদের বাড়িতে অচিন্ত্যর জন্মদিনে তৌফিককে নিমন্ত্রণ করতে। তৌফিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। স্রেফ থ হয়ে গিয়েছিল। তৌফিককে কী পেয়েছে ওরা? সব ক-টা সমান। যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। ওই বংশের রক্তে দোষ আছে। সব বেইমানের দল। নিশ্চয়ই তলে তলে ডিভোর্স সেট্‌লমেন্টের জন্য ডেকে পাঠাচ্ছে।

রাগের চোটে তৌফিক দুটো পাথর ছুড়ল নদীতে। এইভাবে পাথর ছুড়ে যদি ওই মেয়েটার মাথাটা ভেঙে দিতে পারত তৌফিক। ইয়া আল্লাহ্, এত কষ্টও রেখেছিলে তুমি। যখন সেই শয়তানগুলো ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, মারছিল, টর্চার করছিল, যখন তার হাড়গুলো ভেঙে যাচ্ছিল, তখনও শুধু ওই নারীর কথা মনে করে দাঁতে দাঁত চেপে তৌফিক সহ্য করছিল সমস্ত যন্ত্রণা। তার বুকে যে এত বিষ তা তো সে জানত না। ওই নারী যেন কালকেউটে হয়ে তাকে ছোবল মেরেছে। তাকে তো জ্বলেপুড়ে যন্ত্রণায় খাক হয়ে যেতেই হবে সারাজীবন।

পাশেই কোনও একটা গাছে একটা কোকিল তারস্বরে চিৎকার করছে। তৌফিকেরও একবার ওইভাবে চেঁচাতে ইচ্ছা করল। চিৎকার করার বদলে সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিজেকে জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্ঠে, যেন ছেড়ে দিলে এখুনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে কোপাইয়ের পারে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যাবে বসন্ত বাতাসে।

***

বিমলচন্দ্র তারকনাথকে খুঁজতে খুঁজতে ছাতে উঠে এলেন। সব ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। এখন শুধু বাবামশাইকে একবার জানানো দরকার। বহুদিন আগে তারকনাথের দাদার সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ঘটার পর থেকেই, বাড়ির মধ্যে সাধুসন্ন্যাসী ঢোকাতে তারকনাথের বড় আপত্তি। বিমলচন্দ্র সেটা জানেন। কিন্তু এখানে তাঁর সম্মান নির্ভর করছে। সাধুজির কথায় শুধু ওই মোল্লার বেটাকে কেন, নিজের মেয়েকে কেটে ফেলতেও বিমলচন্দ্র দ্বিধা করবেন না।

আসল অসুবিধা বাবামশাইকে নিয়ে। তারকনাথ কিছুতেই বিমলচন্দ্রকে ঠিকঠাক কোনও স্টেপ নিতেই দেন না। এখন অন্তত যজ্ঞটা করাতে যদি রাজি করানো যায় তারকনাথকে। বিমলচন্দ্র মনে মনে ঝগড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

তারকনাথের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই তৌফিক এই বাড়িতে ঢুকতে পেরেছিল। কী প্রয়োজন ছিল ওই মুসলিম ছেলেটাকে অচিন্ত্যর মাস্টার করে রাখার! এখন ঠেলা সামলাও। বিমলচন্দ্র মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন তারকনাথের প্রতি। তিনি সেই সময়ই চেয়েছিলেন তৌফিককে জেলে ঢোকাতে। পরে অবশ্য বেটার অবস্থায় তিনি খুশিই ছিলেন। কিন্তু সে আর কতদিন! বেটাচ্ছেলে আবার খাড়া হয়েছে। তিনি অনেক সহ্য করেছেন,

কিন্তু আর নয়। মুসলিম ছোঁড়া তুই, ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েকে বিয়ের পরেও ফুঁসলানোর চেষ্টা করছিস! প্রথমবার ছেড়ে দিয়েছেন, এবার তিনি তৌফিককে শেষ করে দেবেন। তাবিজবাবা বলেছেন, এই যজ্ঞটা উপাধ্যায়বাড়ির মধ্যেই করতে হবে। সব থেকে বড় কথা, যজ্ঞের প্রসাদ লতার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াতে হবে তৌফিককেও। সুরমাদেবীও রাজি যজ্ঞ করাতে। এখন তারকনাথ রাজি হলেই বাঁচা যায়। বিমলচন্দ্রর জামাইটা আবার এইসব ব্যাপারের একদম বিরোধী হয়েছে। উফ, কী যে জ্বালা হয়েছে। বাবামশাইকে চাপ দিয়ে রাজি করাতে পারলে, তিনি হয়তো নাতজামাইকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করাতে পারবেন।

বিমলচন্দ্র দেখলেন, ছাতের একপাশে সেই ঘরটার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন তারকনাথ। কোনও কারণে তারকনাথকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

বিমলচন্দ্র যজ্ঞের কথাটা পাড়তেই তারকনাথ প্রথমে চমকে উঠলেন। তিনি ভেবেছিলেন, বিমলচন্দ্র বুঝি এখুনি বলবেন শাম্ভবীকে ওঝা ডেকে ঝাড়ানোর কথা। পরে সবটা শুনে তিনি বিমর্ষ মুখে ঘাড় হেলালেন। ‘ঠিক আছে। যজ্ঞ হোক।’

বিমলচন্দ্র অবাক হলেন। বাবামশাইকে রাজি করাতে বেগ পেতে হবে, এমনটাই ভেবেছিলেন তিনি। বিমলচন্দ্র চলে যাচ্ছিলেন।

তারকনাথ তাঁকে ডাকলেন, ‘কিন্তু অচিন্ত্যর মা বলছিল, লাল নাকি বলেছে, সে চলে যাচ্ছে। তাহলে আবার এইসব ঝুটঝামেলার... দেখ, ছেলেটা তো ভুগল কিছু কম নয়! আর সে যখন চলেই যাবে বলছে...’

বিমলচন্দ্র একেবারে জ্বলে উঠলেন, বললেন, ‘তবু যজ্ঞটা হোক।’

‘লাল কি আসবে এই বাড়িতে?’

‘ওর ঘাড় আসবে।’

‘দেখ, যা ভালো বোঝ কর। তবে অন্যের ছেলে। এমন কিছু করে বসো না, যাতে করে লোকে আমাদের দোষ দেয়। তুমি তো আবার আজকাল কোনও কথাই আমাকে বল না। নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নাও।’

তারকনাথের কথার সুরে বিমলচন্দ্র বুঝলেন, গতবারে ওই বেটাচ্ছেলের কিডন্যাপ হওয়া আর মৃতপ্রায় হয়ে ফিরে আসা নিয়ে, আর দশজনের মতো বাবামশাইও তাঁকেই কটাক্ষ করছেন।

বিমলচন্দ্র দাঁতে দাঁত পিষলেন, ‘আপনি তাহলে মত দিচ্ছেন।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা যজ্ঞ করিয়ে যদি শান্তি পাও তো ভালো।’ বিমলচন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে তারকনাথ বললেন।

বিমলচন্দ্র হাঁপ ছেড়ে নেমে এলেন। বাবামশাইকে সব কথা জানানোর প্রয়োজন নেই। তৌফিকদের বাড়ি থেকে ফেরার সময়ে সাধুজির সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গেছে। তৌফিক যাতে চলে যেতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করবেন বলেছেন সাধুজি। উপাধ্যায় পরিবারের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে তিনি সবই করতে পারেন।

***

শাম্ভবী শান্ত মেয়ের মতো হেঁটে যাচ্ছিল বিশুর হাত ধরে। একবার লালকমলের কাছে যাবে সে। সেদিন কঙ্কালীতলায় সে যখন নীলকমলকে বাঁচিয়ে দিল আগুনের হাত থেকে, তখন নীলকমল যেন তাকে কিছু 'পাওয়ার' দিয়েছে। সে যদি ভীষণ জোর দিয়ে কিছু চায় তাহলে অন্যেরা তা-ই করছে। সোনাঝুরি থেকে ফিরে আসার পরে দিদিয়া চাইছিল বাড়ি চলে যেতে। কিন্তু সে দিদিয়াকে বদলে দিয়েছে। দিদিয়াকে কিছু বলতে দেয়নি তার হারিয়ে যাওয়ার কথা, মাকেও না, বাবাকেও না।

সেদিন কঙ্কালীতলায় নীলকমলকে বাঁচানোর পরে কালো পরিটা তাকে খেয়ে ফেলেছিল। কালো পরিটা সোনাঝুরিতে সাধুটাকে মেরে দিল। কালো পরিটা খুব খারাপ। অবশ্য সাধুটাকে মারার পরে সে যুদ্ধ করে কালো পরিটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মন থেকে। হৃৎপিণ্ডটা খাওয়ার পরেই তার 'পাওয়ার'টা অনেক বেড়ে গেছে। কালো পরিটা তো জানত না, নীলকমল নিজের শক্তি ধার দিয়েছে শাম্ভবীকে। নীলকমলের শক্তি দিয়েই সে কালো পরিটাকে নিজের মন থেকে দূর করে দিয়েছে।

সোনাঝুরিতে লালকমল তাকে দেখে মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয়ের চোটে লালকমল প্রায় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিল। লালকমল যদি অন্যদেরকে বলে দেয়, এই ভয়ে শাম্ভবী লালকমল-এর মনের মধ্যে অন্য চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। লালকমল ভুল দেখেছে। লালকমল স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু কালো পরিটা তাকে যে কী জাদু করেছে, সে কিছুতেই নীলকমলকে বলতে পারছে না এখানকার কথা। জানাতে পারছে না সে কোথায় আছে। এখন লালকমলকে বলতে হবে নীলকমলকে ডাকার কথা। শাম্ভবীর ছোট্ট মাথায় অনেকগুলো চিন্তা ঘুরছিল।

কালো পরিটা তাকে যে কোনও সময় গিলে খাবে। নীলকমল ছাড়া কে বাঁচাবে তাকে?

***

তৌফিক কতক্ষণ মুখ গুঁজে বসে ছিল, সে জানে না। রিনরিনে গলায় কে যেন ঠিক তার কানের কাছে ডাকল, 'লালকমল!'

তৌফিক মুখ তুলল। একটা লম্বা রোগাপটকা বছর আট-নয়ের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। অদ্ভুত লালচে ত্বক, ডিম্বাকৃতি মুখ, সামান্য উঁচু হনু, সরু সরু চোখ, ক্লিপের বাঁধন ছিঁড়ে রুক্ষ লাল কোঁকড়ানো চুলের বোঝা নেমে এসেছে কাঁধ-পিঠ জুড়ে। সেই মেয়েটা!

এক লহমায় তৌফিক সোনাঝুরির আতঙ্কে ফিরে গেল। সেইদিন সোনাঝুরিতে তৌফিক যখন শাম্ভবীকে কোলে নিয়ে বসে আছে, তখন খুঁজতে খুঁজতে বিশু চলে আসে তাদের কাছে।

তৌফিকের পুলওভারে তখনও রক্ত লেগে। একটু দূরে সাধুটার লাশ। বিশু প্রথমেই বলে ওঠে, 'এ কী! সাধুটাকে কে মারল!'

তৌফিক বুঝতে পারছিল না, কী করবে! একে তো ওরকম অস্বাভাবিক দৃশ্য, কিন্তু তার ঠিক অতটাও কেন যেন ভয় লাগছিল না। দৃশ্যটা দেখার পর কিছুক্ষণ তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, তারপর থেকেই কে যেন তাকে বারংবার বলে যাচ্ছে, ওটা ভুল, ওটা স্বপ্ন।

কিন্তু বিশুর সপাট প্রশ্নে তৌফিক যেন ধড়ফরিয়ে জেগে উঠল। বিশুর পরের কথাগুলোয় আর তার চোখ মুখের ইঙ্গিত দেখে তৌফিকের মনে হচ্ছিল খুনের দায়টা তার উপরেই চাপতে যাচ্ছে। শাম্ভবীর হাতে-মুখে-সোয়েটারে রক্ত লেগে আছে দেখেও বিশু বিশ্বাস করতে চাইছিল না। কে-ই বা বিশ্বাস করবে! তৌফিক নিজেও কেমন যেন বিভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছিল।

একবার তার মনে হচ্ছিল সে যেন শাম্ভবীকেই দেখেছে খুনটা করতে, পরক্ষণেই তার মনে হচ্ছিল অন্য কেউ সাধুটাকে খুন করেছে, শাম্ভবীর গায়ে রক্ত ছিটকে এসে লেগেছে।

তৌফিক কোনওরকমে মিথ্যে করে বানিয়ে বলে, 'আমিও এসে দেখছি, সাধুটা মরে পড়ে আছে। আর এই মেয়েটার এমন অবস্থা।'

মিথ্যেটা বিশু যত সহজে মেনে নিয়েছিল, পুলিশ যে মোটেও মানবে না, সেটা তৌফিক স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। খুনের দায়টা শেষমেশ তার উপরেই পড়বে নাকি, এই ভেবে তৌফিকের বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। বিশুই তখন একটা পন্থা বার করে।

পুলিশ খোঁজ পেলে তৌফিকের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও খুনের জালে জড়িয়ে পড়বে। তাই বিশু বলে শাম্ভবীকে হাত-মুখ ধুইয়ে পরিষ্কার করে গাড়িতে ফেরত নিয়ে যাওয়ার কথা।

সোনাঝুরির জঙ্গলে জলের খোঁজ পাওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার! তৌফিক জানত, আদিবাসী গ্রামের পিছনদিকে একটা মজা পুকুর আছে। সেখানে জামাকাপড় খুলিয়ে শাম্ভবীকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করানো হল। জামাকাপড়েও রক্ত লেগে গিয়েছিল। রক্তে ভেজা হলুদ সোয়েটারটা তো বিশু সোজা তার হাতেই ধরিয়ে দিল। কালো জিন্‌সটায় কয়েক ফোঁটা লেগেছিল কি লাগেনি। অতটাও বোঝা যাচ্ছিল না।

বিশু বলল, পরে ব্যবস্থা করবে। অত চানটান করানোর সময়ও শাম্ভবীর জ্ঞান ফেরেনি দেখে তৌফিকের একটু আশ্বস্ত লাগছিল। মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে দেখেনি। সে তো টর্চের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে জ্ঞান ফিরলেই মঙ্গল।

আসলে তার তখন মাথাটা ঠিক করে কাজ করছিল না। বিশু যা বলছিল তা-ই করে করে যাচ্ছিল।

নিজের পুলওভারের সঙ্গে সেদিন রাত্রে শাম্ভবীর ওই রক্ত-মাখা সোয়েটারটাও সে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আগুনে।

সে রজতকে কিছু বলতে পারেনি সেইদিন, তার পরের দিনও না। প্রথমত খুনের প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা, দ্বিতীয়ত কেউ তার কথা বিশ্বাসই করবে না, ওইরকম অস্বাভাবিক ঘটনা...

মেয়েটাকে দেখেই তৌফিকের হাত-পা ঠান্ডা হতে শুরু করল। সে কোথায় আছে? কোপাই নাকি সোনাঝুরি? দিন না রাত্রি এখন? সোনাঝুরির ভয়ংকর দৃশ্যটা আবার তার মাথার মধ্যে ফুটে উঠছিল। কিন্তু কে যেন দৃশ্যটায় চাদর চাপা দিয়ে দিল। তুমি ভুল দেখেছ, তুমি স্বপ্ন দেখেছ।

'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমি শাম্ভবী!' বালিকা মাথা দোলাল।

তৌফিকের ভয় ভয় ভাবটা আচমকা কেটে গেল। সে-ও ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, সেইদিন সোনাঝুরিতে সে ভুলই দেখেছে। স্বপ্নই দেখেছে। ওটা কোনও স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

'তুমি নীলকমলকে কখন ডাকবে?'

'কী!?' তৌফিক যতটা ভয় পাওয়ার, তার থেকেও বেশি হতভম্ব হয়ে গেল।

'আহ্। নীলকমলকে যদি না ডাক, তবে নীলকমল জানবে কী করে? বুঝবে কী করে? সে তো সব ভুলে বসে আছে। তুমি ডাক পাঠালেই তার মনে পড়ে যাবে সবকিছু।'

'কে?' আগের মতোই তৌফিক হতভম্ব হয়ে বলল।

'ধুর বাবা। তোমার বন্ধু গো। নীলকমল, নীলকমল। ও এলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। নয়তো আমাকে কালো পরিটা খেয়ে ফেলবে।' শাম্ভবী সামান্য কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

এবার তৌফিক নিজেকে সামলে নিল। এই মেয়েটার বড়সড়ো কোনও প্রবলেম আছে। একে অবিলম্বে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত। এর কী হয়েছে?

'আমি তো এই কথা বলতেই তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম। দেখি, তুমি এখানে বসে আছ।' শাম্ভবী কলকল করে বলে উঠল।

তৌফিক সাহায্যের আশায় এদিক-ওদিক তাকাল। মেয়েটা কি আবার একলা একলা পালিয়ে এসেছে নাকি বাড়ি থেকে?

'তুমি কি চলে যাবে?' শাম্ভবী এবার গম্ভীর গলায় বলল।

তৌফিক একটু আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ। সেরকমই তো ভেবেছি।'

'কিন্তু ওরা তোমায় যেতে দেবে না।' শাম্ভবী একরাশ কোঁকড়া চুল দুলিয়ে বলে উঠল।

এতক্ষণে তৌফিক দেখতে পেল, নদীর ধার ধরে বিশু উঠে আসছে। সে বিশুকে ডাকবে বলে হাত তুলছিল, শাম্ভবীর কথায় থমকে গেল।

'যেতে দেবে না? কারা?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

'তুমি যেতে চাইলেই শাহাজাদির বিপদ হবে।' আচমকা রুক্ষ গলায় বলে উঠল শাম্ভবী। 'ওরা তোমার শাহাজাদির ক্ষতি করে দেবে। আমি কিন্তু ওদেরকে আটকাব না। আমি চাই, তুমি থাকো।'

শাম্ভবীর কথা ক-টা শেষ করতে না করতেই বিশু তাদেরকে দেখতে পেল।

সে দূর থেকেই হাত নাড়ল, চেঁচিয়ে বলল, 'হেই। ওকে ধরে রাখ।'

তৌফিক প্রত্যুত্তরে হাত নাড়তে ভুলে গেল। কী সব বলছে এই মেয়েটা! তৌফিক হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। 'কেন?'

'লালকমলের বুকে নীলকমল জাগে। লালকমল না ডাকলে নীলকমল আসবে না। নীলকমল না এলে কালো পরি আমায় খেয়ে ফেলবে। তোমার যাওয়া চলবে না। আমি শুধু বলতে এসেছিলাম, তুমি নিজেই থাকলে তোমার শাহাজাদির কোনও ক্ষতি হত না। আর তারপরেও যদি তুমি চলে যাও, তাহলে তোমার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে।'

আঠারো

পরের দিন বিকেলবেলা সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা মুখ চুন করে ছবিটা দেখছিল। দুপুরবেলা কখন কে জানে শাম্ভবী এই ছবিটা এঁকেছে। ছবি আঁকার খাতাটা খোলাই পড়ে ছিল টেবিলের উপরে। সন্ধ্যাবেলা টেবিলটা গুছিয়ে রাখতে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণা দেখেছে। তারপরে ডেকে দেখিয়েছে সোলাঙ্কীকে।

'দাদুকে দেখাই?' কৃষ্ণা বলল।

সোলাঙ্কী চুপচাপ মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, শাম্ভবী ছবি আঁকে। আর দশটা বাচ্চা মেয়ের থেকে অনেক ভালোই আঁকে। কিন্তু এরকম ঘোরতর বিকৃত ছবি!

এক বিকট যোগিনীর মুখ। তার গায়ের রং কাজলকালো। মাথায় দীর্ঘ এক বেনি। মৃদু হাসিওয়ালা ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে শ্বদন্ত। লকলকে জিবে জড়ানো এক বাচ্চা মেয়ে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বাচ্চাটা শাম্ভবী নিজে।

লাইব্রেরি রুমে তারকনাথের সঙ্গে অচিন্ত্য আর জয়ন্তও বসে ছিল। তাদেরকে এড়ানো সম্ভব হল না।

ছবি দেখে অচিন্ত্য খিঁচিয়ে উঠল, 'আমি বলছি ওটাই দেবী দিক্করবাসিনী। এখুনি ওই ছবিটা পোড়া বলছি।'

জয়ন্ত আর তারকনাথ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

তারকনাথ মৃদু ধমক দিলেন, 'আহ্ টুকলু। কী হচ্ছেটা কী? ওটা দেবী দিক্করবাসিনী কি না পরে দেখা যাবে। তুই এরকম নাচানাচি করছিস কেন?'

'তোমরা কেউ বিশ্বাস করলে না। আমি সেইদিনই বলেছিলাম পুজো দিতে। দু-দিন আগে নাম লিখল। তারপর শ্মশানে ধ্যান করল। এখন আবার ছবিআঁকছে।' অচিন্ত্য লাফালাফি শুরু করল।

এবার তারকনাথ কড়া গলায় বললেন, 'আঁকুক। এই ছবি আঁকার ব্যাপারটা তুই সাতখানা করে তোর মা-বাবার কানে তুলবি না একদম। সোলাঙ্কীরা দু-দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। এখন ওদের বাবা-মা কলকাতায় নেই। আমি চাই না এই বাড়িতে ওদের কোনওরকম অসুবিধা হোক।'

অচিন্ত্য রাগ করে দুমদুম করে পা ফেলে চলে গেল।

জয়ন্ত একটু ম্লান স্বরে বলল, 'সেইদিন শামুর সামনেই ওইসব ভূতুড়ে গল্প করা আমার উচিত হয়নি।'

'আরে, তুমি কি পাগল হলে নাকি নাতজামাই! গল্প বলেছ তো কী হয়েছে? স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে বোধহয়।' তারকনাথ কেমন যেন যান্ত্রিক সুরে কথা ক-টা বললেন। কৃষ্ণার থেকে ছবি-আঁকা কাগজটা চেয়ে নিয়ে তারকনাথ উঠতে উঠতে বললেন, 'তোরা গল্প কর্। আর সোলাঙ্কী, অচিন্ত্যর কথায় একদম কিছু মনে করো না। আমি যাই। আমার শরীরটা ঠিক ভালো লাগছে না।'

তারকনাথ চলে যেতে জয়ন্ত একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'হুম। অচিন্ত্য কিন্তু বেশ রেগে গেছে।'

কৃষ্ণা হাতের ভঙ্গি করে বলল, 'বাদ দাও তো। এই জয়ন্তদা, তুমি সেইদিন দিক্করবাসিনীর গল্পটা পুরো বলনি। দিক্করবাসিনীকে কারা যেন জাগ্রত করেছিল। তারপরেই দাদা বাধা দিল, আর গল্পটাও শোনা হল না। এখন শামুও নেই, দাদাও নেই। গল্পটা বলে ফেল তো।'

'অনেক ইতিহাস আছে কিন্তু, শুনতে কি ভালো লাগবে?' জয়ন্ত চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি বল।' সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা সমস্বরে বলে উঠল।

'আচ্ছা বলছি, শোন।'

'আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে, রাজা রত্নধ্বজপালের আমলে সুতিয়া গোষ্ঠী কামরূপ এলাকায় সব থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সুতিয়া গোষ্ঠীর আরাধ্যা ছিলেন দেবী দিক্করবাসিনী। দেবীর পুজো করতেন দেওরীরা। আমাদের যেমন পুরোহিত পুজো করে, ওদের তেমনি দেওরী। এই দেওরীরা কিন্তু জাতে ব্রাহ্মণ ছিল না। সাধারণ মানুষ এই দেওরীদেরকে এতটাই ভয় করত যে, পুজোর সময়ে সুতিয়া গোষ্ঠীর রাজারাও নাকি দেওরীদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সামনে যেতেন না। দেবীর আশীর্বাদে রাজা রত্নধ্বজপাল অন্যান্য অনেক রাজাকে পরাস্ত করে সুতিয়াদের রাজত্ব ব্রহ্মপুত্রের পাড় ধরে পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

রাজা রত্নধ্বজপালের এক রানি ছিলেন মহান তান্ত্রিক। বলা হয়, ওই রানিই নাকি স্বয়ং ছিলেন যোগিনীতন্ত্রর উদ্ভাবিকা। সুতিয়া রাজা রত্নধ্বজপালের আমলেই তন্ত্রের এই বিশেষ শাখাটি বিস্তার লাভ করে অসমে।

সেই সময় গৌড়ের রাজার সঙ্গে রত্নধ্বজপালের সন্ধি হয়েছিল। এই গৌড় বাংলাও তো বহু যুগ ধরেই তন্ত্রের এক বিশেষ ক্ষেত্র। দুই রাজা নিজেদের মধ্যে তন্ত্রের উপাচার হিসাবে পবিত্র জল আদান-প্রদান করতেন। গৌড়রাজ পাঠাতেন গঙ্গার জল। সুতিয়া রাজা পাঠাতেন অসমের একদম উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল। তা রাজা রত্নধ্বজপাল ওই তান্ত্রিক রানির এক পুত্রকে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন গৌড়ে। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় পুত্রটি মারা যায়।

গৌড়রাজ সুতিয়াদের অন্তিম সংস্কারপদ্ধতি জানতেন না। তাই তিনি রাজপুত্রের মৃতদেহটি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেন সুতিয়াদের রাজধানীতে। কিন্তু রাজা রত্নধ্বজপাল সেখানে তখন ছিলেন না। শেষকালে ব্রহ্মপুত্র নদের শাখানদী দিকরঙ্গের ধারে এক জায়গায় রাজাকে তাঁর পুত্রের মৃতদেহ হস্তান্তরিত করা হয়।

স্থানীয় ভাষায় শ কথার অর্থ মৃতদেহ এবং দিয়া কথার অর্থ প্রাপ্তি। এরপর থেকে ওই জায়গাটা শদিয়া নামে পরিচিত হয়। এই শদিয়াতেই ছিল দেবী দিক্করবাসিনীর থান।

এই অবধি ইতিহাস। এর পরেরটা লোককথা।

সেই শদিয়াতে রানি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পুত্রশোকে রানি পাগল হয়ে তাঁর চির-আরাধ্য দেবী দিক্করবাসিনীকে আহ্বান করেন। এক অদ্ভুত ভয়ানক ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে নাকি সেই অপরিসীম শক্তিশালী যোগিনী-রানি দেবী দিক্করবাসিনীকে বাধ্য করেছিলেন আবির্ভূত হতে।' জয়ন্ত একটু থামল।

‘একেবারে দেবীকে বাধ্য করল!’ কৃষ্ণা বলে উঠল।

‘হ্যাঁ। একেবারে বাধ্য করল।’ জয়ন্ত বলল।

‘রানির আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী দিক্করবাসিনীপুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে এই দেবীর পুত্র নিজেই হয়ে ওঠেন এক মহান তান্ত্রিক।’

একটু থেমে, জয়ন্ত নিচু গাঢ় গলায় বলল, ‘রানির সেই পুত্র নাকি আর মানুষ ছিল না। তার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। তার রক্তেই খুলে যেত পরলোকের দ্বার। সে পৃথিবীতে ডেকে আনত রৌম্যদের।’

‘রৌম্য? মানে ওই পৌরাণিক আমলে দেবী দিক্করবাসিনীর যে চেলারা পৃথিবীতে উঠে এসেছিল?’ সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করে।

‘হ্যাঁ। সেই রৌম্য। ওরা দেবতা না পিশাচ, সেটা কেউ জানে না। তবে এটা গল্পকথাই।’ জয়ন্ত বলল।

কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কী চুপ করে রইল। ইতিহাসের সঙ্গে উপকথা কেন মিশে যায়? এই প্রশ্নটাই দুজনের মাথাতে ঘুরছিল।

উনিশ

অচিন্ত্য একদম চায়নি তিনটে মেয়েকে নিয়ে আবারও বেরতে। আগেরবার যা কাণ্ড হল। কিন্তু এবারেও জয়ন্তদাকে পাওয়া সম্ভব নয়। সে আবার কলকাতা গেছে। অচিন্ত্যর ইচ্ছা ছিল জয়ন্তদা ফিরলে তাকে নিয়ে তারাপীঠ ঘুরতে যাওয়ার। শাম্ভবীটা এমন বায়না ধরল দাদুর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাটাও নেচে উঠল। দু-দিন ঘরে বসে থাকতে গেলেই গায়ে জ্বর আসে যেন সবার। অবশ্য তারা বেশ সকাল সকাল বেরিয়েছে। সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসবে।

আজও সোলাঙ্কীদের ড্রাইভার বিশুকাকুই যাচ্ছে। তাতেই অচিন্ত্যর যা একটু স্বস্তি। সোলাঙ্কীদের এই ড্রাইভারটা বেশ ভালো। সোনাঝুরিতে এত সাহায্য করল। বেশ ভরসাযোগ্যও বটে।

কৃষ্ণা ভেবেই পাচ্ছিল না, যে দাদু দু-দিন আগে তাদের বাইরে যাওয়া নিয়ে এত রাগারাগি করছিল, সেই দাদুই শাম্ভবীর কথায় হঠাৎ রাজি হয়ে গেল কেন? অবশ্য ভালোই হয়েছে। কাঁহাতক বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা যায়।

গাড়ির মধ্যে জোর তর্ক চলছিল শাম্ভবীর নামে পুজো দেওয়া নিয়ে।

অচিন্ত্য সামনের সিটের পিছনে একটা ঘুষি বসিয়ে বলল, 'দেখ্। কী হয়েছে, কী হয়নি আর কী হতে পারে, আমি কিচ্ছু শুনব না। ওর নামে একটা রিষ্টিপুজো অবশ্যই দেওয়া উচিত। তোরা কিচ্ছু মানিস না। কিন্তু আমি বলছি, এইসব অপদেবতা ইত্যাদি আছে।'

বিশু একবার পাশের সিটে বসা শাম্ভবীকে দেখে নিল। আগের দিন নদীর ধারে শাম্ভবীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে আরেক কেলেঙ্কারি। শাম্ভবী তার পায়ে ইট মেরে কোথায় ছুটে গেল। একটু পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে সে দেখে, মেয়েটা তৌফিকের সঙ্গে কথা বলছে।

বিশু অচিন্ত্যর সমর্থনে ঘাড় নাড়ল, 'একদম ঠিক বলেছেন দাদা। আছে মানে...'

'গিজগিজ করছে চারধারে। ঘাড় মটকে রক্ত খাবে বলে।' কৃষ্ণা বিশুর কথার মাঝখানেই টিটকিরি কাটল।

বিশু একটু বিমর্ষ মুখে বলল, 'দেখুন দিদিমণি। আপনারা বাচ্চা মানুষ। কত কিছু আছে পৃথিবীতে, সব কি জানেন! একটা পুজো দিতে আপনাদের বড়জোর পাঁচশো-হাজার টাকা খসবে। এতে ক্ষতি তো কিছু নেই?'

অচিন্ত্য নিজের সমর্থনে লোক পেয়ে লাফিয়ে উঠল। কৃষ্ণা চুপ করে গেল। সে বলতেই পারত, আমাদের ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই টাকাটাই অনেক লোক দিতে পারে না। অথচ এই সমস্ত কুসংস্কারের নামে তাদের কাছ থেকে জোর করে ওই টাকাটা জোগাড় করা হয়। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে সাতসকালে তার আর ঝগড়া করতে ভালো লাগছিল না।

আজকে বাইরের আকাশ একদম ঝকঝকে নীল। যেমন রোদ উঠেছে, তেমনি হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। পিছনের সিটে জানলার ধারে বসা সোলাঙ্কী চুপ করেই ছিল। হাওয়ার ঝাপটায় এলোমেলো চুল সামলাতে সে একটা ফুল ফুল বুটিদার স্কার্ফ মাথায় বেঁধেছে। জিপসিদের মতো করে। সে গুনগুন করে একটা গান গাইছিল।

গাড়ি হাইওয়েতে ওঠার একটু পরেই রাস্তার ধারে একটা বিশাল ঝিল। সেটা পার হবার মুখে শাম্ভবী চেঁচিয়ে উঠল, ‘ওই দেখ লালকমল! বিশুদা গাড়ি থামাও। এখুনি!’

শাম্ভবীর তাড়াতে বিশু গাড়িটা থামিয়ে পিছিয়ে আনল। তৌফিক বাইক নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, একজনের সঙ্গে কথা বলছে।

‘লালকমল!’ গাড়ি থামতেই শাম্ভবী চিৎকার করে ডাকল। তৌফিক ফিরে তাকাল। গাড়িতে অচিন্ত্যদের দেখে বেশ অবাকও হল।

‘তোরা! এত সকালে?’

‘আমরা তারাপীঠ যাচ্ছি।’ গাড়ির জানলা থেকে অচিন্ত্য মুখ বাড়াল।

‘বাহ্, খুব ভালো কথা। যা ঘুরে আয় তবে।’ তৌফিক নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল। তৌফিকের কথার মাঝখানেই শাম্ভবী সামনের দরজা খুলে নেমে এল গাড়ি থেকে। তাকে নামতে দেখে অচিন্ত্যও নেমে এল।

‘তুমি এখানে?’ অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করল। সে বলতে যাচ্ছিল, তোমার তো কালকেই চলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কথাটা তৌফিক কীভাবে নেবে, অচিন্ত্য বুঝতে পারল না।

‘ডাক্তারের কাছে এসেছিলাম। বাড়ি যাব এইবার।’ তৌফিক জানাল। অন্যজনের দিকে ফিরে বলল, ‘মণিদিকে তাহলে বলিস বাড়ি থাকতে। আমি সাতটা নাগাদ আসব। তখন পাওয়া যাবে তো?’

‘হ্যাঁ, দিদি তো বিকেলেই চলে আসে।’ অন্য ছেলেটা রাস্তার ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেল।

কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কীও নেমে এসেছে গাড়ি থেকে।

‘কী হয়েছে তৌফিকদা?’ অচিন্ত্য আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল।

‘সিরিন পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে।’ তৌফিক কথাটা বলল শাম্ভবীর দিকে তাকিয়ে।

‘সিরিন মানে, তোমার ভাইঝি? সে তো খুব বাচ্চা। হামাগুড়ি দেয়, পড়ে গেল কী করে?’ কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

‘বছরখানেক আগে হামাগুড়ি দিত। এখন খুব দুরন্ত হয়ে গেছে। খেলতে খেলতে কখন চৌকাঠে পা আটকে পড়ে গেছে।’ তৌফিক বলল।

‘আহা রে!’ ‘কবে ঘটেছে?’ ‘এখন কেমন আছে সিরিন?’ একগাদা প্রশ্ন ছুটে এল তৌফিকের দিকে।

‘কালকেই সন্ধ্যাবেলা, আমি বেরনোর আগেই ঘটেছে। এই তো মণিদির দাদা তো বলল ভয়ের কিছু নেই, সবকিছু নর্মাল। ব্রেইন স্ক্যান আর কয়েকটা টেস্ট করাতে দিয়েছিল।’ তৌফিকের মনটা ভালো লাগছিল না। সিরিনকে সে বড্ড ভালোবাসে। ডাক্তার অবশ্য কালকেই বলেছিল ভয়ের কিছুই নেই, তবু সে চলে যেতে পারেনি। আজকে টেস্ট রিপোর্ট দেখিয়ে তবে শান্তি। আবারও তাকে টিকিট কাটতে হবে।

শাম্ভবী হঠাৎ বলে উঠল, ‘লালকমল আমাদের সঙ্গে তারাপীঠ যাবে।’

‘না না! সে কী? আমি কেন যাব?’ তৌফিক অবাক হয়ে আপত্তি জানায়।

'সিরিন ভালো হয়ে যাবে। তুমি চিন্তা করো না।' শাম্ভবী তৌফিকের হাত জড়িয়ে ধরল। কৃষ্ণার মনে হল, তৌফিকের সঙ্গে শাম্ভবীর যেন চোখে চোখে কী কথা হল।

এবার কৃষ্ণা অনুরোধ করল, 'চল চল।'

তৌফিক নিরুপায় হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে বাইকটা রেখে এল মণিদির বাড়িতে।

গাড়ি আবার ছুটল একশো চোদ্দো নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে। সামনের সিটে বসে ছিল শাম্ভবী আর তৌফিক। পিছনের সিটে বাকিরা। তৌফিক গাড়িতে উঠে থেকে কোনও কথা বলেনি, সে সামান্য গম্ভীর অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছিল।

কৃষ্ণা একবার অচিন্ত্যকে খোঁচা দিল। অচিন্ত্য মুখ বেজার করে বসে ছিল। তৌফিককে ডেকে গাড়িতে ওঠানোয় তার একদম পোষায়নি। কৃষ্ণার সামান্য কোনও বাস্তবজ্ঞান নেই। এই যদি বাড়িতে জানতে পারে তাহলে বাবার হাতে অচিন্ত্যর ধোলাই আছে।

খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার পরে কৃষ্ণা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি দিল্লিতে চাকরি পেয়েছ?'

'হুম।'

'মণিদিরা বেশ ইয়ে, বল। ভাইবোন দুজনেই ডাক্তার।' কৃষ্ণা আবহাওয়াটা স্বাভাবিক করতে চাইছিল।

'হ্যাঁ।' তৌফিক আবার ছোট্ট উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল।

এবার শাম্ভবী দাবি পেশ করল, 'তুমি গল্প জান? গল্প বল না।'

'ও আচ্ছা, এই জন্যে তৌফিকদাকে টেনে আনা। গল্প শোনার মতলব।' সোলাঙ্কী বলে উঠল।

সোলাঙ্কীর কথায় তৌফিক ফ্যাকাশেভাবে হাসল। তৌফিকের হাসি দেখে কৃষ্ণা একটু সাহস পেল।

'তা গল্প আর খারাপ কী। তৌফিকদা, বল না।'

'গুগ্‌ল সার্চ করলেই তারাপীঠের গুচ্ছ গল্প পেয়ে যাবি।' তৌফিক জানাল।

'তাহলে এমন কিছু বল, যেটা গুগ্‌লে নেই।' শাম্ভবীর কথার সুরে এবার তৌফিক ছাড়া সবাই হেসে উঠল।

'বল না, লালকমল। একটা গল্প বল।' শাম্ভবী আবার অনুরোধ করল।

উফ, মেয়েটা কেন তাকে লালকমল বলে ডাকছে! তৌফিকের মনে হচ্ছিল, এই মেয়েটা যেন আগে থেকেই জানত, সে এখানে আসবে। নাকি, মেয়েটাই তাকে ডেকে পাঠিয়েছে? এখন আবার তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারাপীঠে। সাপ যেভাবে ব্যাঙকে গিলে খায়, ঠিক সেইভাবেই মেয়েটা যেন তৌফিককে একটু একটু করে গিলে খাচ্ছে।

তৌফিক একবার মাথা ঝাঁকি দিল। কী সব ভুলভাল চিন্তা করছে সে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল, সবাই কেমন একটা মুখ করে তাকে দেখছে। নাহ্, এদেরকে একটা গল্পই শোনানো যাক। অস্বস্তিটা কমবে।

তৌফিক হাসল। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা গল্প শোনাই তাহলে। তারাপীঠ বিখ্যাত কেন জানিস তো?'

‘শক্তিপীঠ। সতীর নয়নতারা পড়েছিল।’ কৃষ্ণা জানাল।

‘কারেক্ট। কিন্তু তোরা কি জানিস, ইয়ে মানে... হিন্দু মতে যে পঞ্চাশ বা একান্নখানা পীঠের নাম আছে, তার মধ্যে তারাপীঠ নেই।’

‘যাঃ!’ কৃষ্ণা প্রতিবাদ জানাল।

‘হ্যাঁ। তোরা নেটে দেখতে পারিস শক্তিপীঠের লিস্ট। আমি যত দূর জানি, এটা অনেক পরে ফেমাস হয়, তাই যখন আগে শক্তিপীঠের লিস্ট তৈরি হয়, তার মধ্যে এটার নাম ছিল না। যা-ই হোক, তবু এটা পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে জনপ্রিয় পীঠ দুটোর মধ্যে একটা। অন্যটা হল কালীঘাট। তারাপীঠের এই হেভি ফেমাস হওয়ার কারণ হল বামাখেপা। তোরা বামাখেপার নাম জানিস?’ তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি তো। মানে শুধু নামটাই জানি।’ কৃষ্ণা জানাল।

‘বামাখেপা হলেন রামকৃষ্ণদেবের সমসময়িক আরেকজন মহাতান্ত্রিক। রামকৃষ্ণদেবকে যেমন কালী মায়ের সন্তান বলা হয়, তেমন বামাখেপাকে বলা হয় তারা মায়ের সন্তান। উনি তারাপীঠের শ্মশানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই সময় থেকেই তারাপীঠের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তা এই বামাখেপার জন্ম নিয়ে গল্প আছে। তোদের কারও কাছে ফোনে নেট কানেকশন আছে?’ তৌফিকের হঠাৎ-প্রশ্নে সবাই হকচকিয়ে গেল।

‘নেট কানেকশন? কেন? কী হবে?’ সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠল।

‘আরে, আছে কি না বল্।’ তৌফিক বলল।

‘হ্যাঁ, আমার ফোনেই আছে।’ সোলাঙ্কী বলল। ‘এই শামু, ফোনটা দে।’

শাম্ভবী ফোন ফেরত দিতে তৌফিক বলল, ‘গুগ্‌ল ম্যাপ খুলে বস্। আমি গল্পটা বলার পরে মিলিয়ে দেখবি।’

তৌফিক শুরু করল, ‘তন্ত্রমতে ত্রিভুজ হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বেশির ভাগ তন্ত্রমতে পুজোয় দেখবি একটা বা দুটো ত্রিভুজ বানিয়ে তার মাঝখানে ঘট স্থাপন করা হয়। ত্রিভুজের মধ্যের যে কোনও ক্ষেত্রকেই বলা হয় পুণ্যক্ষেত্র। আমরা যে সাধারণ ত্রিভুজ আঁকি খাতায়, সেটাকে তন্ত্রমতে পুরুষ বা শিব বলা হয়। মানে যে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু উপরের দিকে থাকে।

উলটো ত্রিভুজ, যার ভূমি উপরদিকে থাকে, তাকে বলা হয় নারী বা শক্তি। তো তন্ত্রমতে বলা হয় যে, ত্রিভুজের নাভি, মানে ভরকেন্দ্রে যে জন্ম নেবে, সে-ই হবে মহান সাধক। পুরুষ-ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সাধারণ ভরকেন্দ্রকেই নাভি বলা হয়। কিন্তু নারী-ত্রিভুজের ক্ষেত্রে শীর্ষ থেকে ভূমিতে যে মধ্যমা আসে, সেইটাকে তিন ভাগ করে শীর্ষের দিকের বিন্দুটাকে ভরকেন্দ্র বলা হয়। যেহেতু নারীর ক্ষেত্রে ত্রিভুজটা উলটো তাই নাভিকেও নিচের দিকে ধরা হয়, অর্থাৎ যে কোনও শীর্ষের দিকে।

এবার গুগ্‌ল ম্যাপ খোল্। তিনটে বিখ্যাত শক্তিপীঠ নলহাটি, বক্রেশ্বর আর অট্টহাস পয়েন্ট কর্। এই তিনটে পয়েন্ট দিয়ে একটা ত্রিভুজ বানা।'

পিছনের সিটে হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। 'আমায় দে, আমি করছি', 'তুই কিচ্ছু জানিস না', 'দাদা না গাধা তুই, মেজার ডিস্ট্যান্স কর্।'

একটু পরে অচিন্ত্য হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'হ্যাঁ, ত্রিভুজ হয়েছে, কিন্তু এর ভরকেন্দ্রে তো তারাপীঠ নেই। ওই ময়ূরাক্ষীর আশপাশে আসছে, সাঁইথিয়ার কাছেই।'

'হুঁ। নলহাটিকে শীর্ষবিন্দু আর বক্রেশ্বর-অট্টহাসের লাইনটাকে ভূমি ভাব্। নলহাটি থেকে ভূমির উপরে একটা মধ্যমা টান্। সেটাকে তিন ভাগে ভাগ কর্, সাধারণ ভরকেন্দ্রটা সাইঁথিয়ার কাছে তো? দেবী তারা হলেন নারী। নারীর ক্ষেত্রে ত্রিভুজটা উলটো। এ ক্ষেত্রে বক্রেশ্বর আর অট্টহাসের লাইনটা হচ্ছে মাথা। এই ত্রিভুজের নাভি হবে নলহাটির দিকে। এবার দেখ্।'

কৃষ্ণা ততক্ষণে অচিন্ত্যর থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়েছে, কিছুক্ষণ খুটুরখাটুর করার পরে সে বলল, 'হ্যাঁ, অলমোস্ট তারাপীঠের কাছে।'
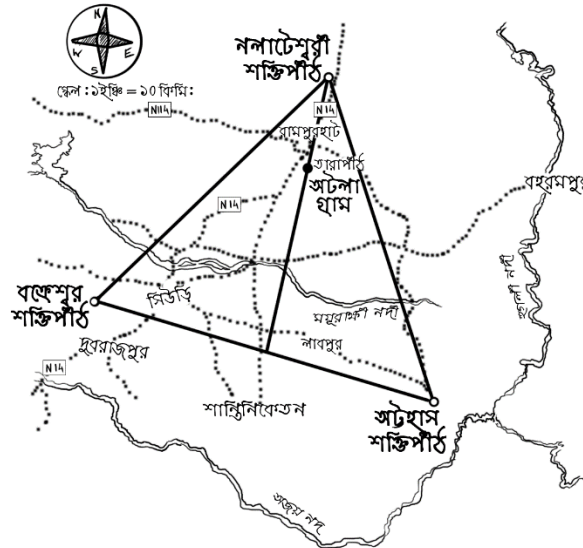
'দেখ্ ওই বিন্দুটা আসলে তারাপীঠের পাশেই অটলা বলে একটা গ্রামের কাছে। এই গ্রামেই জন্মেছিলেন বামাখেপা। লোককথা, এই ত্রিভুজের নাভিতেই বামাখেপার জন্মভিটে। এমনকী এ-ও বলা হয় যে, আসলে নাকি এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ। তবে গুগ্‌লের হিসাবে সমবাহু পাবি না, কয়েক কিলোমিটার এদিক-ওদিক আছে। তবে এটা ঠিক যে, তিনটে শক্তিপীঠ দিয়ে তৈরি এরকম প্রায়-সমবাহু ত্রিভুজ, আবার তার নাভিতে আরেকটা বিশেষ জায়গা, এরকম আর পাবি না।'

‘রিয়েলি অসাধারণ ব্যাপার। কী করে হল এটা?’ কৃষ্ণা লাফিয়ে উঠল।

তৌফিক হাসতে হাসতে বলল, ‘আমি কি জানি!’

সামনের সিট থেকে শাম্ভবীও লাফিয়ে উঠল, ‘আমি দেখব, আমি দেখব। ফোন দাও এখুনি।’

‘না, আগে আমি।’ অচিন্ত্য শাম্ভবীকে গাঁট্টা দিল একটা।

বিশুদা গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, ‘আমিও লাইনে আছি কিন্তু, আমিও দেখব।’

***

সাঁইথিয়াতে থামা হল। সকালবেলা শুধু চা খেয়ে বেরিয়েছে ওরা। সবারই খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। তাই ঠিক হল, নন্দিকেশ্বরীতে গাড়ি থামিয়ে ব্রেকফাস্ট আর মন্দিরদর্শন দুইই হবে। মন্দির দেখে কৃষ্ণা শুধু যে ডালা কিনে পুজো চড়াল তা-ই না, সে সবার কপালে সিঁদুরের তিলকও লাগাল। তৌফিককেও ছাড়ল না। নাস্তিক কৃষ্ণার ভক্তি দেখে সবাই বেশ হাসাহাসি করছিল। মন্দির-দেখা শেষ হতে একটা মিষ্টির দোকানে বসে সবাই কচুরি-তরকারি খাচ্ছিল।

কৃষ্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ‘তৌফিকদা, তুমি ক্যারাটে শিখতে না?’

‘শিখতাম তো।’

‘তুমি কত অবধি করেছিলে?’

‘সান-ডান। তবে আমি ইজিলি ইয়ো-ডান কমপিট করতে পারতাম। শুধু বয়সে আটকে গিয়েছিলাম। আমি তো বেশ কয়েকবার ক্লাব থেকে আন্ডারএজ ন্যাশনালেও গিয়েছিলাম।’ তৌফিক জবাব দিল।

‘ব্ল্যাকবেল্ট?’ সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

‘ব্ল্যাকবেল্ট সবগুলোই। ফার্স্ট জুনিয়র লেভেল ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছিলাম ক্লাস ফাইভে। যাকে আমরা সোডান বলি। আসল লেস্‌ন তো শুরুই হয় ফার্স্ট ব্ল্যাকবেল্টের পর থেকে। আমি আন্ডারএজেই সিনিয়র সান-ডান, মানে তোর থার্ড ব্ল্যাকবেল্ট কমপ্লিট করেছিলাম। কিন্তু তখন আন্ডার এইট্টিন ছিলাম, তাই সার্টিফিকেট দেয়নি। পরে রিটেস্ট দিয়ে পাই। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী একুশ বছরের আগে দেয় না তো।’

‘ছাড়লে কেন?’

‘আইএসআই টাফ জায়গা। প্রচুর পড়াশোনা। তবে পুরো ছাড়িনি তো। প্র্যাকটিস করতাম। শুধু কোনও কমপিটিশনে যেতাম না।’

‘তুমি এত ভালো ক্যারাটে জান। তা-ও ওরা তোমাকে তুলে নিয়ে গেল কী করে তৌফিকদা?’ কৃষ্ণার প্রশ্নে সবার খাওয়া থেমে গেল। কৃষ্ণা নিজেকে সামলাতে পারেনি। যতবার সে তৌফিকের গালে কাটা দাগটা দেখছে, ততবার একটা রাগ তার মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

তৌফিক কৃষ্ণার প্রশ্নে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর বলল, ‘আমি এক্সপেক্ট করিনি অমন কিছু ঘটবে। সন্ধেবেলা বর্ধমান প্ল্যাটফর্মে এক কাপ চা খেয়েছিলাম শুধু।’

‘ঘুমের ওষুধ?’ সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল। তৌফিকের অস্বস্তি লাগছিল। সে কিছু বলল না, ইতিবাচক ঘাড় নাড়ল।

‘তুমি পালাতে পারলে না?’ কৃষ্ণা আবারও জিজ্ঞেস করল।

স্টার অব ডেভিড

এবার তৌফিক হেসে উঠল, ‘পারলাম না তো। কী আর করা যাবে। সেকেন্ড বার তোর কথা মনে রেখে অবশ্যই চেষ্টা করব।’

‘আচ্ছা, ওসব কথা থাক গে। ওরকম জ্যামিতি আর তন্ত্রের আর কিছু নেই তৌফিকদা, গাড়িতে যেমন দেখালে?’ অচিন্ত্য অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্যে বলে উঠল। তৌফিকও প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইছিল, সে অচিন্ত্যর কথাটা লুফে নিল।

‘হ্যাঁ, আছে তো। তবে সেটা আরও একটু জটিল।’

‘বল বল।’ সবাই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

‘ওয়েল। তোরা স্টার অব ডেভিড জানিস?’ তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

সোলাঙ্কী স্কুলে পড়া বলার মতো হাত তুলল, ‘ইয়েস, আমি জানি। স্টার অব ডেভিড হল জিউসদের চিহ্ন। একটা হেক্সাগ্রাম। দুটো বিপরীত ত্রিভুজ পরস্পরের উপরে অবস্থিত।’ সোলাঙ্কী বলতে বলতে টেবিলের উপরে পড়ে-থাকা জল দিয়ে দুটো ত্রিভুজের একটা ছয়কোনা তারকা আঁকল।

‘স্টার অব ডেভিড তন্ত্রেও আছে। যদি স্টার অব ডেভিডকে তন্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা করি তাহলে কী দাঁড়াবে বল্ তো?’ তৌফিক বলল।

‘দুটো ত্রিভুজ। একটা সোজা। একটা উলটো। একটা শক্তি। একটা শিব। পরস্পরের উপরে অবস্থিত। মানে একটা নারী আর একটা পুরুষ... ’ কৃষ্ণা কথাটা শেষ করতে পারল না। সে লাল হয়ে উঠল। অচিন্ত্য মুখ ঘুরিয়ে দোকানের বাইরে কাক দেখতে শুরু করল। সবাই দিব্যি বুঝতে পারছিল, কৃষ্ণা কী বলতে চাইছে।

শুধু শাম্ভবী গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল, ‘মানে?’

‘তোকে জানতে হবে না।’ সোলাঙ্কী বকা লাগাল। সে-ও লজ্জা পেয়েছে।

‘না না। জানতে হবে না কেন? পুরুষের উপরে নারী, যেমন শিবের উপরে কালী। বুঝেছিস?’ তৌফিকের ব্যাখ্যায় শাম্ভবী ঘটঘট করে মাথা নাড়ল। সোলাঙ্কী মুখ টিপে হাসল। তৌফিকদার উদাহরণে দিব্যি অ্যাডাল্ট পার্টটুকু মুছে গেল!

‘এই মাঝখানের ষড়ভুজ অঞ্চলটাকে বলা হয় গর্ভক্ষেত্র। খুব কম জায়গাতেই আছে। এবার আবার গুগ্‌ল ম্যাপ খোল্। দেখ্, রাঢ় অঞ্চলের ছয়টা শক্তিপীঠের নাম দিচ্ছি। পয়েন্ট কর্। নলাটেশ্বরী, কিরীটেশ্বরী, বাহুলা, উজানি, কঙ্কালীতলা, নন্দিকেশ্বরী।’ তৌফিকের কথামতো অচিন্ত্য পয়েন্ট করল জায়গাগুলোকে।
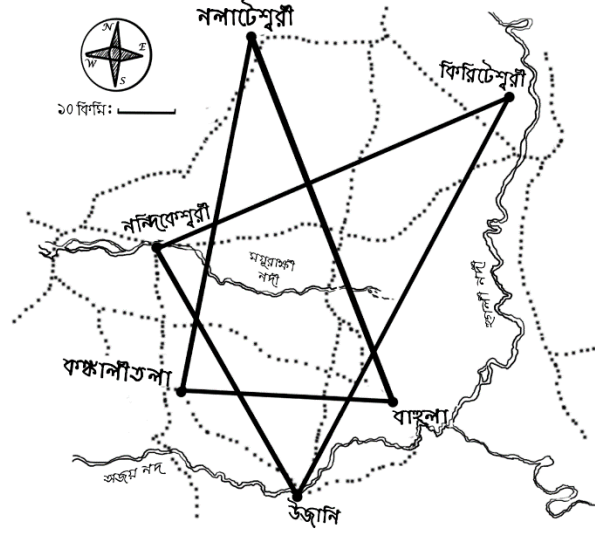
'এবার একটা সাদা একটু পাতলা কাগজ লাগবে।' তৌফিক বলল।

সোলাঙ্কীর ব্যাগে সবকিছুই প্রায় মজুত থাকে। সে একটা খাতা থেকে পাতলা কাগজ বের করে দিল। তৌফিক ফোনের স্ক্রিনের উপরে কাগজটা রেখে পয়েন্টগুলো তুলে নিল। তারপরে সোলাঙ্কীর থেকে পেন নিয়ে তিনটে তিনটে পয়েন্ট দিয়ে দুটো ত্রিভুজ বানাল। একটা নলাটেশ্বরী, বাহুলা ও কঙ্কালীতলা পয়েন্টগুলো যোগ করে। অন্যটা নন্দিকেশ্বরী, কিরীটেশ্বরী আর উজানি। সবাই টেবিলের উপরে হুমড়ি খেয়ে দেখল, একটা বাঁকাটেড়া স্টার অব ডেভিড তৈরি হয়েছে।

'ইজ ইট ম্যাজিক?' সোলাঙ্কী বলল।

তৌফিক হাসতে হাসতে বলল, 'এভরিথিং ইজ ম্যাথমেটিক্স।'

কুড়ি

সাঁইথিয়া থেকে বেরিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অটলা গ্রামটা দেখে তাদের গাড়ি তারাপীঠ পৌঁছে গেল। গাড়ি রাখা হয়েছে অনেকটা দূরে। মন্দিরের আশপাশের রাস্তা খুবই সরু, গাড়ি ঢুকবে না। পুজোর ডালা, জবার মালা, বাতাসা, নকুলদানা, সিঁদুর, আরও হাজারো উপকরণ সাজিয়ে পরপর কয়েকশো দোকানদারের হাঁকাহাঁকি, ঘিঞ্জি গলি নোংরা, দালালদের চেঁচামেচি, লাল-কমলা-গেরুয়া কাপড় পরা জটাধারী সাধুসন্ন্যাসীর ধাক্কা আর ভিখিরিদের প্রায় গায়ে উঠে-পড়া এড়িয়ে সবাই যখন মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এল, তখন প্রায় একটা বাজে।

মন্দিরের মাঝখানে একটা বসবার আটচালা। তৌফিক গিয়ে আটচালার এক ধারে বসল। তার আর ভালো লাগছে না। বেশ কিছু গেরুয়াধারী আটচালার নিচে আস্তানা গেড়েছে। অনেক দর্শনপ্রার্থীর ভিড় মন্দিরের মধ্যে।

সোলাঙ্কী হঠাৎ বলে উঠল, ‘আচ্ছা, তুমি এত ভালো তন্ত্রের গল্প জানলে কী করে? মানে তুমি তো... আসলে...’

‘মানে মুসলিম হয়েও এত ভালো পুরাণ বা তন্ত্রের গল্প জানলাম কী করে? তা-ই তো?’ তৌফিক বলল।

সোলাঙ্কী লজ্জা পেল। সে ধর্ম তুলে কথা বলতে চায়নি।

‘গল্পের তো আর জাত-ধর্ম হয় না। তবে তোমার কথার উত্তর হল, প্রথমত ওই গল্পটার সঙ্গে অঙ্ক জড়িয়ে আছে অনেকটা। দ্বিতীয়ত একদা আমার এক বন্ধু ছিল, যার এইসব বিষয়ে কৌতূহল ছিল। তাই সঙ্গসূত্রে কিছু তন্ত্রের গল্প আমারও জানা।’ তৌফিক বলল।

‘সেই প্রডিজি? চন্দ্রমৌলি!’ সোলাঙ্কী বলে উঠল। তৌফিক একবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে অচিন্ত্যর দিকে তাকিয়ে ইতিবাচক হাসি হাসল।

‘চল, চল। পুজোটা দিয়ে নিই।’ অচিন্ত্য তাড়া লাগাল সোলাঙ্কীকে। সোলাঙ্কীর খুব ইচ্ছা না থাকলেও, সে শাম্ভবীকে টেনে নিয়ে গেল। থাক্, একটুখানি পুজোই তো। তাতে যদি কারও মনে শান্তি হ্ হোক না। কৃষ্ণা আর গেল না ওদের সঙ্গে। সে আটচালার নিচে তৌফিকের পাশে গিয়ে বসল।

‘হ্যাঁ রে কৃষ্ণা। এই সোলাঙ্কীর বোনটার কি কোনও গন্ডগোল আছে?’ বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পরে তৌফিক হঠাৎ বলে উঠল।

‘এমন কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? কী হয়েছে?’ কৃষ্ণা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

‘ওদের মা-বাবা কোথায়? তারা আসেনি বেড়াতে?’ তৌফিক জানতে চাইল।

‘সোলাঙ্কীর মা-বাবা দুজনেই বাইরে গেছে।’

‘সোলাঙ্কীর বলছিস কেন? ওরা কি শাম্ভবীর মা-বাবা নয়?’

‘তুমি যদি কাউকে না জানাও, তাহলে তোমায় বলতে পারি।’ কৃষ্ণা একটু কিন্তু কিন্তু করল।

‘কী ব্যাপার?’

কৃষ্ণাকে বেশি খোঁচাতে হল না। দু-একটা প্রশ্ন করতেই সে গড়গড় করে শাম্ভবী কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে, রটন্তীপুজোর আগুন ধরে-যাওয়া থেকে শুরু করে কঙ্কালীতলার ধ্যানে বসা, দিক্করবাসিনীর নাম লেখা, ছবি আঁকা— সব কথা বলে ফেলল।

'দিক্করবাসিনী? মানে কেচাইখাতি?' শেষ গল্পটা শুনে তৌফিক চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল।

'আরে! তুমি কী করে জানলে?' কৃষ্ণা অবাক হল।

'আমিও একটা গল্প শুনেছিলাম। অনেকদিন আগের কথা। তবে তোকে একটা কথা বলি। ওই সোলাঙ্কীর মা-বাবা ফিরে এলেই তাদেরকে বলিস। তাদের মেয়ে ঠিক সুস্থ-স্বাভাবিক নয়। অবশ্যই যেন ডাক্তার দেখায়।' তৌফিক জানাল।

'এ কথা বলছ কেন?'

তৌফিক একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কৃষ্ণার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। সে তার মোবাইলে খুটখাট করছিল। টিকিট কাটতে হবে, দিল্লি যাওয়ার। কিন্তু তার মনে শাম্ভবীর কথাগুলো খচখচ করেই যাচ্ছিল। সোনাঝুরির ব্যাপারটা যদি স্বপ্নও হয়, তবু অন্য ব্যাপারটা। শাম্ভবীর রিনরিনে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলা-কথাটা যেন বেজে উঠল তৌফিকের কানে, 'শাহাজাদির বিপদ হবে।'

মেয়েটা কী করে বলল, শাহাজাদির বিপদ হবে?

ওই মেয়েটার কাছাকাছি থাকলেই মনে হয়, কে জানে আটকে রেখেছে। যা করতে বলে তা-ই করতে ইচ্ছে হয়। দূরে চলে গেলে হাঁপ ছাড়া যায়, কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। তৌফিকের ভারী অদ্ভুত লাগছিল।

একটু পরে গ্রাম্য মহিলাদের একটা দল এসে আটচালা ভরতি করে ফেলল প্রায়। তারা ভীষণ জোরে জোরে কথা বলছিল, ইচ্ছা না থাকলেও কৃষ্ণার কাছে টুকরো টুকরো কথা ভেসে এল। ভূমিদেবীর আশীর্বাদ! মাঠের মধ্যে বৃত্ত। সেই মাটি ছুঁলেই নাকি সব রোগ-অসুখ সেরে যায়, বাঁজা মেয়ের বাচ্চা হয়, মৃত মানুষ প্রাণ ফিরে পায়! যত্তসব! কৃষ্ণা মনে মনে ভাবল।

তৌফিক হঠাৎ ঘুরে বসল। 'মা, এই জায়গাটা কোথায়?'

এক বয়স্কা মহিলা জানালেন, তারাপীঠ থেকে সাত-আট কিলোমিটার দূরে দ্বারকা নদীর তীরে মাঠের মধ্যে মাসকয়েক আগে একটা বড় লালচে-কালো রঙের বৃত্ত দেখা গেছে। তৌফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানল জায়গাটা ঠিক কোথায়। কিছুক্ষণ সেই বৃত্তস্থিত মাটির মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার কী হয়েছে।

তৌফিক কৃষ্ণাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বোন। অমাবস্যা এলেই খেপে ওঠে। কত জায়গায় ঘুরলাম, কেউ সারাতে পারে না। দেখি, এই মাটিতে কিছু হয় কি না!'

মহিলা জানালেন, মাটি এখন বিক্রি হচ্ছে এক চামচ একশো টাকায়। তৌফিক আঁতকে উঠে সরে এল।

'তুমি আমায় পাগল বানিয়ে দিলে?' কৃষ্ণা অভিযোগ করল। তৌফিক কিছু না বলে মিটিমিটি হাসল।

***

'পুজোটুজো ইত্যাদি বাজে কাজ' মেটাতে মেটাতেই প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। দুপুরের খাওয়ার পরেই অচিন্ত্য বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করতে লাগল। গাড়িতে উঠে তৌফিক বলল, 'একবার পূর্ব কালিকাপুরের দিকে চলুন তো বিশুদা। এই ডানদিকের রাস্তা ধরুন। তারপর বড় রাস্তা ধরে সোজা এই আট-নয় কিলোমিটারের মতো।'

'ওদিকে কী আছে?' অচিন্ত্য জানতে চাইল।

'দেবী উঠেছে মাঠের মধ্যে। এক চামচ মাটি একশো টাকা।' কৃষ্ণা বলল।

'আমরা যেতে যেতে দেখবি, একটা মাটির পুরিয়া একশো টাকা হয়ে গেছে।' তৌফিক বলল।

'ওই রাখালেশ্বরের মতো?' অচিন্ত্য এবার উৎসুক হয়ে উঠল। তৌফিক ঘাড় নাড়ল।

পূর্ব কালিকাপুরের রাস্তা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ধানখেতের মাঝে ছোটমতো একটা নতুন মন্দির দেখা যাচ্ছে। রীতিমতো পাকা দেওয়াল, মাথায় ত্রিশূল গোঁজা। দলে দলে লোক গিয়ে পায়ে হাঁটা পথ তৈরি করেছে খেতের মধ্যে দিয়ে। মাঠের ধারে গাড়ি রেখে সবাই এগোল সেই রাস্তা ধরে।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় একটাও লোক নেই মন্দিরের কাছে। মন্দিরের সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ছোট্ট লাল সিমেন্টে-বাঁধানো চাতাল, পৌঁছে দেখা গেল, ততোধিক ছোট গ্রিল গেটে তালা ঝুলছে। সোলাঙ্কী উঁকি দিল ভিতরে। মেঝেতে প্রণামির থালা, সিঁদুর, ধূপ, প্রদীপ, পোড়া মোমবাতির স্তূপ আর একটা মানুষ পড়ে আছে।

সোলাঙ্কী আঁতকে উঠে বলল, 'কী ব্যাপার, খুন নাকি?'

'ধুস, সোনাঝুরির কথাটা শোনার পর থেকে তোর মাথাটা গেছে।' কৃষ্ণা বলল। 'ঘুমাচ্ছে মনে হচ্ছে।'

তৌফিক মন্দিরের সিঁড়িতে পা দেয়নি। মন্দিরের পাশেই একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাওয়ার ঝাপটা সামলে একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছিল। অচিন্ত্য নেমে এসে দাঁড়াল তৌফিকের পাশে।

তৌফিক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'কিছু বলবি?'

'না না। সেরকম কিছুই নয়। আমরা এখানে এলাম কেন?' অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করল।

'এমনি।' তৌফিক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেটে টান দিল।

কৃষ্ণা নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। 'পূজারিটা হেভি ঠেঁটা। ভিতরে কাউকে ঢুকতেই দেবে না। বাইরে থেকে পুজো দিতে বলছে। আর সত্যি সত্যি মাটির দাম দু'শো টাকা!'

'হুম।' তৌফিক দেখল, সোলাঙ্কী শাম্ভবীকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। শাম্ভবীর মুখটা থমথম করছে, সে যেন এখুনি কেঁদে ফেলবে। গাছের কাছে এসে শাম্ভবী বলল, 'আমরা ভিতরে যাব না?'

তৌফিক বলল, 'ভিতরের যাওয়ার দরকার কী। একটু মাটি কিনে নে না।'

সোলাঙ্কী বলল, 'দেখ, কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। কী হবে ফালতু মাটি কিনে?'

'না, আমি ভিতরে যাব।' শাম্ভবী গাছতলায় বসে পড়ল।
সোলাঙ্কী চড় তুলল, 'সবসময় জেদ ভালো লাগে না শামু।'
'আচ্ছা আচ্ছা। আমরা ঢুকব ভিতরে। মারপিট করার দরকার নেই।' তৌফিক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল।
'কীভাবে ঢুকবে?'
'অ্যাঁ!' তৌফিক একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বলে কৃষ্ণার প্রশ্নটা তার কানে যায়নি।
'বলছি, কীভাবে ঢুকবে? ও বেটা পূজারিটা হেভি ঠেঁটা। কিচ্ছু শুনছে না।' কৃষ্ণা বলল।
'অচিন্ত্য, সকাল থেকে সানগ্লাসটাকে মাদুলি করে রেখেছিস কেন রে?' তৌফিকের হঠাৎ প্রশ্নে অচিন্ত্য হকচকিয়ে গেল।
সে সকালের দিকে একবার সানগ্লাসটা চোখে দিয়েছিল। কিন্তু সোলাঙ্কী এমন মুখ টিপে হাসতে শুরু করল, প্যাঁক খাওয়া অবধি অপেক্ষা না করে আগেই খুলে রেখেছে। অচিন্ত্যর জামার বোতামে আটকানো সানগ্লাসটা তুলে নিল তৌফিক। 'কৃষ্ণা, তোর ব্যাগে কাজল আছে?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।
'কাজল!' কৃষ্ণা অবাক হয়ে গেল। 'কী হবে কাজল?'
'এই একটু মজা হবে আর কী। বেড়াতে বেরিয়েছি। চল্, একটু অ্যাডভেঞ্চার করা যাক।' তৌফিক বলল।
'অ্যাডভেঞ্চার!' সোলাঙ্কী হাঁ করে তৌফিকের দিকে তাকাল। কৃষ্ণা ততক্ষণে ব্যাগ থেকে কাজল বার করে দিয়েছে।
সে বলল, 'লিপস্টিকও লাগবে নাকি?'
তৌফিক অচিন্ত্যর কাঁধে হাত রাখল। ভালো করে অচিন্ত্যকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, 'নাহ্, তার দরকার নেই। অচিন্ত্যকে একটু পুরুষমানুষ বানানো যাক।'
কাজলটা দিয়ে তৌফিক ঘষে ঘষে অচিন্ত্যর একটা গোঁফ বানিয়ে দিল। সোলাঙ্কী মুখ টিপে হাসছে।
শাম্ভবী হাততালি দিয়ে উঠল, 'আরিব্বাস, অচিন্ত্যদাকে কী লাগছে!'
অচিন্ত্য পাকা টম্যাটোর মতো লাল হয়ে গেল।
'চল্ অচিন্ত্য। আমরা হলাম গে তারাপীঠ থানার পুলিশ। মন্দিরটা একটু সরেজমিনে তদন্ত করা যাক।'
'আর আমরা?' কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।
'তোরা নজর রাখ্। ওই পূজারি দরজা খুললে চলে আসিস। তবে আমাদের চিনিস—এটা বুঝতে দিস না।' তৌফিক বলল।
জুতো খুলে দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। তৌফিক গিয়েই গ্রিল গেটটা ধরে সজোরে নাড়াল। পলকা গেট রীতিমতো ঝড়াং ঝড়াং শব্দে নালিশ জানাল। ভিতরের লোকটা ধড়ফড় করে উঠে বসল।
'এই কে রে? মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' লোকটা গেটের কাছে আসতেই তৌফিক হাত বাড়িয়ে খপ করে লোকটার গলার কাছে উড়নিটা মুঠো করে চেপে ধরল।
'গেটটা খোল্। এখুনি।' তৌফিক কড়া গলায় ধমক দিল।

'এই কে? ছাড়্ বলছি।' লোকটা তৌফিকের হাত থেকে জামাটা ছাড়ানোর জন্য টানাটানি শুরু করল।

'পুলিশ। তারাপীঠ থানা।' বলতে বলতে তৌফিক পকেট থেকে কী একটা কাগজ বের করে লোকটার নাকের ডগায় একবার নাচিয়েই পকেটে পুরে রেখে দিল আবার। অচিন্ত্য একশো শতাংশ নিশ্চিত, ওটা তৌফিকদার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা। 'গেটটা খোল্ এখুনি। নয়তো সোজা থানায় তুলে নিয়ে যাব।'

'কেন? পুলিশ কেন?' রোগাপটকা পুরুতটা কেঁউকেঁউ করে উঠল।

'চোপ। গেট খোল্।' একটা প্রচণ্ড ধমকের সঙ্গে তৌফিক লোকটাকে একটু ঝাঁকিয়েও দিল।

'এই তো স্যার, এখুনি খুলে দিচ্ছি।' লোকটা গেঁজে থেকে চাবি বার করে গেটের তালাটা খুলে দিল। তৌফিক আর অচিন্ত্য ভিতরে ঢুকল।

মন্দিরের ভিতরে একটা বৃত্তাকার গর্ত। প্রায় সাড়ে তিন ফুট ব্যাস। নিচু দরজাটা দিয়ে ভালো আলো আসছে না। অচিন্ত্য মোবাইলে টর্চটা জ্বালল। তৌফিক ভালো করে দেখল। এই বৃত্তটাও কয়েক মাসের পুরানো, বৃত্তের চারপাশ জবা ফুল আর সিঁদুরে ছয়লাপ। বৃত্তের পেটের মধ্যে বেশ গভীর একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে, নামার জন্যে গর্তের মধ্যে একপাশে একটা ছোট মইও রাখা আছে। মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে একটা ৺তারা মায়ের পট ঝুলছে। তাতেও সিঁদুর মাখানো। শুকনো জবা ফুলের মালা।

'কতদিন এই মন্দিরের নামে বেআইনি কাজকর্ম চালাচ্ছিস?' তৌফিক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

'না না স্যার। কী বলছেন। বেআইনি কোথায়? অমন কিচ্ছু হয় না এখানে।' লোকটা হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বলল। 'শুধু মায়ের পুজো হয়।'

'এই মাটি নাকি রক্ত-মেশানো?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল। 'এত রক্ত আসে কোথা থেকে?'

'স্যার, অমন লোকদেরকে বলে থাকি। আসলে তো স্যার আলতা শুধু।' লোকটা জানাল।

'হুম। দেখি খানিকটা মাটি।' তৌফিকের কথা পড়তে পেল না, পুরুত ঘরের কোণ থেকে এক ঝুড়ি মাটি এনে তৌফিকের সামনে নামিয়ে রাখল।

'দেখুন স্যার, রক্তটক্ত কিচ্ছু নেই। ওই মাটির গুলি তৈরি করে তারপর আলতা মাখিয়ে দেওয়া হয়।' পুরুত বলল। তৌফিক মাটিটা হাতে নিয়ে দেখল বীরভূমের সাধারণ লালচে এঁটেল মাটি।

'এই যে স্যার, আলতা।' পুরুতটা ঘরের পাশ থেকে এক পেটি আলতা নিয়ে এসেছে। অচিন্ত্য দেখল।

'হুম। তা এটা কবে তৈরি হয়েছে?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

লোকটা গরগর করে বলে গেল। এই বৃত্তটা কার্তিক অমাবস্যায় কালীপুজোর রাতে জন্ম নিয়েছে। পরের দিন সকালেই এক চাষি প্রথম দেখেছে, তারপরে লোকমুখে খবর ছড়াতে যেটুকু সময় লাগে। এখন পূর্ণিমা অমাবস্যায় বেশ ভিড় হয়। কিছুদিন আগে রটন্তী কালীপুজোতেও খুব ভিড় হয়েছিল। মাটির দাম প্রথমে একশো ছিল, রটন্তীপুজোয় বেড়ে

দু'শো টাকা হয়ে গেছে। যাদের জমি, তারাই নেয় টাকাপয়সা। মন্দিরও তারাই বানিয়ে দিয়েছে, তাকে শুধু পূজারি ব্রাহ্মণ হিসাবে রেখেছে। তার কোনও দোষই নেই। কেন রক্ত মেশানো হয় না বা কেন আলতা মেশানো হয়, তাতে তার কোনও হাত নেই।

অচিন্ত্য দেখল, মেয়েরা গুটিগুটি উঠে এসেছে মন্দিরের চাতালে। পুরুতটা তাদেরকে তাড়া করতে যেতেই তৌফিক বলল, 'আসতে দে ওদেরকে।'

সোলাঙ্কী আর কৃষ্ণা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল। শাম্ভবীই শুধু ভিতরে ঢুকল। ঘুরে ঘুরে মাটি মেখে অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর মুখে বৃত্তটা পরীক্ষা করল। তৌফিক সেই ফাঁকে পুরুতটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী করে জানলি, এখানে মাটিতে বৃত্ত তৈরি হয়েছিল?'

পুরুত জানাল, এই মন্দিরের মালিকের বাড়িতে সে নিত্যপুজো করে থাকে। তাই খবর পেয়ে আর দশজনের মতো সে-ও দেখতে এসেছিল। তখন মাটিতে সত্যি সত্যি রক্ত লেগে ছিল। কেউ যেন অনেকগুলো বলি দিয়ে মাটিটাকে ভিজিয়েছে। রক্তে ভিজে একদম চটচট করছিল। কিন্তু সেই মাটির গভীরতা এক বিঘতও হবে না। হাতে হাতে সেই মাটি তখনই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই আসলে মাটি বিক্রি শুরু হয়েছে।

শাম্ভবীর বৃত্ত পরীক্ষা শেষের মুখে দেখে, তৌফিক পুরুতটাকে বলল, 'ঠিক আছে, এবারকার মতো ছেড়ে দিলাম। যদি পরে অন্য কোনও খবর পাই, তবে তোর কপালে দুঃখ আছে।'

বৃত্ত পরীক্ষা শেষে হাতে-মুখে মাটি মেখে শাম্ভবী বলল, 'কিচ্ছু নেই। চল ফিরে যাই।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী চাইছিলিস?'

'মাটি।' শাম্ভবী আরও গম্ভীরভাবে জানাল।

মন্দির থেকে বেরতে বেরতে অচিন্ত্য তৌফিকের কানে কানে বলল, 'এক চাবড়া মাটি নিয়ে শামুর মাথায় চাপিয়ে দেব। পাগলামি যদি কমে।'

তৌফিক ফিসফিস করে বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে পারিস, তবে হিতে বিপরীত হলে আমি জানি না।'

'নাহ্, থাক। খেপে গিয়ে যদি কামড়ে দেয়!' অচিন্ত্য আর তৌফিক দুজনেই হেসে উঠল।

তারা মন্দির থেকে বেরতে না বেরতেই পুরুতটা গেটে তালা লাগিয়ে দুড়দাড় করে মাঠ ভেঙে ছুট লাগাল। সবাই হেসে উঠল।

'উফ। তৌফিকদা তুমি যে কী কর না মাঝে মাঝে।' কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলল।

'জাস্ট মজা।' তৌফিক হাসতে হাসতে বলল।

মন্দিরটার চাতালে পা ঝুলিয়ে বসে অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করল, 'রাখালেশ্বরেও এরকমই নাকি সর্বরোগহর মাটি পাওয়া যাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, ওটা আমি শুনেছি। তাই আরেকটার কথা শুনে কৌতূহল হল, দেখতে এলাম।' তৌফিক জানাল। 'একই রকম দেখতে দুটোই। প্রায় তিন ফুটের ব্যাস। তবে প্রথমে কেমন ছিল তা তো দেখিনি, বর্ণনা শুনে একই রকম লাগছে। দুটোই অমাবস্যায় তৈরি হয়েছে।'

'বলিটলি তো অমাবস্যাতেই দেওয়া হয়।' কৃষ্ণা বলল, 'কোনও তান্ত্রিক রিচুয়ালস কি?'

'আমি এরকম তান্ত্রিক ক্রিয়া কিন্তু দেখিনি কখনও।' অচিন্ত্য জানাল।

‘আমি এরকম একটা গল্পের কথা বহুদিন আগে শুনেছিলাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এটাই সেটা কি না। শুনে খানিকটা একই রকম লাগছে।’

‘কত বলি লাগবে অতটা মাটিকে রক্তে ভেজাতে! এদের কথা অনুযায়ী কোনও পুজোআচ্ছা হতে তো দেখেনি কেউ। ফাঁকা মাঠে অতগুলো বলি দিল, আর কেউ...’ অচিন্ত্য থেমে গেল। মন্দিরের পিছন থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসেছে।

‘আমি যে গল্প শুনেছিলাম, সেটা সত্যি হলে...’ তৌফিক সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে বলল।

সে দেখেনি লোকটাকে। প্রায় উলঙ্গ, কোমরে একটা নেংটি, তার রং কোনও এক যুগে লাল ছিল, একরাশ দাড়িগোঁফের মধ্যে থেকে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। এতই রোগা যে দেখে মনে হয়, হাড়ের কাঠামোর উপরে চামড়াটা জড়িয়ে দিয়েছে, হাতে একটা খাটো সাদা লাঠি।

‘ও মা গো! ওটা কে?’ সোলাঙ্কী লাফ দিয়ে মাঠ ছেড়ে মন্দিরের চাতালে উঠে পড়ল। কৃষ্ণা পিছন ফিরে লোকটাকে দেখে ছিটকে সরে এল মন্দিরের দিকে।

লোকটা এসে চেপে ধরল তৌফিককে, হিসহিসে জ্বলন্ত স্বরে বলে উঠল, ‘কেন আছিস এখানে?’

আচমকা আক্রমণে তৌফিক হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ওই রোগা রোগা আঙুলে কী অস্বাভাবিক জোর! তৌফিকের বাহুর মাংস ভেদ করে আঙুলগুলো গেঁথে যাচ্ছিল।

‘কেন পড়ে আছিস এখানে? মরবি বলে?’ আচমকা চিৎকার করে উঠে পাগলটা তৌফিককে এক টানে মাটিতে আছড়ে ফেলল।

‘ও মাগো!’ সোলাঙ্কী ভয়ের চোটে চেঁচিয়ে উঠল।

তৌফিক তার স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে মাটিতে পড়েই ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু মোক্ষম সময়ে ডান কাঁধটায় একটা তীব্র ব্যথা তার হাতটা প্রায় অসাড় করে দিল। সে মাটি ছাড়ার আগেই পাগলটা অদ্ভুত দ্রুততায় তার বুকের উপরে চড়ে বসল। আবার তীক্ষ্ণ ভয়-জাগানো স্বরে চিৎকার করে উঠল, ‘রৌম্য জন্মাবে তোর ঔরসে। রক্তপিশাচ! মর্ তুই।’

পাগলটা হাঁটু দিয়ে তৌফিকের হাত দুটো চেপে রেখে দিয়েছে। তৌফিক একবার ঝাঁকি দিয়ে পাগলটাকে সরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওই রোগা হাড্ডিসার পাগলটার গায়ে কী অমানুষিক শক্তি! সে এক চুলও নড়তে পারল না। পাগলটা তৌফিককে মারার জন্যে লাঠিটা উপরের দিকে তুলল। সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠল সাদা রঙের লম্বা সরু জিনিসটা। সবাই দেখল ওটা লাঠি নয়, একটা লম্বা হাড়।

‘আরে, এ কী পাগল রে! এই দাদা, কিছু করতে পারছিস না?’ কৃষ্ণা চেঁচিয়ে উঠল।

অচিন্ত্য ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। সে কি পাগলটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে? অচিন্ত্যর ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই পাগলটার হাতের হাড়টা নেমে এল তৌফিকের মাথা লক্ষ্য করে।

কৃষ্ণা আর সোলাঙ্কী আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল।

একুশ

চন্দ্রমৌলির কথা

দীর্ঘ চোদ্দো মাস পরে মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিন অপরাহ্নে অমৃতযোগ শুরু হওয়ার মুহূর্তে চোখ মেলে তাকাল ভৈরব। সোনারুপোর জলে কারুকাজ-করা অপরূপ চন্দ্রাতপটা দেখছিল সে। একটা বিশাল আয়না।

প্রদীপের নিচু আলোয় আয়নায় তার দীর্ঘ অবয়বটা ফুটে উঠেছে। শ্বেত ত্বক, শ্বেত কেশ, শ্মশ্রু, গুম্ফ, ভ্রু, এমনকী অক্ষিপল্লব পর্যন্ত নীলাভ শ্বেতবর্ণের। বছর উনিশের এক শ্বেতকায় তরুণ তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই শ্বেত মুখমণ্ডলে একজোড়া উজ্জ্বল নীল টলটলে চোখ।

ঘরটা একদম নিস্তব্ধ। পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। সে উঠে বসল। নেমে এল পালঙ্ক থেকে।

ছোট কাঠের দরজাটা খুলে মন্ত্রণাকক্ষে পা রাখতে গিয়েই চমকে উঠল তরুণ। আচমকা তার বুকটা ধকধক করে উঠল।

স্বর্গদেও-প্রধানরা তাকে আটকে ফেলেছে এই ঘরটার মধ্যে। সে বেরবে কী করে? ওরা জেনে ফেলেছে তার স্বরূপ! ওরা বুঝে গেছে সে কোনও প্রাচীন ভৈরব নয়। ওরা তার বিরোধিতা করছে। না, শুধু বিরোধিতা নয়। ওরা তাকে হাতের পুতুল বানিয়ে রাখতে চায়। ওরা কি টের পেয়েছে তার ক্ষমতার কথা?

ছটফটে পায়ে সে ফিরে এল নিজের শয্যায়। চুপচাপ শুয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মাথার উপরে বিশাল আয়নাটার দিকে। তরুণের মুখে ফুটে উঠেছে লম্বা লম্বা নীল শিরা। অদম্য রাগ এসে দখল করছে তার মস্তিষ্ক।

চন্দ্রমৌলি! চন্দ্রমৌলি!

স্বপ্নের মধ্যে ওই বালিকাকে দেখেই সে চিনতে পেরেছে। ওই বালিকা একজন ‘বীজ’।

দেবী দিক্করবাসিনীর থানে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বীজ জন্মায়। অসমের ওই অঞ্চলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয় না বললেই চলে। প্রায় তিন-চারশো বছর পরপর এই দুর্লভ ঘটনাটা ঘটে দিক্করবাসিনীর থানে।

শেষবার বীজ জন্মেছিল আটশো বছর আগে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে। সুতিয়া রাজা রত্নধ্বজপালের সেই যোগিনী-রানির পুত্র। সেইবার যখন ভৈরবরা সমস্ত রৌম্য মেরে নরকে পাঠিয়েছিল, তখন ক্ষিপ্তা দেবী আবির্ভূতা হয়ে পাতরগণ্য যোগিনীদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। যতদিন না দিক্করবাসিনীর থানে কোনও ভৈরবের আহুতি হবে, ততদিন পর্যন্ত আর বীজ জন্ম নেবে না। ভৈরবদের প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে সেইসব ইতিহাস।

যা লেখা নেই, তা তরুণ নিজের চোখে দেখেছে। বহু বহু বছর পরে সে ফিরে গেল ব্রহ্মপুত্রতীরে দেবী দিক্করবাসিনীর থানে। সাড়ে আট বছর আগে এক সূর্যগ্রহণের দিন। দেবীর থানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। আহুতি দেওয়ার জন্যে যোগিনী নিয়ে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু তার বদলে বলি হয়ে গিয়েছিল সেই স্বর্ণাভ যুবক। কে সে? অন্য কোনও ভৈরব?

কোনও প্রাচীন ভৈরব? তা-ই হবে হয়তো। এক বীজ জন্মাচ্ছে জানতে পেরে ছুটে এসেছিল বাধা দিতে। দেবী তার বদলে সেই অন্য ভৈরবকে নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিল।

দেবীর থানে জন্মেছিল ওই বালিকা। বীজ! কিন্তু চন্দ্রমৌলি কে? ওই বালিকা কেন তাকে চন্দ্রমৌলি বলে ডাকল?

দেবীর থানে ওই যোগিনীটা হেরে গিয়েছিল। খুলে গিয়েছিল মন্ত্রবন্ধন। ব্রহ্মপুত্রের বানে ভেসে গিয়েছিল সে। পালিয়ে গিয়েছিল যোগিনীর থেকে দূরে। বড় ভয়ংকর ওই যোগিনী কালসিদ্ধা। আর বড়ই শক্তিশালী।

তরুণ অনুভব করে, ওই যোগিনীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেও তার যেন কী একটা অতীত ছিল। সেই কোনও এক অতীতে, যখন সে শেখেনি ভৈরবের জীবনের অন্ধকারময় উত্থানগুলো, তখন কি সে চন্দ্রমৌলি ছিল? তরুণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে চন্দ্রমৌলির কথা ভাবার চেষ্টা করল।

সে হিসাব করে দেখেছে, যোগিনীটা যখন তাকে পেয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল আট-নয় বছর। নিজের স্মৃতির উপরে যতটুকু ভরসা তার আছে, তাতে সে অনায়াসে বলতে পারে; এক বছর বয়সকালের কথাও তার স্পষ্ট মনে থাকা উচিত। কিন্তু মনে নেই। যোগিনী কালসিদ্ধার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেকার ঘটনা তার কিছুই মনে পড়ে না। যেন স্মৃতির দ্বারে একটা কালো পরদা ফেলা। সে আন্দাজ করে, যোগিনীটা কোনওভাবে তার বালকবেলার স্মৃতি নষ্ট করে দিয়েছে।

হঠাৎ তার চোখে জল এল। সে জলবিন্দু দুটোকে গড়িয়ে যেতে দিল চোখের কোণ থেকে। তার উপাধানটি জলকণা দুটো শুষে নেওয়ার আগেই চন্দ্রমৌলি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, ওই বালিকার সঙ্গে যেভাবেই হোক আরেকবার যোগাযোগ করতে হবে তাকে। ওই রক্তবর্ণ বালিকা। বীজ!

***

সাধী একাকী বসে আছে মন্ত্রণাকক্ষে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর রাখছে ছয়টা দ্বারের দিকে। তিন দিন কেটে গেছে ভৈরবের জ্ঞান ফেরার পর থেকে।

মন্ত্রণাকক্ষে বসে থেকে থেকে সাধীর বিরক্তি ধরে গেল। এত সময় লাগাচ্ছে কেন? যে কেউ যে কোনও সময় চলে আসবে।

উদ্‌বিগ্ন সাধী উঠে এসে ভৈরবের ঘরের দরজাটা হালকা ঠেলা দিতেই সেটা খুলে গেল। সাধী ঢুকে এল ঘরের মধ্যে। স্বর্গদেও-প্রধান ছাড়া অন্য কেউ এই ঘরে প্রবেশ করলে আর বেরতে পারবে না। অবশ্য অন্য স্বর্গদেও-প্রধানরা ভয়ের চোটে ঢুকছে না। ভৈরব তাদেরকে হাতের সামনে পেলেই হত্যা করবে। সাধীর সে ভয় নেই।

অন্যান্য দিনের মতোই ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ জ্বলছে কক্ষে। আলোয় সারা ঘর উদ্ভাসিত। পালঙ্কটার দিকে তাকিয়ে সাধী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। দরজাটা আলতো হাতে বন্ধ করে দিল।

পালঙ্ক থেকে নারীকণ্ঠে বিজাতীয় শীৎকারধ্বনি ভেসে আসছে। সাধী কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল পালঙ্কের দিকে। ঘরের মাঝখানে একটা উলঙ্গ নারীশরীর লোটাচ্ছে। তার কণ্ঠনালি ভেদ করে এখনও অল্প অল্প রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। সাদা প্রায় রক্তশূন্য দেহটাকে সাধী বকের মতো লম্বা পা ফেলে ডিঙিয়ে গেল।

শীৎকারধ্বনিটা ক্রমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। সাধী এসে দাঁড়াল পালঙ্কের পাশে।

চন্দ্রমৌলি কোলে বসে নির্দিষ্ট ছন্দে দুলতে থাকা নারীটির মসৃণ কালো কণ্ঠায় দাঁত বসাতে যাচ্ছিল। সাধীকে দেখে সে থেমে গেল। মেয়েটা তখনও সংগমেচ্ছা পূর্ণ করে যাচ্ছে। একবার মুখ বিকৃত করে মেয়েটার কণ্ঠায় শ্বদন্ত বসিয়ে দিল চন্দ্রমৌলি। শিরা কেটে সরু ফুটো থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। সাধীর চোখে চোখ রেখে সে মেয়েটার রক্ত শুষে নিতে থাকল।

সাধী কয়েক মুহূর্ত উদ্‌বিগ্ন চোখে তাকিয়ে রইল ভৈরবের দিকে।

মানুষের রক্ত খেতে না পারলে ভৈরবের ক্ষমতা কমে আসে। এই তথ্যটা জানে স্বর্গদেও-প্রধানরা। গত পাঁচ দিন ধরে তাকে সাধারণ খাদ্য-পানীয় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মানুষ প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সাধী সরে এসে কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দেখল, মন্ত্রণাকক্ষের একটা দ্বার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কেউ একজন আসছে!

দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে পালঙ্কের কাছে ছুটে গেল। দু-হাতে মেয়েটার মুখ চেপে ধরল। চন্দ্রমৌলি একটা আহত গর্জন করে মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিল। রতিক্লান্তা মেয়েটা পালঙ্কের উপরে গড়িয়ে পড়ল।

'কী হয়েছে? জ্বালাচ্ছ কেন?' পালঙ্কের উপরে উঠে বসল চন্দ্রমৌলি।

'চুপ কর! কেউ আসছে। যদি জানতে পারে...'

'তা-ই তো! তুমি তো এখন বিশ্বাসঘাতক।' বাঁকা হাসি হেসে কথাটা বলে চন্দ্রমৌলি হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে আবার টেনে নিল কাছে, মুখ ডুবিয়ে দিল কণ্ঠায়।

মেয়েটার ছিঁড়ে যাওয়া শিরা-ধমনি থেকে উষ্ণ রক্ত শুষে নিতে নিতে চন্দ্রমৌলি আরেকবার সাধীর দিকে তাকাল। তার শক্তি ফিরে আসছে একটু একটু করে।

অত্যধিক দ্রুততা, কী অসীম শারীরিক শক্তি। নাহ্, সেইসব কিছু নেই চন্দ্রমৌলির, হয়তো প্রাচীনকালে অন্য ভৈরবদের সেইসব ক্ষমতা ছিল। তবে ভৈরবের শরীর সাধারণ অস্ত্রে আহত হয় না। সাধারণ আগুনে পোড়ে না। সাধারণ মানুষের কাছে তার দেহখানি দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো। অবশ্য সেই পাতরগণ্য যোগিনীটা, কালসিদ্ধা, জানে কোন অস্ত্রে ভৈরব আহত হয়।

চন্দ্রমৌলির একমাত্র ক্ষমতা হল, যে কোনও মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করা। সে একটু চেষ্টা করলেই মানুষকে যা ইচ্ছা দেখাতে পারে। এই যে সাধী একটু আগে দেখল তার শ্বদন্ত, ড্রাকুলার মতো আচরণ; অথবা জ্ঞান হারানোর আগে সবাই তাকে সেই স্বর্ণাভ যুবকের মতো দেখত। সব ওই মায়ার খেলা। আসলে একটা সরু ধারালো কাঁটা ব্যবহার করে সে মানুষের ধমনি ফুটো করার জন্য।

অবশ্য তার ইচ্ছাশক্তিও আছে। সাধারণ মানুষকে সে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করাতে পারে। কিন্তু স্বর্গদেও-প্রধান অথবা উচ্চস্তরের পাতরগণ্য সাধকদের উপরে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ সম্ভব নয়। তবে মায়াবিভ্রম সম্ভব।

রক্ত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি ফিরে আসছে। সাধীর মনে প্রভাব বিস্তার করছে সে।

যোগিনী কালসিদ্ধাই তাকে শিখিয়েছিল নিয়মিত রক্ত খাওয়া। যেমন, বীজেরা নিজের শক্তিকে জাগ্রত করতে মানুষের হৃৎপিণ্ড খায়। রৌম্যরা খায় মানুষের মাংস। তেমনি ভৈরবের খাদ্য অথবা পানীয় হল মানুষের রক্ত। সামান্য সম্পদ তার। দাঁত-নখ বার-করা অন্ধকার অলৌকিক পৃথিবীতে নিজেকে আড়াল করে রাখার জন্যে ওইটুকু শক্তিকে জিইয়ে রাখা দরকার।

গত চোদ্দো মাস সে কিছু খায়নি। তার ক্ষমতা শূন্য হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু বাকি ছিল, তাকে বাঁচাবার সময় বীজটা তার থেকে সেই শক্তি শুষে নিয়েছিল।

নিষ্প্রাণ দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে, ঠোঁট থেকে শেষ বিন্দু রক্তটুকু চেটে নিল চন্দ্রমৌলি। বাইরে মন্ত্রণাকক্ষে দুজন স্বর্গদেও-প্রধানের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ভয়ে-উৎকণ্ঠায় সাধী কাঁটা হয়ে আছে। ঘরে কেউ উঁকি দিলেই তারা ধরা পড়া যাবে।

সাধী পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকাল, 'এবার কী হবে? এগুলোকে কোথায় লুকাব?'

চন্দ্রমৌলি বুঝতে পারছিল, তার শক্তি ফিরে এসেছে। আর কোনও ভয় নেই। সাধীকে নিয়ে মজা করার লোভ সামলাতে পারল না সে, বলল, 'তুমি আমাকে একটুও শান্তি দাও না। পুরো মুডটা নষ্ট করলে।'

'তোমার মুড বানানোর জন্য আমি মেয়ে দুটোকে নিয়ে আসিনি। তোমার রক্তের প্রয়োজন ছিল তাই এনেছি। অন্য স্বর্গদেও-প্রধানরা জানতে পারলে আমাকে তো মারবেই। সেই সঙ্গে আমার বংশের কাউকেই জীবিত রাখবে না।' সাধীর গলায় স্পষ্ট উদ্‌বেগ।

চন্দ্রমৌলি হাসল, 'আগে ভাবা উচিত ছিল।'

'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?' সাধী রেগে উঠছিল।

'একদম নয়। এই বিছানায় শুয়ে আমি কারও সঙ্গে ঠাট্টা করি না। ওটা মন্ত্রণাকক্ষের সিংহাসনের জন্য তুলে রাখি।' সাধীকে আচমকা জড়িয়ে ধরল চন্দ্রমৌলি। টেনে তুলে আনল বিছানার উপরে।

একজন স্বর্গদেও-প্রধান ছোট কাঠের দরজাটা খুলে উঁকি দিল চন্দ্রমৌলির ঘরে। একবার চোখ বোলাল সম্পূর্ণ ঘরটায়। তারপর একটা থালায় সামান্য কিছু খাবার আর এক বোতল জল রেখে, থালাটা ঠেলে দিল ঘরের মাঝে। তারপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

চন্দ্রমৌলির ক্ষমতাবলে স্বর্গদেও-প্রধান ভৈরবকে ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কাউকে দেখতে পেল না। সাধী বুঝতে পারল না ব্যাপারটা, কিন্তু স্বর্গদেও-প্রধানটা কিছু বলল না দেখে সে হাঁপ ছাড়ল।

সাধীকে নিশ্চিন্ত হতে দেখে চন্দ্রমৌলি হাসল, আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল কোমলাঙ্গী রমণীকে, 'আহা! তোমার কি এতটুকু ভরসা নেই আমার উপরে?'

সাধী ছদ্মকোপে চোখ পাকাল, 'তুমি বালকমাত্র ভৈরব। তোমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই...'

সাধীর রাজহংসের মতো লম্বা গ্রীবায় মুখ ঘষতে ঘষতে চন্দ্রমৌলি অভিযোগ করল, 'তাই কি আমাকে আর পছন্দ হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ। তা তো বটেই।' সাধী ভৈরবের শ্বেতপাথরের মতো বুকে হাত রাখল। 'তুমি হারেম বসাবে, আর আমি তোমাকে পছন্দ করব?'

'আরে, হারেম আর হৃদয় কি এক হল?'

'উফ। তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়।'

সাধী একদৃষ্টে ভৈরবকে দেখছিল। নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠব, চিরতরুণ মুখাকৃতি, শুভ্র থেকে শুভ্রতর মর্মরমূর্তির মতোই সাদা দেহ। শুধু দীর্ঘ দেহটা সামান্য কৃশ। পাঁজর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে রোগা শরীরে। দীর্ঘ গ্রীবা ছাড়িয়ে শুভ্র পিঠ ছুঁয়েছে নীলাভ কেশরাজি। এই প্রথম সাধী লক্ষ করল ভৈরবের চুল সামান্য কোঁকড়ানো। এলোমেলো। ঘাড়ে-মুখে-কপালেও ছড়িয়ে আছে কুঞ্চিত কেশদাম।

ভৈরব যে রূপটা সাধারণত ব্যবহার করত, সেটা বয়সে বেশি এবং অনেক বেশি পুরুষালি। কিন্তু সৌন্দর্যে এই তরুণের ধারেকাছে আসে না। সাধী এখনও বুঝতে পারছে না, ভৈরব কীভাবে সবকিছু আড়াল করল। কিন্তু সে ঘনিয়ে এল ভৈরবের কাছে।

'তুমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ভৈরব?'

'আমি বালকমাত্র জানলে কি আর আমাকে তোমার ভালো লাগত সাধী? তার উপরে আমি অ্যালবিনো। ভালো যে লাগে না, তার প্রমাণ এইমাত্র দিলে তুমি।' চন্দ্রমৌলি কপট রাগে ঠোঁট ফোলাল।

'ইনকরিজিবল! আচ্ছা! তুমি মরতে বসেছিলে কী করে?'

প্রশ্নটা শুনে চন্দ্রমৌলি অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

গত কয়েকদিনে বীজ আর রৌম্যদের নিয়ে চন্দ্রমৌলি প্রচুর পড়াশোনা করেছে। রৌম্যদের সম্বন্ধে এত কথা সে আগে জানত না।

বীজকে অন্যান্য রৌম্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। বীজ স্বয়ং দেবীর শক্তিতে বলীয়ান। তাদের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই আলাদা। বীজ ও রৌম্য- জাগরণের প্রক্রিয়া এবং পন্থাও সম্পূর্ণ আলাদা। বীজ জন্মায় সূর্যগ্রহণে আর রৌম্যজাগরণ হয় চন্দ্রগ্রহণের রাতে।

বীজের জন্ম নির্ভর করে দেবীর সন্তোষের উপরে। কিন্তু রৌম্যের জন্ম নির্ভর করে বীজের উপরেই।

রৌম্যজাগরণের সময় নির্দিষ্ট চন্দ্রগ্রহণের তিন দিন আগে বীজকে নরকে পাঠানো হয়। চন্দ্রগ্রহণের দিন রৌম্যশিশুকে নিয়ে বীজ পৃথিবীতে ফিরে আসে। সেই চন্দ্রগ্রহণের সময় বীজের বয়সের উপরেই নির্ভর করে জাত রৌম্যের শক্তি।

ভৈরবদের প্রাচীন গ্রন্থে ষোলোটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের রৌম্যের কথা বলা আছে। বীজের বয়স অনুসারে তাদের নামকরণ হয়।

বীজের যখন এক বছরের কম বয়স থাকে, তখন তাকে নরকে পাঠালে যে রৌম্য জন্মায়, তাদেরকে বলে 'সন্ধ্যা'। একইভাবে বীজের দ্বিতীয় বর্ষে জাত রৌম্যের গোত্র 'সরস্বতী'। তারপরে যথাক্রমে ত্রিধামূর্তি, কালিকা, সুভগা, উমা, মালিনী, কুষ্ঠিকা, কালসন্দর্ভা, অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালপ্তী, পিঠনায়িকা, ক্ষেত্রজ্ঞা, অম্বিকা।

এই প্রত্যেক গোত্রের রৌম্যের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন। বীজের দ্বিতীয় বর্ষে জাগরিত রৌম্যরা অসম্ভব শক্তিশালী নাদকম্প, মানে সাউন্ড ওয়েভ তৈরি করতে পারে। সেই জন্যেই এই জাতের রৌম্যদের নাম সরস্বতী।

চন্দ্রমৌলি হিসাব করে দেখেছে, চোদ্দো মাস আগে সে যে রৌম্যটাকে মেরেছিল, সেটা জন্মেছে বীজের যখন ছয় বছর বয়স, তখন। এই রৌম্যটি 'উমা' গোত্রের। এটার কথাও চন্দ্রমৌলি পেয়েছে ভৈরবদের গ্রন্থে।

'উমা' গোত্রের রৌম্যরা তাদের দাঁতে আর নখে বহন করে মারাত্মক বিষ। সেই বিষ কোনওভাবে রক্তে মিশলে ভৈরব সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল ধরে একের পরে এক দুঃস্বপ্ন দেখে চলে। দুঃস্বপ্নগুলো এতই ভয়ংকর যে, ভৈরবের মস্তিষ্ক মাত্র এক সপ্তাহের বেশি সেই অত্যাচার সহ্য করতে সক্ষম হয় না। সহ্য করতে না পেরে যেইমাত্র ভৈরব মরতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়।

'উ-মা' কথার অর্থ 'আর না'।

পড়তে পড়তে চন্দ্রমৌলির গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। এক সপ্তাহ! সেখানে সে টানা চোদ্দো মাস যুদ্ধ করেছে। লিখিত বিবরণের মতোই সে স্বপ্নের মধ্যে হাল ছেড়ে দিয়ে মরতে চেয়েছিল। ঠিক তখনই ওই বালিকা... ওই বীজ... চন্দ্রমৌলিকে বাঁচিয়ে দিল।

'ভৈরব?'

চিন্তাজাল ছিঁড়ে চন্দ্রমৌলি ফিরে এল তার কক্ষে। সাধীর চোখে প্রশ্ন।

চন্দ্রমৌলি কোনও উত্তর দিল না, সাধীকে জড়িয়ে ধরল আস্তে আস্তে। কর্ণমূলে ঠোঁট রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সাধী! আমাকে একটা জিনিস এনে দেবে?'

'কী জিনিস ভৈরব?'

জিনিসটার কথা বলতেই সাধী চমকে উঠল।

'কেন ভৈরব? কী হবে?'

'ওটার রক্ত খেলে আমার আরও শক্তি বেড়ে যাবে সাধী। তখন আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।' সাধীর চোখে চোখ রেখে অর্ধসত্য বলল চন্দ্রমৌলি।

'কিন্তু ও তো বড়ই দুষ্প্রাপ্য জিনিস।'

'সেই জন্যেই তো তোমায় বলছি।'

'তুমি যা চাইবে তা-ই হবে ভৈরব।' চন্দ্রমৌলিকে বাহুডোরে বাঁধতে বাঁধতে সাধী আপ্লুত কণ্ঠে বলল।

সাধীর শরীরে প্রবেশ করতে করতে চন্দ্রমৌলি মনে মনে পরবর্তী পদক্ষেপ সাজাতে লাগল। তাকে যেভাবেই হোক, এই কারাগার থেকে বেরতেই হবে।

বাইশ

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে রাস্তাঘাট। হিম হাওয়ায় উষ্ণতা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে কেউ একজন বলল, কাচগুলো তুলে দিলে হয়, বড্ড হাওয়া। সোলাঙ্কীদের গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটছিল হাইওয়ে দিয়ে। কুয়াশা চিরে হেডলাইটের আলো পথ খুঁজে নিচ্ছিল। তারাপীঠে জ্যামে আটকে বেরতে বেরতে দেরি হয়ে গেছে অনেকটা। গাড়ির মধ্যে সবাই চুপচাপ বসে আছে। দেখতে দেখতে সাঁইথিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। সাঁইথিয়া শহরে কোথাও আলো জ্বলছে না।

তারাপীঠ ছাড়ার পরে এই প্রথম তৌফিক কথা বলল, 'বড়সড়ো পাওয়ার কাট হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। তা-ই মনে হচ্ছে।' বিশু বলল।

হঠাৎ গাড়িটা দুবার হেঁচকি তুলে থেমে গেল।

'কী হল?' অচিন্ত্যর বিরক্ত স্বর শোনা গেল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। গাড়িটা মনে হচ্ছে গন্ডগোল করছে।'

বিশু খানিকক্ষণ চেষ্টা করল। গাড়ি স্টার্ট নিল না। বিশু গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে কী সব টানাটানি করল। তৌফিক স্টিয়ারিং-এ বসে দু-একবার স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল। প্রথমে গাড়িটা তা-ও গোঁ গোঁ করছিল। একটু পরে একদম চুপ করে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নিকষ অন্ধকার নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে চরাচর। জোর বাতাস বইছে।

'খুব ভালো।' সোলাঙ্কী রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বিশুর উপরে। 'এখন এই অন্ধকারে, জঙ্গলের মধ্যে... একটা ফোনেও টাওয়ার ধরছে না... আগে থেকে একটু দেখে রাখ না কেন?'

তৌফিক এবার বেরিয়ে এল গাড়ির বাইরে। এদিক-ওদিক দেখে সে চমকে উঠল, 'এ কী? রাস্তা ভুল করেছিলেন নাকি? বোলপুর সাঁইথিয়া হাই রোড ছেড়ে, আমরা চৌহাট্টার ভিতরে ঢুকে এলাম কী করে?'

তৌফিক আঙুল দিয়ে দেখাল রাস্তার পাশে একটা মাইলস্টোনে লেখা, 'চৌহাট্টা'। সাঁইথিয়া আট কিলোমিটার দূরে। বিশু কেমন যেন বোকার মতো হাত ওলটাল। সে বুঝতে পারছে না। সবার রাগী রাগী মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু ঢোক গিলে বলল, 'আমি বরং সাঁইথিয়া চলে যাই। মেকানিক নিয়ে আসি।'

কেউ কিছু বলার আগেই বিশু দৌড় দিল। সবাই হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'তৌফিকদা?'

'হুম।' তৌফিক কী যেন একটা মনোযোগ দিয়ে ভাবছিল।

'কেমন অসময়ে ঝড় শুরু হল দেখ। এখনও মাঘ মাস পেরয়নি।' অচিন্ত্য বলল।

শনশন করে হাওয়া বইছে। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও এসে পড়ল। চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিশু চলে যাওয়ার পরে সবাই মিলে গাড়িটাকে ঠেলে সরিয়েছে রাস্তার পাশে।

পরপর দুবার বিদ্যুৎ চমকাতে তৌফিক দেখল দূরে মাঠের মাঝখানে একটা গাছপালায় ঘেরা একটা টালির চালের বাড়ি। আশপাশে আর কোনও বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না ওই

টালির বাড়িটা ছাড়া। একপাশে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর অন্য পাশে জঙ্গল। ফাঁকা মাঠ বলে হাওয়ার বেগটা বেশ বেশি। তৌফিক হাওয়া আড়াল করে একটা সিগারেট ধরাল।

'গ্লোবাল ওয়ার্মিং।' কৃষ্ণা উঁকি দিল গাড়ি থেকে।

'যা বলেছিস। কোনওদিন শুনেছিস, শীতকালে সাইক্লোনিক ওয়েদার হয়? অথচ দেখ্, যেন মনে হচ্ছে...' অচিন্ত্য কথাটা শেষ করতে পারল না। আকাশ চিরে লিকলিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আলোর রেখারা চলে গেল। প্রচণ্ড জোরে কান-ফাটানো একটা শব্দ উঠল। পরক্ষণেই বিশাল একটা গাছ মড়মড় করে উলটে পড়ল রাস্তার উপরে।
ভয়ের চোটে সবাই চিৎকার করে উঠেছিল। গাছটা একদম রাস্তা জুড়ে পড়েছে। এখন বিশু মেকানিক নিয়ে ফিরে এলেও এখান থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। তৌফিক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। বাড়িটা রাস্তা থেকে দু'শো মিটারও হবে না। তারা ব্যাগপত্র নিয়ে বাড়িটায় পৌঁছানোর আগেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে এল।

ছোট টালির বাড়িটায় কেউ নেই। দরজার কড়া দুটো একটা নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সবাই দম ফেলল। সত্যি সত্যি ফাঁকা রাস্তায় গাড়ির মধ্যে বড্ড ভয় লাগছিল। এখানে অন্তত চারটে দেওয়াল পাওয়া গেল।

'আচ্ছা, বিশুদা ফিরলে আমাদের পাবে কী করে?' অচিন্ত্য বলল।

'ওই জন্যেই তো গাড়ির মধ্যে কাগজে লিখে রেখে এলাম।' তৌফিক বলল।

'বিশুদার ফিরতে ফিরতে এখনও দু-ঘণ্টা তো লেগেই যাবে। তারপরে যা ঝড় শুরু হয়েছে, ও নির্ঘাত কোনও বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।' কৃষ্ণা বলল।

'এই ঘরে আলো নেই?' সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

মোবাইল আর টর্চের আলোয় সবাই খুঁজতে লাগল, যদি হ্যারিকেন, লণ্ঠন গোছের কিছু পাওয়া যায়। একটু খুঁজতেই একটা হ্যারিকেন পাওয়া গেল।

হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে সবাই গোল হয়ে বসল ঘরের মধ্যে। ঘরে একটামাত্র তক্তপোশ। তাতে একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা। মাদুরটা তুলে কৃষ্ণা মেঝেতে পেতেছে। একটা দড়িতে কয়েকটা জামাকাপড় ঝুলছে। গেরুয়া রঙের। দেওয়ালে একটা পেরেকে একটা একতারাও ঝুলছে। এটা হয়তো কোনও বাউলের ঘর।

হ্যারিকেনের শিখায় ওদের বিশাল ছায়াগুলো দেওয়ালে পড়ে কাঁপছিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পরে হঠাৎ সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, রৌম্য কী যেন?'

'রৌম্য!' কৃষ্ণা অবাক হয়ে তাকাল সোলাঙ্কীর দিকে।

'দুপুরে ওই পাগলটা বলছিল না? তৌফিকদার বাচ্চা নাকি রৌম্য হবে?' সোলাঙ্কী বলল।

'তুই হঠাৎ পাগলটার কথা নিয়ে পড়লি কেন?' কৃষ্ণা বলল।

'ধুস। রৌম্য আবার কী? কোনওদিন শুনিইনি।' অচিন্ত্য বলল। 'আর আগে তো তৌফিকদার বিয়ে হোক, তারপরে বাচ্চা।'

'সত্যি তৌফিকদার বড় ফাঁড়া গেল।' কৃষ্ণা বলল। 'যত্তসব কাণ্ড। আরেকটু হলে মেরেই দিত।'

'হ্যাঁ, বিগত ছয়-সাত মাস ধরে আমার তো পরপর ফাঁড়া যাচ্ছে।' তৌফিক বলল। 'লোকে আমায় এত মারতে চাইছে কেন?'

ঘরে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সোলাঙ্কীর মনে পড়ল সে রৌম্য কথাটা কোথায় শুনেছে। সে বলল, 'রাজা রত্নধ্বজপালের সেই পুত্র পরলোকের দ্বার খুলে রৌম্য নিয়ে আসত। তা-ই না?'

'আরে হ্যাঁ তো।' কৃষ্ণা একটু অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো ভুলেই গেছিলাম। ঠিক বলেছিস।'

'তোরা গল্পটা জানিস তাহলে?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

'কোন গল্প?' সোলাঙ্কী জিজ্ঞেস করল।

'রৌম্য আর ভৈরবের গল্পটা।' তৌফিক বলল।

'ভৈরব! না, কোনও ভৈরবের কথা আমরা জানি না।' কৃষ্ণা জানাল।

'রৌম্য আর ভৈরবরা যুদ্ধ করেছিল। জানিস না?' তৌফিক বলল।

অন্যেরা মাথা নাড়ল। গল্পের এই অংশটা তারা জানে না। কৃষ্ণা সংক্ষেপে জয়ন্তর কাছ থেকে শোনা গল্পটা বলে দিল।

'ওই যে রানির পুত্র। ওটা ছিল বীজ।' তৌফিক বলল।

'বীজ? বীজ কী?' সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করল।

'বীজ হল এক প্রকার উপদেবতা। দেবী কেচাইখাতি বা দিক্করবাসিনীর থানে যখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়; ঠিক সেই সময় কোনও মহাযোগিনী যদি দেবীকে আবাহন করে তাহলে দেবীর শক্তিতে ওই বীজ জন্মায়। বীজের প্রচুর ক্ষমতা থাকে। বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বীজের রক্তে মাটিতে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলপনা আঁকলে, তৈরি হয় রক্তবৃত্ত। খুলে যায় দোজখের দ্বার, মানে নরকের দ্বার। তখন পৃথিবীর মাটিতে উঠে আসে রৌম্যরা, পিশাচের দল।'

'রক্তবৃত্ত মানে কি, এই যেটা আমরা দুপুরে দেখতে গিয়েছিলাম?' কৃষ্ণা জানতে চায়।

'হ্যাঁ। পুরুত যা বর্ণনা দিল, ওরকমই তো লাগল।' একটু চুপ করে থেকে তৌফিক আবার বলতে শুরু করল।

'সেই বীজপুত্র জন্মেছিল রাজা রত্নধ্বজপালের আমলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। অনেকগুলো রৌম্যজাগরণের পরে বীজপুত্র একদিন মারা যায়। কিন্তু রৌম্যরা অজর অমর। তারা বেঁচে রইল আর পুব অসমের জঙ্গলভরা রাজত্বগুলোতে অত্যাচার চালাতে লাগল।

সুতিয়া গোষ্ঠীর পুরোহিত দেওরীরা ওই রৌম্যদের আরাধনা করত। রৌম্যপিশাচদের খাদ্য ছিল মানুষের মাংস। তার জন্যে দেবী কেচাইখাতির থানে নরবলি দেওয়া হত। তান্ত্রিক পুজোতে সবচেয়ে পৈশাচিক ছিল এই দেবী কেচাইখাতির আরাধনা প্রথা। যখন যুদ্ধবন্দি বা অন্য গোষ্ঠী থেকে লোক পাওয়া কমে গেল, তখন এই দেওরীরা একটা আরও পৈশাচিক কাজ শুরু করল। তারা যুবতী নারীদের একটা গোষ্ঠী বানিয়ে ফেলল। সেই মেয়েরা গর্ভবতী হলে দেওরীরা বুঝতে পারত, ছেলে হবে নাকি মেয়ে। মেয়ে হলে তাকেও আবার গর্ভবতী করার জন্য বড় করা হত। ছেলে হলে তাকে কয়েক বছর প্রচুর খাইয়েদাইয়ে মোটাসোটা করে রৌম্যদের খেতে দেওয়া হত।'

'বাপ রে। কী ভয়ংকর!' সোলাঙ্কী কৃষ্ণাকে জড়িয়ে ধরল।

'হুঁ। বেশ পৈশাচিক ব্যাপার।' কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল।

‘রৌম্যদের জ্বালায় যখন সবারই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, তখন ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে, আহোম রাজা সুহুংমুং-এর এক বৈমাত্রেয় ভাই স্বর্গ থেকে ডেকে আনে ভৈরবদের। অনেক ভৈরব নেমে আসে পৃথিবীতে। তারপর দিকরং নদীর ধারে রৌম্যদের সঙ্গে ভৈরবদের এক বিশাল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শেষমেশ জিতে যায় ভৈরবরা। সমস্ত রৌম্যকে মেরে ফেলে অসম রাজ্যকে সুরক্ষিত করে।’

‘উফ! এ তো রূপকথা পুরো।’ সোলাঙ্কী বলে উঠল।

‘হুঁ।’

একটা বড়সড়ো হাই তুলে অচিন্ত্য উঠে দাঁড়াল।

‘ইয়ে, তাহলে শোবার ব্যবস্থা করা যাক?’ তক্তপোশের সামনে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্য মাথা চুলকাল। ‘বিশুদা তো এখনও এল না। এই ঘরেই শুতে হবে মনে হচ্ছে। তা কোথায় শোব?’

‘তোরা মেঝেতে আর আমরা তক্তপোশে। এতে আবার অত ভাবাভাবির কী আছে?’ কৃষ্ণা বলল।

‘মানে, তুই একলা শুলেই তো তক্তপোশটা ভরতি হয়ে যাবে। বাকিদের জায়গা কোথায় হবে তাই ভাবছি। তার থেকে বরং আমরা দুজন...’ অচিন্ত্য বলল।

কৃষ্ণা গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিল অচিন্ত্যর পিঠে। ‘একদম হাত দিবি না তক্তপোশে। ওইদিকে যা।’

তৌফিক হ্যারিকেনটা সলতে কমিয়ে রাখল দরজার সামনে। দরজায় খিল তুলে দিল। সবাই শুয়ে পড়ল।

কৃষ্ণা তক্তপোশে উঠতেই পলকা কাঠ ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল। অচিন্ত্য হো হো করে হেসে বলল, ‘কৃষ্ণাকে দাওয়াতে পাঠিয়ে দে রে, ওই তক্তপোশ ভাঙল বলে।’

তৌফিক চুপচাপ শুয়ে ছিল। কৃষ্ণা-অচিন্ত্যর খুনসুটি সে ঠিক উপভোগ করতে পারছিল না। বুকের মধ্যে কী যেন একটা অস্বস্তি তাকে ক্রমশ গ্রাস করছিল। বাড়িতে সে ফোন করেছিল দুপুরবেলা। সিরিন কেমন আছে? বউদিকে বলেছিল, সন্ধেবেলা সে-ই মণিদিকে নিয়ে বাড়ি যাবে। তখনও সে জানত, সন্ধের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাবে। তারপর থেকে একের পর এক ঘটনায় বাড়ির কথা ভুলেই গিয়েছিল তৌফিক। এই পাণ্ডববর্জিত মাঠের মাঝখানে আবার ফোনে টাওয়ার আসছে না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় তৌফিক ঘুমিয়ে পড়ল।

***

‘এসো’, ঘুম ভেঙে গেল তৌফিকের। কে যেন তার মুখের উপরে ঝুঁকে বসে আছে। লম্বা লম্বা চুল এসে লাগছে মুখে-গলায়। বুকের উপরে রাখা হাতটা রীতিমতো ছ্যাঁকা দিচ্ছে তৌফিককে। কে এটা?

‘এসো।’

শাম্ভবী! চমকে উঠে তৌফিক চোখ মেলল।

খোলা জানালা বেয়ে ফিকে জ্যোৎস্না এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে তৌফিককে। পাশে অচিন্ত্যর নাকে সিংহগর্জন হচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। কী হল? তৌফিক মাথার পাশে হাতড়ে মোবাইলটা জ্বালল। রাত্রি দেড়টা। তৌফিক উঠে বসল। না, সত্যি কেউ কোথাও নেই, অথচ তৌফিক স্পষ্ট শুনেছে শাম্ভবীর গলার স্বর। সে স্বপ্ন দেখল নাকি?

ঠক, ঠক। কে যেন মৃদু টোকা দিচ্ছে দরজায়। তৌফিক মোবাইলটা রেখে, টর্চটা তুলে নিল। টর্চের আলোয় দেখল দরজার পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। বাতাসে পাল্লা দুটো দুলে দুলে আওয়াজ তুলছে।

তৌফিক তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। দরজার কাছে গিয়ে কী মনে হতে সে একবার টর্চ ঘুরিয়ে আলো ফেলল বেড়ার ওপাশের তক্তপোশে। দুজন ঘুমাচ্ছে, তৃতীয়জন নেই।

তৌফিক বেরিয়ে এল বাইরে। বৃষ্টি একদম থেমে গেছে। ঠান্ডা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। অষ্টমীর চাঁদ আধঘোমটার আড়াল থেকে কটাক্ষ করছে তাণ্ডবশ্রান্ত পৃথিবীকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তৌফিক উঠোনের এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফেলল। গেল কোথায় মেয়েটা?

'শামু।' চাপা গলায় ডাকল সে। কোনও উত্তর নেই। তৌফিক উঠোনটা পেরিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে এল। জোর গলায় চেঁচাল, 'শামু! কোথায় তুই?'

নিঃশব্দ প্রকৃতি তৌফিকের আওয়াজ গিলে নিল। আরও কয়েকবার ডাকাডাকির পরে তৌফিকের মনে হল শাম্ভবী এদিকে আসেনি, বোধহয় বাড়ির পিছনদিকে গেছে। সে বাড়ির পিছনদিকে যেতে গিয়ে দেখল, সেইদিকে ইটে বাঁধানো একটা রাস্তা আছে। পুকুরও আছে একটা। ওই তো শাম্ভবী, পুকুরপারে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে মাটিতে বসে আছে। তৌফিক এগিয়ে গেল।

মাটিতে টর্চের আলো ফেলতেই, তৌফিকের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। একটা বৃত্ত, ফুট তিনেক ব্যাস। একদম নতুন। কোনও গর্ত খোঁড়া হয়নি। শাম্ভবী তার মধ্যে বসে কাদামাটি তুলে তুলে চৌকো বেদিমতো তৈরি করছে। ফিকে জোৎস্নার আলোতেও আশপাশের ভেজা লালমাটির সঙ্গে বৃত্তের অদ্ভুত চকচকে কালচে লাল রঙের তফাতটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে। বৃত্তস্থিত মাটিটাকে দেখলে মনে হয়, কেউ যেন খুরপি দিয়ে মাটিটাকে খুঁচিয়েছে, বীজ পোঁতার জন্যে যেভাবে মাটি আলাগা করা হয়। বাড়ির পিছনে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে বলেই এখনও কারও নজরে পড়েনি। তা না হলে এতদিনে ঠাকুরের থান তৈরি হয়ে যেত। তৌফিক হাঁটু গেড়ে বসল। বৃত্তের মাটিতে হাত ছোঁয়াতেই তার হাতে চটচটে কী যেন লাগল। টর্চের আলোয় তৌফিক দেখল হাতে রক্ত লেগে। টাটকা!

অনুভূতিটা তৌফিকের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা সরীসৃপের মতো নেমে গেল। শিউরে উঠে হাতে লেগে থাকা রক্তটা তাড়াতাড়ি পাশের কচু গাছের পাতায় মুছে ফেলল সে। শাম্ভবীকে নিয়ে এখান থেকে পালাতে হবে, বাকিদেরকেও... কারা করেছে এটা? তারা কি আশপাশে আছে এখনও?

শাম্ভবীর হাত ধরে টান মারতেই শাম্ভবী ফিরে তাকাল তার দিকে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। ভয়ের চোটে তৌফিক পা পিছলে পড়ে গেল মাটিতে। শাম্ভবীর চোখ দুটো সম্পূর্ণ

লাল হয়ে গেছে। চোখের মণি আর সাদা অংশের মধ্যে কোনও তফাত নেই। অদ্ভুত হিংস্র মুখ!

শাম্ভবী বৃত্তের মধ্যে বসে রক্তমাটি তুলে তুলে ধীরে ধীরে বেদিটা শেষ করতে লাগল। তৌফিক যেখানে পড়ে গিয়েছিল, সেখানেই পড়ে রইল। তার বুকের ভিতরে ধকধক করে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। সেদিন সোনাঝুরি জঙ্গলের মতোই কেউ যেন তার হাত-পা বেঁধে দিয়েছে, ইচ্ছা থাকলেও নড়ার উপায় নেই।

শাম্ভবীর বেদি বানানো শেষ হল। একটা ছোট ছ-কোনা বেদি। বেদির উপরে মাটি দিয়ে তৈরি অদ্ভুত ভাবে বেঁকানো দুটো শিং। দুর্বোধ্য ভাষায় একটা স্তোত্র আওড়াতে শুরু করল শাম্ভবী।

শাম্ভবীর হাতে একটা ছুরি উঠে এসেছে। ছুরিটা তৌফিক চিনতে পারল। ওটা তারই। জিন্‌সের পকেটে ছিল। মাস ছয়-সাত আগে কিডন্যাপের ঘটনাটা ঘটার পরে, আত্মরক্ষার জন্য তৌফিক একটা ছুরি কিনেছিল। কিন্তু সেটা তাকে খুনের জন্যই কাজে লাগবে, সেটা ভাবেনি। শাম্ভবীর অস্বাভাবিক মুখটা তৌফিকের রক্ত জল করে দিচ্ছে। এই মেয়েটা সেদিন সাধুটাকে খেয়ে ফেলেছে। আজ তার পালা!

আচমকা শাম্ভবী সরু হিলহিলে ছুরিটা তুলে বসিয়ে দিল নিজের হাতেই। তৌফিক আঁতকে উঠে শাম্ভবীকে ধরতে গেল। পরক্ষণেই সে দেখল, শাম্ভবীর হাতের তালু বেয়ে টপটপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ল বেদিটার উপরে।

অদ্ভুতদর্শন শিং দুটোর ঠিক মাঝখানে। শাম্ভবী দুর্বোধ্য উচ্চারণে কীসব বলছে। 'গ্লিয়া... গ্লিয়া... ইতাকিয়া... সোনেম্না... স্কেৎসি'। শিং দুটোর মাঝখানে হাওয়ার মধ্যে একটা সবজেটে আগুন জ্বলে উঠল দপ করে।

শাম্ভবী আঁজলাভরে তুলে নিল আগুনটা। তৌফিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে তৌফিকের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল জ্বলন্ত আগুনের গোলাটা। তৌফিক অনুভব করল, তার গলা বেয়ে আগুনটা জ্বলতে জ্বলতে নেমে যাচ্ছে। মেঘলা আকাশ, অষ্টমীর চাঁদ, পুকুর, শাম্ভবী, রক্তবৃত্ত— সবকিছু মুছে গেল তৌফিকের চোখের সামনে থেকে।

তেইশ

বাড়িটার সামনে অচিন্ত্যদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণা। কালকের ঝড়বৃষ্টির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। বড় রাস্তার একপাশে তাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। সব থেকে অবাক কাণ্ড, কালকে গাড়ির প্রায় সামনেই একটা বিশাল গাছ উপড়ে পড়েছিল। অথচ আজ সকালে কিছুই নেই।

প্রায় আটটা-সাড়ে আটটা বাজে। আকাশে রোদ উঠেছে বেশ। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে পরিবেশে। একটু লক্ষ করতেই কৃষ্ণা বুঝল, গাছে গাছে এত পাখি, একটাও ডাকছে না। হঠাৎ কৃষ্ণা শিউরে উঠল। কী এক অলৌকিক ঘটনা যেন ঘটে চলেছে তাদের চারপাশে। সে একবার বাড়ির পিছনদিকে চাইল। ওইখানে কচুবনের আড়ালে রক্তবৃত্তটা আছে, মনে পড়তেই কৃষ্ণা উঠোন ছেড়ে তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকে এল।

কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে দেখল, মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরে শাম্ভবী ঘুমাচ্ছে। তক্তপোশে তৌফিক। ঘুমন্ত হোক, তবু তো মানুষ।

ভোরবেলা শাম্ভবী যখন তাদেরকে ডেকে তুলে বলল, 'তৌফিকদা অজ্ঞান হয়ে গেছে,' তখনও কৃষ্ণারা কেউই অবস্থার গুরুত্ব বোঝেনি। বাড়িটার পিছনদিকে গিয়ে যখন ওই রক্ত-মাখা মাটিতে তৌফিকদাকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে, সত্যি সত্যি কৃষ্ণার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ওরা ধরেই নিয়েছিল, তৌফিকদা মরে গেছে। কেউ খুন করেছে তৌফিকদাকে। তারপরে কৃষ্ণাই সাহস করে কাছে গিয়ে দেখেছিল, নাহ্, নিঃশ্বাস পড়ছে।

পুকুর থেকে জল তুলে এনে বারবার মুখে-মাথায় ছিটিয়েছে তারা। গায়ে লেগে-থাকা রক্ত ধুয়ে-মুছে দিয়েছে জল দিয়ে। তাতেও তৌফিকের জ্ঞান ফেরেনি। তারপরে কোনওরকমে তিনজনে মিলে তৌফিককে তুলে এনেছে পুকুরপাড় থেকে। অচিন্ত্য তৌফিকের রক্তকাদা-মাখা জিন্স আর জামাটা চেঞ্জ করে আলনায় ঝোলানো একটা গেরুয়া কাপড় পরিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণা তক্তপোশের এক ধারে এসে বসল। তৌফিক গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। তৌফিকের দিকে তাকাতেই সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল কৃষ্ণার। সে কোনওদিন এইভাবে তৌফিককে দেখেনি।

সোলাঙ্কীর চাদরটা সরে গেছে তৌফিকের শরীর থেকে। তৌফিকের দীর্ঘ শরীর যেন মোম দিয়ে গড়া। পেশিবহুল নয়, একতিল আধিক্যও নেই কোথাও। একটা দৃঢ় শক্ত অথচ পেলব কাঠামো।

পরক্ষণেই কৃষ্ণার নিবিষ্টতা ছিঁড়ে গেল। সকালের উজ্জ্বল আলোয় তৌফিকের শরীরে অপারেশনের চিহ্নগুলো জ্বলজ্বল করছে। ডান কাঁধে একটা দাগ, বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে আরেকটা, পাঁজরে একটা... ক-টা হাড় ভেঙেছিল তৌফিকদার! কৃষ্ণা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

লতাদির মতো মেয়েকে ভালোবাসার দরকারটা কী? যারা ভালোবাসার মূল্যই দেয় না। চাদরটা ভালো করে টেনে দিতে গিয়ে কৃষ্ণার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। তৌফিকের গা প্রচণ্ড গরম। জ্বর এসেছে। কৃষ্ণা তড়িঘড়ি কাপড় ছিঁড়ে জলপট্টি বানিয়ে কপালে দিতে

লাগল। তার বেজায় ভয় লাগছে। অচিন্ত্য আর সোলাঙ্কী গেছে বিশুদার খোঁজে। বাড়িতেও ফোন করতে হবে। এই বাড়ি থেকে টাওয়ারও পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা গেছে তো গেছেই। ফেরার আর নামগন্ধ নেই।

ভেজা পট্টিটা কপালে রাখতেই তৌফিকের গলা থেকে একটা গোঙানি ছিটকে এল। দীর্ঘ দেহটা নড়ে উঠল। সকাল থেকে এই প্রথম। কৃষ্ণা উৎকণ্ঠিত হয়ে ঝুঁকে পড়ল তৌফিকের উপর।

'তৌফিকদা! তৌফিকদা!'

তৌফিক বিড়বিড় করে কী যেন বলল, কৃষ্ণা বুঝতে পারল না। জল চাইছে নাকি তৌফিকদা? সে কান পাতল তৌফিকের ঠোঁটের কাছে, পরক্ষণেই নাকের পাটা ফুলে উঠল কৃষ্ণার। সে খর চোখে তাকাল তৌফিকের দিকে।

লতা! লতা! এখনও কী করে লতাকে ভালোবাসতে পারে তৌফিক!

***

অচিন্ত্য-সোলাঙ্কীর সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন এল। জয়ন্ত আর বিশু। জয়ন্তকে দেখে কৃষ্ণার যেন ধড়ে প্রাণ এল।

'আরে, কাল সন্ধে থেকে তোমাদের কোনও খবর নেই। ফোন লাগছে না। সবাই তো বাড়ি মাথায় করছে একেবারে। আমি কালকে রাত্রেই গাড়ি নিয়ে গিয়েছি তারাপীঠে খোঁজ করতে। সকালে ফিরে যাচ্ছিলাম বাড়িতে, এমন সময় অচিন্ত্য ফোন করে বলল তোমরা চৌহাট্টায় মাঠের মাঝখানে আছ। এখানে এসে ঢুকলে কী করে? এরকম জটিল ফেঁসেছ কী করে বুঝব! কি কেলেঙ্কারি বল দেখি।' জয়ন্ত বলল।

কালকে রাত্রে কোথায় ছিলে, জানতে চাইলে বিশু বলল, সে যখন সাঁইথিয়া যাচ্ছিল, তখন মাঝরাস্তায় আচমকাই অসুস্থ বোধ করে। মাথায় একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়, তারপরেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সকালবেলা রাস্তার লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে ধরাধরি করে একটা বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপরে সে সুস্থ হয়ে অন্যদের খোঁজে ফিরে আসছে, মাঝরাস্তায় জয়ন্তর সঙ্গে দেখা।

জয়ন্ত বিশুকে বলল, 'মেয়েদের নিয়ে তুমি এখুনি বাড়িতে রওনা দাও। ওদিকে দাদু মাথা খারাপ করে দিচ্ছে একেবারে।'

কৃষ্ণা বেঁকে বসল, সে তৌফিককে এই অবস্থায় ছেড়ে রেখে কিছুতেই যাবে না।

জয়ন্ত তৌফিকের গায়ে হাত রাখল। পুড়ে যাচ্ছে। ভালোই জ্বর।

জয়ন্ত চিন্তিত স্বরে বলল, 'একটা ডাক্তার ডাকা উচিত। ওকে কি এখানকার হাসপাতালে অ্যাডমিট করিয়ে দেব?'

'ইয়ে, জয়ন্তদা, একটা কেস হয়েছে। তৌফিকদার বাড়িতে জানে না, ও আমাদের সঙ্গে এসেছে।' অচিন্ত্য বলল।

'ওর বাড়িতে একটা ফোন করে দাও।'

'ইয়ে, ওর বাড়ির নাম্বার তো জানি না।' অচিন্ত্য ভেবে পাচ্ছিল না, এই অবস্থায় তৌফিককে বাড়ি ফেরত নিয়ে গেলে কীরকম অভ্যর্থনা জুটবে। আঙ্কল কি পেটাবে তাকে ধরে! আঙ্কল না পেটালেও, তৌফিকদার ভাইয়া ঠিক চড় বসিয়ে দেবে তার গালে।

'ওহো। দাঁড়াও, আগে ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার কী বলে দেখি। ডাক্তার যদি বলে যে ওকে বোলপুরে ট্রান্সফার করা যাবে তাহলে তো কোনও ব্যাপারই না।'

গ্রামের মাঝখানে ডাক্তার কোথায়? জয়ন্ত বিশুকে ডাক্তারের খোঁজে সাঁইথিয়ায় পাঠাল।

অচিন্ত্য ছটফট করছিল, 'আমারই ভুল। তৌফিকদাকে আনাই উচিত হয়নি। ও যেখানে যায়, সমস্যা পাকায়। একে তো ওই পাগলটার সঙ্গে ওই ঝামেলা। তারপরে ভূতুড়ে বাড়িতে নিয়ে ঢোকাল আমাদের। এখন জ্বরে পড়েছে।'

'শাট আপ দাদা!' কৃষ্ণা গলা তুলল।

অচিন্ত্য পাগলের মতোই মাথা ঝাঁকাল, 'আমি কাল থেকেই জানি, কিছু একটা ঠিক ঘটবে। প্রথমে পাগল। রক্তবৃত্ত। ওই মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া।' অচিন্ত্য এবার সোজাসুজি আঙুল তুলল শাম্ভবীর দিকে। শাম্ভবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। সে লাল লাল চোখ তুলে অচিন্ত্যর দিকে তাকাল।

'কিন্তু শামুর দোষটা কোথায়?' সোলাঙ্কী চেঁচিয়ে উঠল।

'সবটাই ওর দোষ। ও-ই তো ছবি এঁকে, ধ্যান করে কেচাইখাতিকে ডেকেছে। এখন কেচাইখাতি আমাদের সবাইকে এক-এক করে খেয়ে নেবে।' অচিন্ত্য চিৎকার করে উঠল।

'দাদাই, তোকে না আমি... গলা টিপে মেরে দেব বলে দিচ্ছি।' কৃষ্ণা দাঁত খিঁচাল।

জয়ন্ত দুজনকে আটকাল। 'কী আরম্ভ করেছ তোমরা? এখন কি ঝগড়া করার সময়?'

জয়ন্ত তৌফিককে একটু জল খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু তৌফিক এতটাই অচেতন ছিল যে সে ঢোকও গিলতে পারছিল না। দু-দুবারই কশ বেয়ে জল গড়িয়ে গেল।

'কী হবে?' কৃষ্ণা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল।

'একটা কাজ কর। মাথাটা ধুইয়ে দাও। তাতে করে জ্বরটা কমবে মনে হচ্ছে। কী এমন হয়েছিল যে একরাত্রের মধ্যে এরকম জ্বর হয়ে গেল?'

জয়ন্তর প্রশ্নের উত্তরে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তৌফিকের মাথা ধোয়ানোর ব্যবস্থা করতে করতে জয়ন্ত সবার কাছ থেকে আগের রাত্রের গল্পটা মোটামুটি পুরোটাই শুনে ফেলল। ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। গাছ উপড়ে পড়েছিল শুনে যারপরনাই অবাক হল। তারপর রক্তবৃত্তের মধ্যে তৌফিক পড়ে ছিল শুনে চমকে উঠল। নিজে গিয়ে একবার দেখেও এল বৃত্তটা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে তৌফিকের মাথা ধুইয়ে দিতে তার সামান্য সাড় ফিরল। গলা থেকে অস্পষ্ট কিছু শব্দ ভেসে এল। এমন সময় বিশু কয়েকটা ওষুধ নিয়ে ফিরে এল। সে ডাক্তার পায়নি। সাধারণ জ্বর কমার ওষুধ কিনে এনেছে।

জয়ন্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ট্যাবলেটগুলো জলে গুলে তৌফিককে খাওয়ানোর চেষ্টা করল।

'তৌফিক? তৌফিক?'

বেশ কয়েকবার ডাকার পরে তৌফিক হঠাৎ ছটফট করে উঠল। 'না। আমাকে মেরো না। কেন মারছ আমাকে?' সে কাতর গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

জয়ন্তর সামনে তৌফিক কি সব বলে দেবে নাকি বিকারের ঘোরে? অচিন্ত্য কৃষ্ণার হাত চেপে ধরল। জয়ন্ত অবাক চোখে ফিরে তাকাল অচিন্ত্যর দিকে। বিশুও অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে।

'এ যে ভুল বকছে।' অচিন্ত্য নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল। 'তৌফিকদা। কেউ মারছে না তোমাকে। চোখ খোল।'

তৌফিক চোখ খুলল। কৃষ্ণা আঁতকে উঠল। তৌফিকের চোখ দুটো লাল টকটক করছে। সে পাগলাটে দৃষ্টিতে দেখল একবার জয়ন্তকে। আবারও ছটফট করে উঠল, 'কে তোমরা? কী চাও? আঃ... মা... মেরো না আমাকে।'

জয়ন্ত ওষুধটা একবার খাওয়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তৌফিক এমন মাথা নাড়াল যে জয়ন্ত সাবধান না থাকলে তার হাত থেকে গ্লাসটা ছিটকে যেত। তৌফিক একবার উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাল জয়ন্তর দিকে, তারপর পাগলাটে গলায় বলে উঠল, 'বিষ, বিষ। তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে। কেন? কী করেছি আমি? ছেড়ে দাও আমাকে।'

কৃষ্ণার চোখ-মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। অচিন্ত্য আতঙ্কিত। সোলাঙ্কীর মুখে রা নেই। জয়ন্ত ওদের অবস্থা দেখে বিশুকে বলল, 'হাত দুটো চেপে ধর তো।'

বিশু তৌফিককে চেপে ধরতে, জয়ন্ত তৌফিকের ঘাড়ের তলায় হাত রেখে একটু টেনে তুলল। তৌফিক দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। ছটফট করছে ক্রমাগত। জয়ন্ত কিছুতেই মুখ খোলাতে পারছে না।

এবার জয়ন্ত কড়া গলায় বলল, 'তৌফিক, তুমি আমাদের কথা না শুনলে আবার মারব। ওষুধটা খেয়ে নাও।'

তৌফিক এবার একটু স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চেপে ঘাড় নাড়ল, 'বিষ, বিষ।'

'তুমি বাড়ি যেতে চাও? মায়ের কাছে?' হঠাৎ খুব নরম গলায় বলে উঠল জয়ন্ত।

তৌফিক প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বলল, 'আম্মা... আঃ।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে খুব তা-ই না! তুমি আমাদের কথা শুনলে তোমাকে আমরা বাড়ি রেখে আসব। কে কে আছে তোমার বাড়িতে? মা... বাবা...'

তৌফিক একটু শান্ত হয়ে আসছিল। জয়ন্ত কথা বলতে বলতে হঠাৎ তৌফিকের মুখে ওষুধ-মেশানো জলটা ঢেলে দিল। তৌফিক ওয়াক তুলে জলটা ফেলে দিতে চাইলে জয়ন্ত শক্ত হাতে তার মুখটা চেপে ধরল। তৌফিক দু-একবার ছটফট করে ওষুধটা গিলে নিল। বেশ কিছুক্ষণ সে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইল সিলিং-এর দিকে। বারবার বলছিল, মেরো না আমাকে। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠল, 'রৌম্য... রৌম্য... বৃত্ত... কেচাই...খাতি...'

অচিন্ত্য একটা বড়সড়ো ঢোক গিলল। এরপরে যদি তৌফিকদা লতাদির নাম নেয় তাহলেই হয়েছে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো, তৌফিক আর কিছু বলল না। তার ছটফটানি কমে এল। চোখের পাতা বুজে এল। জয়ন্ত পরীক্ষা করে দেখে বলল, ঘুমিয়ে পড়ছে।

তৌফিকের জ্বর একটু কমতেই জয়ন্ত বলল, 'আর দেরি করাটা উচিত হবে না। আমাদের বাড়ি ফেরা দরকার। অন্যের ছেলে, এতটা অসুস্থ। ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে ফ্যাসাদ বাড়বে।'

অচিন্ত্য ভাবল, যা ফ্যাসাদ হয়ে আছে, তাতেই তারা জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। জয়ন্তদাকে কিছুতেই তৌফিকদার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। আন্টির যা মুখ, কী বলে বসবে কে জানে।

দুটো গাড়িতে ভাগাভাগি করে উঠল সবাই। কৃষ্ণা কিছুতেই তৌফিককে অচিন্ত্য আর জয়ন্তর সঙ্গে ছাড়তে রাজি হল না। সে-ও জয়ন্তদের গাড়িতেই উঠল। বাকিরা অন্য গাড়িতে।

গাড়ি চালাতে চালাতে জয়ন্ত একবার জিজ্ঞেস করল, 'এই তৌফিকই সেইদিন শামুকে সোনাঝুরি থেকে নিয়ে এসেছিল না?'

অচিন্ত্য ঘাড় নাড়ল।

'ওর কী হয়েছে? মারার কথা বলছিল তখন। গায়ে অপারেশন মার্ক।' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল।

কৃষ্ণা রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে অচিন্ত্যর সঙ্গে চোখাচোখি করল। অচিন্ত্য সামনের সিটে বসেছে। পিছনের সিটে তৌফিককে নিয়ে কৃষ্ণা।

অচিন্ত্য আমতা আমতা করে বলল, 'তা জানি না। কয়েক মাস আগে একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল।'

'অ্যাক্সিডেন্ট! তাই অতগুলো অপারেশন মার্ক। আজকালকার ছেলেছোকরারা একটুও চোখ মেলে হাঁটে না...' গাড়িটা একটা গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। তৌফিকের গলা থেকে কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল।

'সাবধানে গাড়ি চালাও জয়ন্তদা।' কৃষ্ণা বলল।

'সরি সরি। গর্তটা খেয়াল করিনি।' জয়ন্ত একবার আড়চোখে তৌফিককে দেখে নিল।

মসৃণ তেল চুকচুকে ১১৪ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে একটা আম্ব্যাসাডর আর একটা ফিয়াট উড়ে যেতে লাগল বোলপুরের দিকে।

চব্বিশ

পুরো একদিন পরে ঘুম ভাঙল তৌফিকের। ঘরে পরদা-টানা অন্ধকার। সামান্য সূর্যের আলো ফাঁকফোকর দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে। কোথায় আছে তারা? কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে? বাড়িতে ফোন করা দরকার। সিরিন কেমন আছে? ঘরের মধ্যে অন্ধকারে কারা যেন নড়াচড়া করছে।

'লালের শরীর ভালো নেই। এখন এ ঘরে ডিস্টার্ব করে না।' কে যেন কাকে বলল। একটা নারীকণ্ঠ। তৌফিক বুঝতে পারল না গলাটা কার। 'কে?'

'লাল, তোর ঘুম ভেঙে গেল? উফ, সিরিনটা এত দুষ্টু হয়েছে। তখন থেকে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে।'

'কে?' তৌফিক আবার জিজ্ঞেস করল।

'লাল! আমি ভাবি।' বউদি বলল। তৌফিক লক্ষ করল, তার বছর তিনেকের ভাইঝিটা খাটের পাশে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ। সিরিন! তৌফিকের সব মনে পড়ে গেল। সে সিরিনের জন্যে মণিদের বাড়িতে গিয়েছিল। ওখান থেকে অচিন্ত্যদের সঙ্গে তারাপীঠ। তারপর ঝড়বৃষ্টি। তারপর, তারপর... তৌফিক উঠে বসল। মাথাটা দপদপ করে উঠল।

'উঠিস না। ডাক্তার তোকে নড়াচড়া করতে একদম বারণ করেছে।'

'ভাবি! আমি কি বাড়িতে?' তৌফিক এক হাতে কপালটা টিপে ধরল।

'হ্যাঁ। নয়তো আবার কোথায়?'

'বাড়ি এলাম কী করে?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

'কাল বিকেলবেলা অচিন্ত্যরা এসে দিয়ে গেছে তোকে। আম্মা-আব্বা সবাই খুব রেগে গেছে। তুই আবার ওদের সঙ্গে কী করতে গিয়েছিলি?'

বউদির অনুযোগের উত্তর না দিয়ে তৌফিক বলল, 'ভাবি আমায় একটু পানি দিয়ো তো।'

টেবিলের উপরে একটা জাগ ছিল। বউদি সেটা নেড়ে দেখল, তাতে জল নেই। সে ঘরের বাইরে চলে গেল। সিরিন তৌফিকের কানের কাছে এসে বলল, 'লাল, তুই কেন গেচলি? ওলা বালো নয়।'

'কে বলেছে ভালো নয়!' তৌফিক বলল।

'দিম্মা বলচিলো। ওলা তোকে মেলে ফেলবে। ওলা ভালো নয়।'

'ছি শাহাজাদি, এমন বলতে নেই। আমার একটু জ্বর এসেছে। কালকেই ঠিক হয়ে যাবে আবার। তারপর আমরা কত খেলব।'

বউদি জল নিয়ে এসে তৌফিককে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে ঠান্ডা অন্ধকার নেমে এল ঘরে। সে বেঁচে আছে! শাম্ভবী তাকে মারেনি! তাহলে কেন তাকে টেনে নিয়ে গেল ওই বাড়ির পিছনে? ওটা কী ধরনের রিচুয়ালস! আগুন... রক্তবৃত্ত...

কী মনে হতে তৌফিক আবার উঠে বসল। টেবিলের উপরে তার ফোনটা চার্জে বসানো। অচিন্ত্যরা দিয়ে গিয়েছিল হয়তো।

তৌফিক একবার রজতকে ফোন করল। কয়েকটা কথা বলে ফোন বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। শাম্ভবীর ঘটনাগুলোর কোনও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা সে পাচ্ছে না। এরকম অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে এটা তার মন মানতে চাইছিল না। রজতকে ফোন করার সময় সোনাঝুরির ঘটনাটাও তার একবার মনে পড়েছিল। এবারে কেউ আর তাকে বলেনি যে সে ভুল দেখছে, সে স্বপ্ন দেখছে। তবু তৌফিক ব্যাপারটা কিছুতেই রজতকে জানাতে পারল না। গতকালের শাম্ভবী তার সঙ্গে কী করছে সেটাও না।

শাম্ভবী কি মানসিক রোগী? নাকি, ওর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে? জ্বরক্লিষ্ট দুর্বল মস্তিষ্কে উলটোপালটা ভাবতে ভাবতে তৌফিক একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

রজত এল সেই রাত্রিবেলা। সারাদিন তৌফিক ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। রজত আসতেও সে সোজা হয়ে উঠে বসতে পারল না। দুর্বলভাবে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে রইল। একরাতের মধ্যেই তার চোখ-মুখ বসে গেছে। রজত তৌফিকের অবস্থা দেখে বেশ অবাক হল।

‘কী হয়েছে? আন্টি বলল, জ্বর বাধিয়েছিস। শরীর খুব খারাপ নাকি?’

‘সেরকম কিছু না। সামান্য জ্বর, সেরে যাবে। তোকে যা বলেছিলাম, এনেছিস?’

‘তুই ওই বৃত্তগুলো সম্বন্ধে জানতে চাইছিলিস, তা-ই না? আমি কিছু ফাইল ঘেঁটে পেয়েছি। আরও তিনটে আছে। একটা তারাপীঠের কাছে। আর অন্য দুটোর একটা বাহুলার দিকে, অন্যটা উজানির ওইদিকে। বাহুলারটা মাস দেড়েক আগেকার বলে জানা গেছে। উজানিরটা কবে হয়েছে, সঠিক বলতে পারব না।’

‘শোন। সাঁইথিয়ার ওখানে চৌহাট্টার রাস্তার পাশে, একটা মাটির বাড়ির পিছনে ওই বৃত্ত আমি দেখেছি। একদম নতুন, টাটকা। যদি বৃত্তগুলো অমাবস্যাতে তৈরি হয়, সে ক্ষেত্রে আমি শিয়োর, এটা তৈরি হয়েছে এই গেল অমাবস্যাতেই। আমি পরশু দিন দেখেছি। পুরো রক্তে ভেজা মাটি। অনেকগুলো বলি না দিলে এটা হয় না। সত্যি বলতে কী, অনেক বলি দিলেও অমনটা হতে দেখিনি কখনও। আমাদের লালমাটি বড় তাড়াতাড়ি সবকিছু শুষে নেয়, কিন্তু এটা একদম অদ্ভুত ধরনের। কালকে ওই এলাকায় সাইক্লোন হচ্ছিল। কিন্তু অত বৃষ্টিতেও ওই মাটি থেকে রক্ত ধুয়ে যায়নি। আমার মনে হয়, পুলিশ এখনও একটাও বৃত্ত টাটকা অবস্থায় দেখেনি। দেখলে বুঝতিস, ব্যাপারটা বেশ ভয়ংকর।’

রজতকে তৌফিক ভালো করে বুঝিয়ে দিল জায়গাটা কোথায়। রজত চলে যেতে তৌফিক ভাবির দিয়ে-যাওয়া ওষুধ দুটো খেয়ে শুয়ে পড়ল।

***

অচিন্ত্যর জন্মদিনের দিন সকালে ঘুম ভাঙল তৌফিকের। গতকাল রাত্রে রজত এসেছিল। তৌফিক অনুভব করল, মাথা-ধরাটা কমে গেছে অনেকটাই। জ্বরও নেই বললেই চলে। তবু তৌফিকের বেশ দুর্বল লাগছিল। সে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আবারও খাটে শুয়ে পড়ল।

শাম্ভবীর ব্যাপারে সে একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। এখান থেকে বেরিয়ে দিল্লি চলে যাওয়ার পরে সে বেনামে ফোন করে পুলিশকে জানিয়ে দেবে সোনাঝুরির ঘটনাটা। সেরকম মনে

হলে শাম্ভবীর বাবা-মাকেও বেনামে ফোন করবে। এ ছাড়া এখন তার কাছে আর কোনও রাস্তা নেই। এখুনি কাউকে কিছু বলতে গেলে তার সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।

টেবিলের উপরে বেশ কিছু জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে রজতের দিয়ে-যাওয়া খামটা উঁকি মারছে। কী মনে হতে সে খাম খুলে কাগজগুলো বার করল। চৌহাট্টার ওটা নিয়ে মোট পাঁচটা জায়গায় রক্তবৃত্ত দেখা গেছে।

রজত বেশ ভালো কাজ করেছে। জায়গাগুলোর নাম, ল্যাটিচুড, লংগিচুড পর্যন্ত লিখে দিয়েছে; সঙ্গে বৃত্তগুলোর ছবিও। প্রত্যেক ক-টাই একই রকম তিন থেকে সাড়ে তিন ফিট ব্যাসবিশিষ্ট।

তৌফিক শুয়ে শুয়ে মোবাইলে গুগ্‌ল ম্যাপ খুলে জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করল। আশপাশেই সব ক-টা।

রাখালেশ্বর

পূর্ব কালিকাপুর

নিরল

পুন্ড্র

আর... আর... চৌহাট্টা

এই পাঁচ জায়গাতেই দেখা গেছে রক্তবৃত্ত। তৌফিক কিছুক্ষণ হাঁ করে গুগ্‌ল ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রইল। পাঁচটা জায়গার মধ্যে কোনও কানেকশন খুঁজে পেল না সে। তিনটে মাঠের মধ্যে। দুটো প্রায় লোকালয়ে, যদিও লোকচক্ষুর অন্তরালে। যারাই এটা করুক না কেন, তাদের কাছে ফাঁকা জায়গা বা জনাকীর্ণ এলাকার মধ্যে কোনও তফাত নেই। লোকালয়ে বা মাঠের মধ্যে করলে বোঝা যায়, নতুন করে ভক্ত টানার জন্যে এটা করা হয়েছে। কিন্তু চৌহাট্টায় ওরকম বাড়ির পিছনে জঙ্গলের মধ্যে, কেন?

পাঁচটা পয়েন্টের একটাও কোনও শক্তিপীঠে অবস্থিত নয়। কয়েকটা শক্তিপীঠের ধারেকাছে বটে। তবে রাখালেশ্বর আর কঙ্কালীতলার দুরত্ব বেশ বেশি, যেমন তারাপীঠ থেকে পূর্ব কালিকাপুর। পাঁচখানা বিন্দু দিয়ে কি তন্ত্রমতে কোনও চিহ্ন তৈরি হয়? তৌফিকের ঠিক মনে পড়ল না।

একটু পরে বউদি সকালের জলখাবার দিতে এসে জানাল, 'মণি এসেছে। সিরিনকে দেখছে। আমি বলেছি তোকেও একবার দেখে যেতে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।' তৌফিক উঠে বসল। 'আমার জামাটা দিয়ে যেয়ো।'

একটু পরে দরজায় টোকা পড়ল। মণি গলা বাড়াল। 'আসব?'

'এসো মণিদি।' তৌফিক ডাকল।

মণি এসে তৌফিককে পরীক্ষা করার পরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তৌফিক বুঝল, মণিদি কিছু বলবে। 'এখন তো জ্বর নেই। কয়েকদিন দুর্বলতাটা থাকবে। একটু সাবধানে থাকিস, নয়তো বড়সড়ো অসুখে পড়ে যাবি। শুনলাম, বৃষ্টিতে ভিজেছিলি নাকি খুব?'

'হ্যাঁ, ওই আর কী। এমন ভুলভাল জায়গায় গাড়ি খারাপ হয়ে আটকে গেলাম।' তৌফিক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি আজ তোদের এখানে আসার আগে লতাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অচিন্ত্যই বলল। ওদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে। কী সব শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাচ্ছে। তোকে ডাকেনি? আজ তো অচিন্ত্যর জন্মদিন।'

'ডেকেছিল। যাব না বলে দিয়েছি।' তৌফিক সামান্য উশখুশ করে বলল, 'তা তুমি ও বাড়ি গেছিলে। হঠাৎ কী ব্যাপার?'

'লতার শরীরটা খারাপ হয়েছিল তাই ওরা কল দিয়েছিল।'

'ও আচ্ছা।' তৌফিক চুপ করে গেল।

'তৌফিক, তোরা কি রেজিস্ট্রি করেছিলি?'

'হ্যাঁ। কেন বল তো?'

'লতা আর তুই কি...'

'কী?'

'তোরা কি ইন্টিমেট হতিস?'

আচমকা এই প্রশ্নটার জন্যে তৌফিক তৈরি ছিল না। নিজের অজান্তেই তার মাথা নিচু হয়ে এল, 'হুঁ।'

'এখন কী করবি?'

'ডিভোর্স স্যুট করতে হবে। এ ছাড়া কোনও অপশন নেই তো।'

'সে ক্ষেত্রে তোকে একটা কথা বলার ছিল।'

'কী?'

'লতার আর হপ্তাখানেকের মধ্যেই বেবি হবে।'

'ও!' তৌফিক আপ্রাণ চেষ্টা করল, যাতে তার গলা না কাঁপে।

'তুই বুঝলি না?'

'কী?'

'এটা অ্যাডভান্স ডেলিভারি নয়। নর্মাল।'

'বুঝতে পারছি না। কী বলছ তুমি?'

'লতার অলমোস্ট নয় মাস চলছে।'

'ও। তো আমি কী করব?' তৌফিক কী বলবে বুঝতে পারল না, তারপরেই তার খেয়াল হল। 'নয় মাস! মানে? ওর তো বিয়েই হয়েছে মাস ছয়েক আগে।'

'তৌফিক, বেবিটা বিয়ের আগের।' মণিদি চাপা গলায় বলল।

তৌফিক জীবনে এত অবাক হয়নি। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মণির দিকে, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল। 'ইমপসিবল।'

'কীসের ইমপসিবল? অনেক সময় প্রোটেকশনও কাজ করে না।'

লতা তাহলে এমন ব্যবহার করল কেন? ডিভোর্স চাইল কেন? তৌফিকের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। 'মণিদি তুমি ঠিক জান? মানে কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

'আমি ডাক্তার, তৌফিক। ছ-মাস আর ন-মাসের ফারাক তো চোখে দেখেই বোঝা যায়। আমার অবাক লাগছে, কাকিমা কেন বুঝতে পারল না। তবে এবার তোদের ব্যাপার। তোদের রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছিল, তাই তোর জানা উচিত বলে মনে হল।'

তৌফিকের মনে হল, তার আবার জ্বর আসছে। সে কোনও কথা না বলে চাদর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। মণি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, তারপর ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বছরখানেক আগে রেজিস্ট্রির পরে প্রতি সপ্তাহান্তে অচিন্ত্যকে পড়ানোর অছিলায় তৌফিক চলে আসত গ্রামে। রাতের অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিয়ে উপাধ্যায়বাড়িতে ঢোকাটা কোনও ব্যাপার ছিল না। লতার ডাকে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকবার তারা মিলিত হয়েছে। বলতে গেলে প্রায় নিয়মিতই। লতা কখনওই তৌফিককে কোনও প্রোটেকশন নিতে দেয়নি। কিছু বললেই বলত, ‘ওসব নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বুঝে নেব।’

তৌফিক নিশ্চিত ছিল যে লতা পিল ব্যবহার করছে। লতা কি কখনও ভুল করেছিল?

পঁচিশ

তারকনাথের কথা শুনে সুরমাদেবী রাগে জ্বলে উঠলেন।

বিয়ের সাড়ে ছয় মাস পরে লতা প্রথম বাপের বাড়ি এল। তখন লতাকে দেখেই সুরমাদেবীর সন্দেহ হয়েছিল, পোড়ারমুখি তাদের মানসম্মানে কালি লেপে দিয়েছে। এ সন্তান জয়ন্তর হতেই পারে না।

অবশ্য সে কথা সুরমাদেবী কাউকেই বলেননি। এ কি পাঁচকান করার কথা নাকি? লতাকে তিনি শাসিয়ে রেখেছিলেন, ঘরের বাইরে এক পা-ও না দিতে। আর বাইরের লোকের সামনে বেরনো তো একদমই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। লতা অবশ্য তাঁর সব কথাই মেনে চলছিল।

তবে মেয়েটার আর যা-ই দোষ থাকুক, জামাইকে একদম আঁচলে বেঁধে রেখেছে। কী বুঝিয়েছে কে জানে। জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলে সুরমাদেবীর মনে হয়েছে, জয়ন্ত লতার পেটেরটার আসল পরিচয় জানে না। ডাক্তারটাক্তার দেখাতে মেয়ে নাকি একলাই যেত, একবারও জয়ন্তকে নিয়ে যায়নি। অবশ্য জয়ন্ত নিজের থিসিসের কাজে ব্যস্তও ছিল। লতা কত স্মার্ট মেয়ে, ঘরে-বাইরে সবকিছু একলাই সামলাতে পারে, সেটাই জয়ন্ত উচ্ছ্বাসিত হয়ে জানিয়েছে শাশুড়িকে।

এমনকী, জয়ন্ত আর লতা যখন ফিরেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, তখন মেয়েটা নিজের জন্য একটা আয়া নিয়ে এসেছে সর্বক্ষণের। কোথা থেকে জুটিয়েছে কে জানে। সেই আয়াটাও হাবাগোবা। ঠিক করে কথা বলতে পারে না। সুরমাদেবীর সন্দেহ আছে, ওই আয়াটাও আদৌ কিছু বোঝে কি না। নিজের অবস্থাটা লুকিয়ে রাখার জন্য কোনও ভালো নার্সের ব্যবস্থা না করে, লতাই নিশ্চয়ই ওই আয়াটাকে কাজ দিয়েছে।

কিন্তু বাচ্চা জন্মানোর সময় তো হাসপাতালে যেতেই হবে। আর তখনই সব জানাজানি হয়ে যাবে। বিমলচন্দ্রকে কিছু বলা মানে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। সব থেকে ভালো হয়, ডেলিভারির সময় জয়ন্ত যদি এখানে না থাকে। তাহলে হয়তো কোনওমতে সবকিছু ধামাচাপা দেওয়া যাবে।

আজ সকালে তারকনাথ তাকে ডেকে জানালেন, আগামীকালই নাকি জয়ন্ত আর লতা গৌহাটি ফিরে যাবে ঠিক করেছে। টিকিটও কাটা হয়ে গেছে। ভোরবেলাই বেরিয়ে যাবে। অচিন্ত্যর জন্মদিনের জন্যেই শুধু তারা আটকে আছে।

সুরমাদেবী রাগে জ্বলে উঠলেন, বাবামশাইয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। জয়ন্তরা কালকেই চলে যাবে, তাঁকে জানাননি পর্যন্ত। অবশ্য একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। কারই বা মাথার ঠিক থাকে?

তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে। জয়ন্ত চলে যায়, যাক। এই অবস্থায় লতাকে আমি যেতে দেব না। এই সময় তো মেয়েরা বাপের বাড়িতেই থাকে বাবা।’

তারকনাথ একটু বিরক্ত মুখে চাইলেন সুরমাদেবীর দিকে, ‘লতা তো নিজেই যেতে চাইছে জয়ন্তর সঙ্গে। তুমি কেন বাধা দিচ্ছ, কিছুই তো বুঝছি না। আজকালকার ছেলেমেয়ের বাপ-মায়ের চেয়ে স্বামীর উপরে টান বেশি।’

‘ওরা বাচ্চা মানুষ, কী বোঝে? লতার এখানেই থাকা উচিত। আর এই সময় তো একদমই জার্নি করা উচিত নয়।’ সুরমাদেবী আর কত বোঝাবেন।

‘সমস্যা তো তোমরাই তৈরি করেছ বউমা। লতাকে গুচ্ছ গুচ্ছ তাগা-তাবিজ পরানো। দু-দিন আসতে না আসতেই লতার নামে ওই যজ্ঞ করা। জয়ন্ত এইসব একদমই পছন্দ করছে না। সে খুবই বিরক্ত হয়ে গেছে। আর কালকে সোলাঙ্কীদের সঙ্গে যা বিশ্রী ব্যাপারটা হল। তারপর সে একদমই চায় না তার বউ আর এই বাড়িতে থাকুক। সে আমাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, এত কুসংস্কার সে মেনে নেবে না।’ তারকনাথ জানালেন।

‘আপনি ওদেরকে থাকতে বলুন বাবা।’ সুরমাদেবী শক্ত গলায় বললেন।

‘যেখানে আমার বাড়ির অতিথিদের আমারই ছেলে-বউমা-নাতি অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছে, সেখানে আমি কোন মুখে তাদেরকে থাকতে বলি? কালকে নাতজামাইয়ের সামনেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ঘটেছে। ওর সামনে আমার মাথাটা হেঁট করে দিয়েছ তোমরা।’ তারকনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন।

সুরমাদেবী মাথা নিচু করলেন। গতকাল সত্যিই বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে। বাবামশাইয়ের রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। সবাই মিলে বয়স্ক মানুষটার মানসম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

দিল্লি থেকে কলকাতা, তারপর ট্রেন ধরে সর্বানন্দপুরে আসতে আসতে সোলাঙ্কীর বাবার দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। তারকনাথ অনুরোধ করেছিলেন সেই রাত্রিটা থেকে যাওয়ার জন্যে। সুরমাদেবী বুঝতে পারছিলেন, রাতের বেলা দুটো মেয়েকে নিয়ে অতটা রাস্তা গাড়িতে জার্নি করবে সোলাঙ্কীর বাবা— এটা ভেবেই বাবামশাইয়ের প্রেশার চড়ে যাচ্ছে। সোলাঙ্কীর বাবাও অবশ্য রাজি হয়েছিলেন।

কিন্তু বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটল সন্ধের পরে। সবাই চা-মুড়ি খেতে খেতে গল্প করছে, এমন সময় অচিন্ত্য দেখল মন্দিরে সিঁদুরে দাগ-তোলা কাক কাক পায়ের ছাপ। বাস। ছেলে রাগে অগ্নিশর্মা। সবার সামনে যা নয় তাই বলে গেল শাম্ভবীকে। অচিন্ত্যর মুখ থেকে শাম্ভবীর আগের কীর্তি শুনে সুরমাদেবীরও হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।

সব কথা শুনে ভয়ে-আতঙ্কে সুরমাদেবীও কয়েকটা বাজে কথা বলে ফেলেছিলেন শাম্ভবীকে। বাড়িতে পোয়াতি মেয়ে, তার মধ্যে ওইসব অলক্ষুনে কাণ্ড, মাথার ঠিক থাকে কী করে? বিমলচন্দ্র তো তখুনি শাম্ভবীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাবিজবাবার কাছে, ঝাড়ানোর জন্যে।

সব মিলিয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। সোলাঙ্কীর বাবা রাগ করে দুই মেয়েকে নিয়ে রাত্রিবেলাই কলকাতা চলে গেলেন। তারকনাথের রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। সুরমাদেবী আর কিছু বলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। সুরমাদেবীর একবার মনে হল, বিমলচন্দ্র ওই তাবিজবাবার খপ্পরে পড়ার পর থেকে কেমন যেন বেশিমাত্রায় গোঁয়ারতুমি শুরু করেছেন। গতকালও তিনি শাম্ভবীকে ঝাড়াবার জন্যে ওই তাবিজবাবার কাছেই নিয়ে যেতে চাইছিলেন। ওই সাধুটার প্রতি এত বিশ্বাস সুরমাদেবীর খুব একটা ভালো লাগছে না।

সুরমাদেবী মুখ তুলে দেখলেন তারকনাথকে। ভাবলেন, বাবামশাইকেই সব খুলে বলা যাক, লতার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন সুরমাদেবী। বৃদ্ধকে এই বয়সে নতুন করে কষ্ট দিতে তাঁর মন চাইল না। গত কয়েক মাসে একের পরে এক

ঝড়ঝাপটায় তারকনাথের বয়স যেন বেড়ে গেছে অনেকটা। বুড়ো মানুষটা আরও বুড়ো হয়ে গেছেন। তৌফিকের সঙ্গে নাতনির পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সারা গ্রামের সামনে তারকনাথের মাথা হেঁট করে দিয়েছিল। উপাধ্যায়বাড়ির সম্মান মাটিতে মিশে গিয়েছিল সেদিন।

লতা তৌফিকের সঙ্গে পালিয়ে গেছে— এটা জানার পর থেকে বিমলচন্দ্র যা নয় তা-ই বলেছিল তারকনাথকে। বিমলচন্দ্রর তাড়নায় তারকনাথ কীরকম অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তা সুরমাদেবী স্বচক্ষে দেখেছেন। ওই রাতে বিমলচন্দ্রকে নিয়ে একবার পুলিশ স্টেশন, একবার কলকাতা করে বেড়াচ্ছিলেন তারকনাথ। এখন যদি তিনি জানতে পারেন লতার পেটে ওই তৌফিকের সন্তান! সুরমাদেবী ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠলেন। বৃদ্ধ তারকনাথের হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ করে দিতে ওই খবর যথেষ্ট।

সুরমাদেবীকে ম্লানমুখে বসে থাকতে দেখে তারকনাথ বলে উঠলেন, ‘এত ভেঙে পড়ো না বউমা। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি জয়ন্তকে বলব। দেখি, যদি সে লতাকে আরও কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকতে দেয়। সেরকম হলে আমিই না-হয় পরে গিয়ে লতাকে রেখে আসব। আমার কি সাধ যায় না নাতনিটা এখানেই থাকুক...’ তারকনাথের গলায় অসহায়ত্বের ছোঁয়া।

‘আচ্ছা বাবা। ঠিক আছে।’ মৃদুস্বরে কথাটা বলে সুরমাদেবী চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালেন।

‘আসলে ভয়টা কী জান? পাশের গ্রামেই লাল আছে। মেয়েটাকে আমি বলে-কয়ে রেখে দিলাম। তারপর দেখা গেল, আবার কিছু একটা কেলেঙ্কারি হল। কী হবে তখন?’ তারকনাথ করুণ চোখে তাকালেন সুরমাদেবীর দিকে।

সুরমাদেবী সবকিছুই বুঝতে পারছিলেন। বুঝতে পারছিলেন তারকনাথের অবস্থাটাও। বৃদ্ধ মানুষটাকে আর না জ্বালিয়ে বাইরের উঠোনে বেরিয়ে এলেন সুরমাদেবী।

অনেক কাজ। বিকেলে যজ্ঞ হবে, সেই জন্য সকাল থেকেই তাবিজবাবা আর তার দুই চেলা উঠোনে ব্যবস্থা করছে। গম্ভীর মুখে হাতজোড় করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিমলচন্দ্র। শাম্ভবীর কথাগুলো জানানোর পরে, মূল যজ্ঞের সঙ্গে বাড়িবন্ধনেরও ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন তাবিজবাবা। বিমলচন্দ্রর কাজ আরও বেড়ে গেছে।

***

অচিন্ত্যর জন্মদিনের আগের দিন রাত্রিবেলা উপাধ্যায়বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সোলাঙ্কীরা। চৌহাট্টা থেকে উপাধ্যায়বাড়িতে ফেরার পরই সে বাবাকে ফোন করে। তার খুব অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন লম্বা ঘুম ভেঙে উঠেছে। সমস্ত কথা খুলে বলতে বাবা এক মুহূর্তও দেরি করেনি। পরের দিনই দিল্লি থেকে চলে এসেছিল। অবশ্য কলকাতা থেকে বোলপুর আসতে আসতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা এতটা পথ ফিরতে হবে বলে দাদুই আটকে দেয় তাদের। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বিমলচন্দ্র আর অচিন্ত্যর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে উপাধ্যায়বাড়ি থেকে দুই মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন সোলাঙ্কীর বাবা। তখন রাত্রি প্রায় ন-টা বাজে।

অন্ধকার চিরে দ্রুতগতিতে গাড়িটা ছুটছিল। বাইরে খুব ঠান্ডা। কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না আশপাশ। গাড়ির সব ক-টা কাচ তোলা। পিছনের সিটে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল সোলাঙ্কী। শাম্ভবী কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ব্যবহার করছে। উপাধ্যায়বাড়ি থেকে চলে আসাটা তার পছন্দ হয়নি। সে রাগ করে বসে আছে সামনের সিটে।

বিশুই চালাচ্ছিল গাড়িটা। ঠিকঠাক চালাতে পারলে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তারা কলকাতা পৌঁছে যাবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বিশু হঠাৎ গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল। সোলাঙ্কীর বাবা একটু অবাক হলেন।

'কী হয়েছে বিশু? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

বিশু কিছু বলার আগেই গাড়ির দরজাগুলো খুলে গেল। কয়েকজন লাল কাপড়-পরা লোক সোলাঙ্কীর বাবাকে টেনে নামাল গাড়ি থেকে। সোলাঙ্কী আতঙ্কে চিৎকার উঠল।

বিশু শান্ত পায়ে নামল গাড়ি থেকে। দিগন্তবিস্তৃত শস্যের মাঠ গিলে নিল পয়েন্ট টু টু ক্যালিবার রিভলভারের আওয়াজটা। সোলাঙ্কী বিস্ফারিত চোখে দেখল। বাবা হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তার জামায় একটা কালো ছোপ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে।

বিশু মৃতদেহটাকে ঠোক্কর দিল জুতোতে। সাধুগুলোর দিকে ফিরে বলল, 'পুকুরের পাঁক মাটিতে পুঁতে দিবি। আগের বারের মতো করিস না।'

সোলাঙ্কী থরথর করে কাঁপছিল। তার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

'দুঃখিত, মিস সরকার।' বিশু মৃতদেহটাকে টপকে এগিয়ে এল সোলাঙ্কীর দিকে।

ছাব্বিশ

একরাশ সরুমোটা গলায় ‘হ্যাপি বার্থডে টু ইউ’ গানের মধ্যে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেবাল অচিন্ত্য। বিকেলবেলায় জয়ন্ত একটা কেক কিনে এনেছে। যদিও তাদের বাড়িতে কেক কাটার চল নেই। তার উপরে আজকে যজ্ঞ হচ্ছে। বাড়িতে আমিষ ঢোকানো উচিত নয়। তবু নাতজামাইয়ের আবদারে বাদ সাধেননি তারকনাথ।

চটপট হাততালির রেশ থামতে একটা গম্ভীর গলা দরজার সামনে থেকে বলে উঠল, ‘হ্যাপি বার্থডে অচিন্ত্য।’

ঘরের প্রত্যেকটা মানুষ স্থাণু হয়ে গিয়েছিল। তৌফিক লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। টেবিলের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে হাতের গিফ্‌ট প্যাকেটটা অচিন্ত্যর দিকে বাড়িয়ে দিল তৌফিক। দু-সেকেন্ডের জন্যে অচিন্ত্যর গুলিয়ে গেল সবকিছু। সে চোখের কোণ দিয়ে দেখল, সবার অলক্ষ্যে দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তৌফিক এল সেই শেষ পর্যন্ত!

কফির কাপ নামিয়ে রেখে জয়ন্ত তৌফিকের দিকে তাকাল। ‘আমি জয়ন্ত। আমি আপনাকে চিনি, কিন্তু আপনি হয়তো আমায় চেনেন না। আপনার শরীর কেমন আছে?’

তৌফিক সামান্য হাসল, ‘ভালো আছে।’

ক্লিন শেভ্‌ড্‌ তৌফিককে বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছিল। তাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে দু-দিন আগেই সে অত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

কেক কাটার পরে তারা লাইব্রেরি ঘরে বসে ছিল। তারা বলতে কৃষ্ণা, অচিন্ত্য, জয়ন্ত আর তৌফিক। বাকিরা কেউ উঠোনে, কেউ হয়তো বা দোতলায়। উঠোনে যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। লাইব্রেরি ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাধুগুলোকে। টুকরো টুকরো মন্ত্রোচ্চারণও ভেসে আসছে।

জয়ন্ত আবার চুমুক দিল কফির কাপে। ‘সেদিন আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।’

এবার কৃষ্ণা পাশ থেকে গলা বাড়াল, ‘সত্যি তৌফিকদা। সেদিন কিন্তু জয়ন্তদা না থাকলে আমরা খুব বিপদে পড়ে যেতাম। তুমি তো পুরো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। ওষুধও খাওয়ানো যাচ্ছিল না তোমাকে।’

তৌফিক সামান্য হাসল জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে।

‘জয়ন্তদাই তো তারপরে গাড়ি ড্রাইভ করে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে এল বাড়িতে। অবশ্য আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে।’ অচিন্ত্য নিজেকে জাহির করল।

‘কী হয়েছিল সেদিন আপনার?’ জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল।

‘ধন্যবাদ আপনাকে। সেদিন কী হয়েছিল, আমি নিজেই জানি না।’ তৌফিক জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে হাসল আবার। জয়ন্ত! এই মানুষটাই সব থেকে অদ্ভুত। তৌফিকের থেকে বয়সে পাঁচ-ছয় বছরের বড়ই হবে। তার মতো অতটা লম্বা না হলেও শক্তপোক্ত শরীর। এ কি জানে লতার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা? সবকিছু জেনে-শুনেও তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে! তাকে অজ্ঞান অবস্থায় সাঁইথিয়া থেকে বাড়ি দিয়ে গেছে! আজকের দিনে এত ভালো সরল সাদাসিধে মানুষ হয় নাকি?

'তৌফিকদা জান, ওই বাড়িটার পিছনে একটা রক্তবৃত্ত ছিল।' কৃষ্ণা চারদিকে দেখে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল। 'তুমি ওই রক্তবৃত্তের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।'

'তা-ই!' তৌফিক চমকে ওঠার ভান করল। সেদিন শাম্ভবী তার সঙ্গে কী করেছে, সেটা সে বোঝেনি। অলৌকিক ঘটনার কথা সে কাউকে বলতে চায় না। অন্তত অচিন্ত্যর সামনে তো নয়ই।

'আপনার কথা আমি অচিন্ত্যর কাছে শুনেছি। আপনি পড়াশোনায় খুব ভালো। খেলাধুলাতেও।' নরম গলায় বলল জয়ন্ত।

'জয়ন্তদাও পড়াশোনায় খুব ভালো। গৌহাটি কলেজের প্রফেসর। খেলাধুলাতেও খুব ইয়ে। জয়ন্তদার হেভি মাস্‌ল। ওর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে কেউ পারবে না।' অচিন্ত্য আচমকা বলে উঠল।

কৃষ্ণা অচিন্ত্যর দিকে তাকিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠল, 'কে বলেছে পারবে না। তোকে এক মিনিটে হারিয়ে দিয়েছে বলে জয়ন্তদা কি সবাইকেই হারাতে পারবে নাকি?'

'অন্তত এই ঘরে যারা আছে, তাদেরকে তো পারবে।' অচিন্ত্যর বাঁকা কথাটা স্পষ্ট বুঝল তৌফিক। লতার ব্যাপারে জয়ন্ত আর তৌফিক দুজন দুজনের প্রতিপক্ষ। অচিন্ত্য স্বভাবতই জয়ন্তর দলে। সে চায়, তৌফিক জয়ন্তর কাছে হেরে যাক। অচিন্ত্যর ছেলেমানুষিতে মনে মনে হাসল তৌফিক। নাহ্‌, জয়ন্তর কাছে হেরে গেলে তার কিছুতেই চলবে না।

কৃষ্ণা খরখর করে বলে উঠল, 'তুই আর তৌফিকদা সমান হলি কবে থেকে? একটা ভালো রেজাল্ট করেই ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস একেবারে।'

'আচ্ছা, তবে ওরা পাঞ্জা লড়ুক। দেখা যাক কার শক্তি বেশি। একবার লড়লেই হবে।' অচিন্ত্য গোঁয়ারের মতো কথাটা বলল। আসলে সে কোনওমতেই সহ্য করতে পারছিল না তৌফিককে। জয়ন্তর কাছে তৌফিক হেরে গেলেই অচিন্ত্যর সুখ।

এবার জয়ন্ত হো হো করে হেসে উঠল। 'আরে শালাবাবু, পাগল হলে নাকি? একবার জিতে গেলেই সব জেতা যায় বুঝি?'

তৌফিক গা এলিয়ে দিল সোফায়, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু। একবার জিতলেই সব জেতা যায় না। তবে কাউকে হারাতে হলে পাঞ্জার থেকে সাপলুডো খেলা ভালো। ওটা আবার খানিক ভাগ্যের উপরেই নির্ভর করে কিনা।'

জয়ন্তর হাসি থেমে গেল। 'আপনি কি সত্যিই পাঞ্জা লড়তে চাইছেন নাকি?'

'একদম নয়। শুধু শুধু নেমন্তন্ন খেতে এসে পাঞ্জা লড়তে যাব কেন? আপনি আমার প্রতিপক্ষ নাকি, যে আপনাকে ধরাশায়ী করতে পারলেই আমার আনন্দ হবে?'

'আসুন তবে। দেখা যাক কে কাকে ধরাশায়ী করে।'

জয়ন্ত হাত বাড়াল। তৌফিক খাড়া হয়ে বসে জয়ন্তর হাতে হাত রাখল। না, পাঞ্জা কষার জন্যে নয়। করমর্দনের ভঙ্গিতে। দুজনেই হেসে উঠল।

জয়ন্ত বলে উঠল, 'পাঞ্জা লড়াইটা শালাবাবুর সঙ্গেই থাক। আপনার সঙ্গে না-হয় সাপলুডোই খেলব। দেখা যাক কার ভাগ্যের দৌড় কতখানি।'

তৌফিকের হাতটা দু-হাতে ধরে ঝাঁকাল জয়ন্ত। জয়ন্তর হাতে হাত ঠেকতেই তৌফিক সামান্য চমকে উঠল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। স্পর্শটা তার চেনা!

***

'কত টাকা চাস তুই?' বিমলচন্দ্র দুম করে একটা ঘুষি মারল টেবিলে।

'টাকা! এ তো পুরো আটের দশকের বাংলা সিনেমার ডায়ালগ হয়ে গেল।' তৌফিক হো হো করে হেসে উঠেই সামলে নিল।

'রাস্কেল। এত বড় সাহস তোর!' বিমলচন্দ্র খেপে গিয়ে তেড়ে আসছিল। 'আমি তোকে...'

তৌফিক শীতল চোখে তাকাল, 'কী করবেন? আবার গুন্ডা দিয়ে পেটাবেন আমাকে?'

তারকনাথ বিমলচন্দ্রকে চেপে না ধরলে সে তৌফিককে মেরেই বসত। শুয়োরের বাচ্চাটার এত সাহস! সবার অলক্ষ্যে ঠিক গিয়ে ঢুকেছে লতার ঘরে। বসার ঘরের এক কোণে সুরমাদেবী মুখে কাপড় গুঁজে কাঁদছে। কৃষ্ণা আর অচিন্ত্যকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জয়ন্ত শুধু তৌফিকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সে তৌফিকের কাঁধে হাত রাখল, মৃদু স্বরে বলে উঠল, 'চুপ কর তৌফিক।'

এত টেনশনের মধ্যেও জয়ন্তর অদ্ভুত পারফিউমের গন্ধটা তৌফিকের নাকে ঝাপটা মারল। এই গন্ধটা! এই স্পর্শটা! এই স্বর! এমনকী এই উচ্চারণ! এই লোকটাকে সে চেনে, কিন্তু সে মনে করতে পারছে না কিছুতেই।

বিমলচন্দ্র গোঁ গোঁ করে কী সব বলছিলেন। তারকনাথ তাকে দাবড়ানি দিলেন, 'আহ্। বিমু, তুই থাম্। আমায় কথা বলতে দে।'

তারকনাথ তৌফিকের কাছে এগিয়ে এলেন। আশি ছুঁইছুঁই তারকনাথ সোজা হয়ে দাঁড়ালে তৌফিককেও ছাড়িয়ে যান। 'তোর ব্যাপারটা কী? লতা নিশ্চয়ই তোকে বলেছে, সে তোর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে চায় না। তুই কেন ওকে ডিস্টার্ব করছিস?'

'আমি যা চাই, তা খুব শিগগিরি উকিল আর পুলিশ এসে আপনাদের বলে দেবে দাদু। কোর্টে দেখা হবে।' তৌফিক আর নিজেকে সামলাতে পারল না। এরা লতাকে এত ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, লতা তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে চাইছে না! যে কোনও মূল্যে সে লতাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

'পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিস তুই আমাদের?' বিমলচন্দ্র ফের চেঁচালেন।

তৌফিক ঝট করে ফিরে দাঁড়াল বিমলচন্দ্রর দিকে, 'ভয় দেখানোর কিছু নেই। আমি যা বলছি তা-ই হবে।'

তারকনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'ব্যাপারটা কী লাল? তুই একটু খুলে বলবি? উকিল, পুলিশ! আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

তৌফিক হঠাৎ নিবে গেল। কিছুক্ষণ আগে হোমযজ্ঞের আচার দেখতে সবাই যখন ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন সে চুপিচুপি উঠে গিয়েছিল দোতলায়। ঘরে ঢুকতেই লতা চমকে উঠেছিল। অত্যন্ত ভীত স্বরে বলেছিল, 'কেন এসেছ তুমি? চলে যাও।'

তৌফিকের চাপে পড়ে লতা একসময় স্বীকার করেছিল, বাচ্চাটা তৌফিকেরই। তারপর থেকেই তৌফিকের জেদ চেপে গিয়েছিল। সে এখান থেকে গেলে লতাকে নিয়ে যাবে, নয়তো নয়। কিন্তু লতা কোনও কথাই শুনছিল না।

তৌফিক অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছিল লতাকে, 'আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে। আমার সন্তান তোমার পেটে। তুমি কেন বুঝতে পারছ না, তোমার সঙ্গে জয়ন্তর বিয়েটা কোনও লিগ্যাল সাপোর্টই পাবে না। আমি মানছি, কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। মানছি, তোমায় জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তো তোমাকে নিতে এসেছি, এখন তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ?'

লতার বড় বড় চোখের পলক ছুঁয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কান্না-আটকানো গলায় সে বলেছিল, 'তুমি চুপ কর। বাচ্চার কথা কাউকে বলো না। এখুনি চলে যাও। তুমি কিছু বুঝছ না। ওরা ত্রাটক বন্ধন করাচ্ছে তোমার জন্যে। বশ করবে তোমাকে। গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। পালিয়ে যাও তৌফিক।'

লতার শেষ বাক্যটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো আঘাত করেছিল তৌফিককে, 'তুমি এসব কী বলছ?'

লতা আর কোনও কথা বলতে চায়নি। সে শুধু বারেবারে অনুরোধ করছিল, তাদের বাড়ির জলও যেন তৌফিক মুখে না দেয়।

এর মধ্যেই বামুনপিসি উপরে উঠে এসে লতার ঘরে তৌফিককে দেখে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

তৌফিক একবার আড়চোখে তাকাল বিমলচন্দ্রর দিকে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, কেন লতা এতটা ভয় পেয়ে আছে। লতা বলছিল, এরা তাকে বশ করবে, কীসব 'ত্রাটক বন্ধন' করাচ্ছে। ওই সমস্ত ওঝাগিরিতে তৌফিক বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে যদি এখন তাদের রেজিস্ট্রি আর লতার প্রেগন্যান্সির সত্যিটা বলে দেয়? তাহলে কি বিমলচন্দ্র লতাকে তার সঙ্গে যেতে দেবে? যদি না দেয়? যদি লতাকে আটকে রেখে এই লোকটা মানসিক অত্যাচার করে!

তৌফিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। কী কারণে লতা ভয় পাচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু যাকে সে ভয় পাচ্ছে, তাকে সরানোর ব্যবস্থা তৌফিক করবে।

'কী রে...' বিমলচন্দ্র উচ্চারণের অযোগ্য একটা গালাগালি দিল। 'বাক্যি আটকে গেল কেন? আমাদেরই উচিত তোকে পুলিশে দেওয়া। একটা বিবাহিত মেয়ের ঘরে ঢুকে তুই তাকে...'

তৌফিক বিমলচন্দ্রকে কথা শেষ করতে দিল না। সে বিমলচন্দ্রর স্বভাব জানে। নিজের মেয়েকে নিয়েও খারাপ কথা উচ্চারণ করতে তার মুখে আটকাবে না। শুনলে বরং তৌফিকেরই মাথা গরম হয়ে যাবে। সে খুব ঠান্ডা গলায় বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। আমায় বাড়ি যেতে হবে।'

'কোথাও যাবি না তুই।' বিমলচন্দ্র খেঁকিয়ে উঠলেন। 'আজই তোকে গারদে ঢোকানোর ব্যবস্থা করব আমি। তোর ওই পুলিশ-বন্ধুও কিস্‌সু করতে পারবে না।'

তারকনাথের ইশারায় জয়ন্ত এবারে বিমলচন্দ্রকে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। সুরমাদেবীও পিছুপিছু চলে গেলেন। রাগে তৌফিকের গা রি রি করছিল। এত কিছুর

পরেও লোকটাকে যে সে মেরে বসেনি সেটাই আশ্চর্যের। তৌফিক ঘর থেকে বেরনোর উপক্রম করতেই, তারকনাথ তাকে আটকাল।

'দাঁড়া লাল। তোকে একটু বসতেই হবে। যজ্ঞের প্রসাদ না নিয়ে তোর যাওয়া চলবে না। হয়েই এসেছে প্রায়।'

তৌফিক অবাক হয়ে তাকাল তারকনাথের দিকে। তারকনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিল। লাইব্রেরি ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, বাইরের উঠোনে এখনও যজ্ঞ হচ্ছে। সেই সন্ধে থেকে শুরু হয়েছে। বিরক্তিতে তৌফিকের মাথাটা আবার গরম হয়ে গেল। এরা কি এখনও তাকে আগের মতোই বাচ্চা ছেলে বলে ভাবে? এইভাবে তাকে ঘরে আটকে রাখবে?

বাইরে আচমকা একটা হইহই আওয়াজ। তৌফিক বাইরের দিকে তাকাল। সাধুগুলো হইহই করে আওয়াজ করছে। যজ্ঞ বোধহয় শেষ হল।

জানলা দিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে তৌফিক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এদের সবার কি মাথা খারাপ? বন্ধন, বশীকরণ, মারণ, উচাটন, তাগা, তাবিজ, প্রসাদ, নৈবেদ্য...

তৌফিক একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দরজা খুলে জয়ন্ত এগিয়ে এল। তৌফিক প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। জয়ন্ত এবার তৌফিকের হাত দুটো চেপে ধরল। 'বাবার ব্যবহারে কিছু মনে করো না তৌফিক! প্লিজ, তুমি একটু শান্ত থাক। আর কিছুক্ষণ। একটু প্রসাদই তো শুধু।'

'আহ্।'

'কী হল?' জয়ন্তর চোখে উদ্‌বেগ।

জয়ন্তর হাতে কিছু একটা ছিল, আংটি সম্ভবত। তার ধারালো কোনায় লেগে তৌফিকের আঙুল কেটে গেছে।

'ওহ্, সরি সরি।' জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'ও কিছু না।' তৌফিক আঙুলটা মুখে পুরে চুষে নিল। রক্ত বেরচ্ছে। তৌফিক এখনও বুঝতে পারছে না, এর সঙ্গে কোনও বাজে ব্যবহার করা উচিত হবে কি না। দরজা খোলা। বেরিয়ে গেলেই হয়। জয়ন্ত কি তাকে আটকাবে?

তারকনাথ আর সুরমাদেবী ঘরে ঢুকে এলেন। সুরমাদেবীর হাতে একটা গ্লাস, আর থালায় সামান্য খাবার।

'লাল।' তারকনাথ একটু গলাখাঁকারি দিল। 'এই শরবতটা একটু খেয়ে নে। আমি বলছি, এই শরবতটা তোর কোনও ক্ষতি করবে না।' মিনতি ঝরে পড়ল তারকনাথের কণ্ঠে।

তৌফিক কোনও কথা না বলে দরজার দিকে পা বাড়াল।

সুরমাদেবী প্রথমে ভয়ের চোটে দু-পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর তৌফিককে দরজার দিকে এগতে দেখে, তিনি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে তৌফিকের হাত চেপে ধরলেন, 'কেন তুমি আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে চাইছ বারেবারে? এটা খেলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না, বিশ্বাস কর। মারণ করার জন্যে অনেক তান্ত্রিক বলেছিল, কিন্তু আমরা তা

চাইনি। এটা শুধু কাটান-ছেঁড়ানের জন্যে। এটা খেলে তোমার আর আমার মেয়ের কাছে আসতে ইচ্ছা করবে না।'

তৌফিকের হাসি পেল। উফ, এরা কোন যুগে পড়ে আছে! এদের বাড়িতে পা দিলে তার মনে হয় না সে একবিংশ শতাব্দীতে বাস করে। তৌফিক হাত ছাড়িয়ে নিল। বিমলচন্দ্র কোথায় গেল? বাইরে উঠোনে তিনটে সাধু দাঁড়িয়ে। সে জয়ন্তর দিকে তাকাল একবার, তারকনাথের দিকেও। এরা কি তাকে আটকাবে? জোর করে খাওয়াবে ওই প্রসাদ?

তৌফিক দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। একবার পিছন ফিরে দেখল, সুরমাদেবী এগিয়ে আসতে চাইছিল, কিন্তু তারকনাথ তাকে আটকে দিলেন। ফরসা মানুষটার মুখ থমথম করছে রাগে। তৌফিক ওঁর অনুরোধকে অবজ্ঞা করেছে— এটা যেন তারকনাথ মানতে পারছিলেন না। তৌফিকের একটু খারাপই লাগল। এই বৃদ্ধ মানুষটাকে সে অপমান করতে চায়নি।

উপাধ্যায়বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে সাঁকোর দিকে হাঁটা লাগাল সে। ব্যাপারটা এত বাজেভাবে শুরু হয়ে এত শান্তভাবে মিটে যাবে— এটা সে ভাবতেই পারেনি। সে ভেবেছিল, অন্তত জয়ন্ত তাকে আটকানোর চেষ্টা করবে। ওই যজ্ঞের প্রসাদ সে খেতেই পারত। ওসবে সে বিশ্বাস রাখে না। কিন্তু তার ইগো হার্ট হয়েছে। ওই বাড়িতে দাঁড়িয়ে ওদের কথামতো কাজ করতে সে পারবে না।

'দাঁড়াও।' একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে হঠাৎ তৌফিকের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। তৌফিক স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

অন্ধকার ফুঁড়ে জয়ন্ত এসে দাঁড়াল তার সামনে। জয়ন্তর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে ল্যাম্পপোস্টের আলোয়। তৌফিকের কেমন একটা ঘোর ঘোর লাগছে। বন্ধ হয়ে আসছে চোখের পাতা। গন্ধটা আবারও ঝাপটা মারল তৌফিকের নাকে।

প্রথম আলাপে জয়ন্ত তাকে বলেছিল, 'আমি আপনাকে চিনি, কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না।'

তৌফিক জয়ন্তকে চেনে। এখুনি তৌফিকের মনে পড়েছে, কীভাবে সে জয়ন্তকে চেনে। এতক্ষণ ধরে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না।

জয়ন্ত সামান্য হাসল। 'ত্রিশিরা ত্রাটক সূচিকাভরণ। ওটা খাওয়ায় না তৌফিকবাবু। ওটা রক্তে মিশিয়ে দিতে হয়। তৌফিকবাবু, আপনার খেলা শেষ।'

তৌফিক অনুভব করল, মাঘের কোপাইয়ের থেকেও ঠান্ডা চোরা একটা স্রোত তার শরীরের উপর থেকে নিচের দিকে বয়ে যাচ্ছে। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তৌফিক যেন কাঠের পুতুল হয়ে গেল। ল্যাম্পপোস্টের আধো আলোছায়াতে তাকে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো দেখতে লাগছিল।

তৌফিকের বোধজ্ঞানহীন নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত সামান্য হাসল। বশীকরণ কাজ করছে। উত্তেজিত কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল জয়ন্ত। পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বার করল। তৌফিকের হাতে দিল ছুরিটা। তৌফিক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে কী যেন এক আদেশের অপেক্ষায়।

‘নিজের বাম পায়ের কড়ে আঙুলটা কেটে ফেল।’

তৌফিকের কোনও ভাবান্তর হল না। সে ধীরে ধীরে উবু হয়ে বসে জুতোটা খুলল। মাটিতে বাম পা-টা রাখল। ছুরিটা বসিয়ে দিল কড়ে আঙুলের উপর। পরমুহূর্তে আঙুলটা ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল কাঁকুরে রাস্তার উপরে। রক্ত বেরিয়ে এল ফিনকি দিয়ে।

তৌফিকের গলা থেকে একটা টুঁ শব্দও বার হল না।

কালসিদ্ধা

চোদ্দো মাস আগে, নভেম্বর ২০১৬
(ইথিয়োপিয়ার অরণ্য, আফ্রিকা)

‘বীজের রক্তে আলপনাটা আঁক।’ যোগিনী কালসিদ্ধার মুখ থেকে কথা পড়তে পেল না, পাতরগণ্য যুবকটি কাজ শুরু করে দিল।

সে জানে, অমাবস্যার রাত্রে বীজের রক্তে বিশেষ জ্যামিতিক আলপনা এঁকে, বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করলে নরকের দ্বার খুলে যায়। সেই বৃত্তে আহুতি দিতে হয় মানুষকে। আজ একটু পরেই অমাবস্যা তিথি শুরু হবে। কিন্তু রক্তবৃত্তে কাকে আহুতি দিতে চাইছেন যোগিনী!

‘আলপনা স্থাপন হয়ে গেলে, আলপনার মাঝখানে রৌম্যশিশুটাকে রেখে দাও।’ যোগিনী আবার নির্দেশ দিলেন।

পাতরগণ্য যুবকটি কাজ শেষ করে হাত মুছে উঠে দাঁড়াল। বাইরের চিৎকারে একবার চমকে উঠল সে।

বাড়িটাকে ঘিরে স্বর্গদেওরা জড়ো হয়েছে গত দু-দিন ধরে। ওরা কিছুতেই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারবে না। যোগিনী স্থানবন্ধন করে রেখেছেন বাড়িটাকে।

‘মা! আমরা অন্য পাতরগণ্য সাধকদের খবর দিচ্ছি না কেন? মাত্র তিনজন আছি আমরা। বাইরে স্বর্গদেওদের সংখ্যা অনেক বেশি। ওরা ভৈরবকে নিয়ে আসছে। রৌম্যশিশুটিকে আমরা তিনজন রক্ষা করতে পারব বলে আপনার মনে হয়?’ পাতরগণ্য যুবকটি উদ্‌বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

যোগিনী হেসে মাথা নাড়লেন, ‘না। তোমরা পারবে না, কিন্তু আমি পারব।’

পাতরগণ্য যুবকটি সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যোগিনী কালসিদ্ধার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা তার উচিত হয়নি। কালসিদ্ধা রুষ্ট হলে তার বিপদ।

যোগিনী মনে মনে হাসলেন। অন্য পাতরগণ্য সাধকরা জানে না, আজ ইথিয়োপিয়ার এই বনজঙ্গলে একটা রক্তবৃত্ত স্থাপিত হতে চলেছে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে সমস্ত সূত্র মুছে ফেলাই তাঁর নিয়ম। যোগিনী নিজের বাঁ হাতকেও জানতে দেন না ডান হাতে কী কাজ করা হচ্ছে।

প্রতিবার রৌম্যজাগরণের পরে তিনি নিয়ম মেনে সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে হত্যা করেন। আজও কাজ শেষ হওয়ার পরে ওই তিনজন পাতরগণ্য সাধককে তিনি হত্যা করবেন। অবশ্য আজ এখানে কোনও রৌম্যজাগরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আজ এখানে শুধু একটা রক্তবৃত্ত স্থাপন হবে। একবার খোলা হবে নরকের দ্বার। আহুতি দেওয়া হবে বিশেষ একজনকে।

যোগিনী গত তিন বছর ধরে অপেক্ষা করে আছেন আজকের দিনটার জন্য। কাজ শেষ হয়ে গেলে পাতরগণ্য যুবকটিকে ঘরের বাইরে বের করে দিলেন যোগিনী। এখন শুধু অপেক্ষা। অপেক্ষা ভৈরবের।

***

স্থানবন্ধনটা দেখে বড় অবাক হল চন্দ্রমৌলি। যদিও এখনও সে জানে না তার নিজের নাম। স্মৃতি হারিয়ে গেছে তার। ভৈরব বলেই ডাকে তাকে সবাই। সে-ও নিজেকে ভৈরবই বলে।

বনজঙ্গলের মাঝখানে একটা কাঠের বাংলো। গত দু-বছর ধরে রৌম্যটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে স্বর্গদেওরা। মাত্র কিছুদিন আগে তারা খবর পেয়েছে, রৌম্যটাকে ইথিয়োপিয়ার এই বনজঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। গত কয়েকদিনের লড়াইতে কোণঠাসা হয়ে পাতরগণ্যরা উঠে গেছে ওই বাড়ির মধ্যে। স্বর্গদেওরা জঙ্গলের মধ্যে এই বাড়িটায় ঢোকার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু সক্ষম হয়নি। তা-ই সাহায্যের জন্য ভৈরবকে ডেকে পাঠিয়েছে তারা।

স্থানবন্ধন বহু রকমের হয়। বিভিন্ন শক্তিতে স্থানবন্ধন বিভিন্ন রকমের। কিছু কিছু স্থানবন্ধন মানুষের মনকে ভুল পথে চালিত করে। মানুষটা যত সেই স্থানের মধ্যে ঢুকতে চায় বা বেরতে চায়, ততই সে গোলকধাঁধার মতো পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা স্থানবন্ধনে পাহারায় বসানো হয় প্রেতশক্তিকে। অলৌকিক সেই প্রেতের দল মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। সাধারণ নিম্নশ্রেণির সাধকরা ওইধরনের স্থানবন্ধন ব্যবহার করে। ওই স্থানবন্ধনকে কাটাবারও প্রক্রিয়া আছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানবন্ধন অদৃশ্য দেওয়ালের মতো কাজ করে। সাধকের ইচ্ছা ছাড়া কেউ সেই সীমারেখা পেরতেই পারে না। এই দ্বিতীয় শ্রেণির স্থানবন্ধন অত্যন্ত শক্তিশালী সাধক ছাড়া আর কেউ স্থাপন করতে পারে না।

স্থানবন্ধনটা পেরিয়ে কাঠের বাংলোটায় ঢুকতে ঢুকতে কী এক অজানা আশঙ্কা গ্রাস করল ভৈরবকে।

ছিমছাম কাঠের বাড়িটা যেন একটা মারাত্মক দুর্যোগ নিয়ে অপেক্ষা করছে ভৈরবের জন্য। একবার তার মনে হল, পালিয়ে যায়। ফিরে যায় স্বর্গদেওদের কাছে। পরক্ষণেই সে শ্বাস টানল। না, এখন পালালে রৌম্যটাকে আবার কবে হাতে পাওয়া যাবে, তার ঠিক নেই। রৌম্যগুলো বড় হয়ে গেলে সে আর মারতে পারবে না। ছোট থাকতে মেরে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বাড়িটার মধ্যে তিনজন পাতরগণ্য লুকিয়ে ছিল। ভৈরবের কাছে অবশ্য সেটা কোনও সমস্যাই না। সে প্রথমে মানুষগুলোর মনে প্রভাব বিস্তার করল। পাতরগণ্যগুলোর কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। তারপর এক-এক করে ছুরি দিয়ে গলার নলিগুলো কেটে দেওয়া শুধু।

পাতরগণ্য তিনটেকে মেরে একটু স্বস্তি বোধ করল ভৈরব। আর কোনও বাধা নেই। এবার রৌম্যটাকে মেরে দিলেই তার কাজ শেষ। একদম শেষের ঘরে ঢুকে রৌম্যটাকে

খুঁজে পেল সে। কাঠের মেঝেতে ছোট্ট একটা বেতের ঝুড়িতে রাখা আছে বাচ্চাটাকে। একদম ফুটফুটে, বছর দুয়েক বয়স হবে কি হবে না। ভৈরব নিঃশ্বাস বন্ধ করল। এই সময়গুলোতেই তার সব থেকে বেশি কষ্ট হয়। এরকম দেবদূতের মতো বাচ্চাগুলো কিনা শয়তানের প্রতিরূপ!

বেতের ঝুড়িটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ভৈরব। রৌম্যশিশুটার মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিল সে। বাচ্চাটার ধারালো শ্বদন্তে আঙুল কেটে গেল তার। সাধারণ অস্ত্র ভৈরবের ত্বক ছেদ করতে পারে না, কিন্তু রৌম্য তো সাধারণ নয়। তারাও অলৌকিক শ্রেণিভুক্ত। এই শিশুর ক্ষুদ্র শ্বদন্তগুলো যে কোনও দৈবী অস্ত্রের সমান।

ভৈরবের রক্ত ফিনকি দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে শিশুটার মুখে। গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে ক্ষুদ্র শরীরের কন্দরে। ভৈরবের রক্তের স্বাদ পেয়ে শিশুটার স্বাভাবিক মানুষ শরীর পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ঘোর নীলবর্ণে। কাঁটা কাঁটা চামড়ায় মোড়া এক নারকীয় দেহে।

ছোট বাচ্চাটা তীক্ষ্ণস্বরে কেঁদে উঠে কামড়ে ছিঁড়ে নিতে চাইল ভৈরবের আঙুলটা। সে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল বাচ্চাটার মুখ থেকে।

চন্দ্রমৌলির কাছেও নেই কোনও দৈবী অস্ত্র। নিজের রক্ত ব্যবহার করেই সে মারে রৌম্যদের। মহাকালকে স্মরণ করে নিয়ে সে মন্ত্রোচ্চারণ করল। রৌম্যশিশুর শরীরে মিশে-যাওয়া ভৈরবের রক্তকণিকাগুলো মুহূর্তে জ্বলে উঠল। বাচ্চাটা ছাই হয়ে মিশে গেল বাতাসে।

পরক্ষণেই নিজের শরীরে একটা জ্বালা অনুভব করল ভৈরব। সে বুঝতে পারল না যে 'উমা'র দাঁতের তীব্র বিষ মিশে গেছে তার শরীরে। আচ্ছন্নের মতো সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির উপরে। আর তখনই নিজের জীবনের বিভীষিকাকে আবার দেখতে পেল ভৈরব। মহাযোগিনী কালসিদ্ধা!

যোগিনী এতক্ষণ আড়াল থেকে অপলক দৃষ্টিতে দেখছিলেন ভৈরবকে। দিকরং নদীকূলের সেই বালক গত কয়েক বছরে ক্রমে কিশোর হয়ে উঠেছে, পা বাড়িয়েছে যৌবনের দিকে। একে ধরার জন্য তিনি গত তিন বছর ধরে ঘুঁটি সাজিয়েছেন। রৌম্যশিশুটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, যাতে ওই ভৈরবকে একাকী ধরা যায়।

'উমা'র তীব্র বিষে ভৈরব আচ্ছন্ন হয়ে পড়ামাত্র আড়াল থেকে যোগিনী কালসিদ্ধা বেরিয়ে এলেন ঘরের মধ্যে। বীজের রক্তে আলপনা আঁকাই ছিল ঘরের মধ্যে। তার মধ্যেই ভৈরবের আচ্ছন্ন দেহটা পড়ে আছে। এখন শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেই নরকের দ্বার খুলে রক্তবৃত্ত টেনে নেবে ভৈরবকে।

কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করার আগেই ভৈরব হঠাৎ ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এল যোগিনীর দিকে। হতভম্ব যোগিনীকে এক ধাক্কায় ঠেলে দিল আলপনা-আঁকা স্থানটার দিকে। পরক্ষণেই উচ্চারণ করল সেই বিশেষ মন্ত্র।

দীর্ঘ সাড়ে আট বছর আগে দিকরং নদীর তীরে যোগিনী কালসিদ্ধাকে এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুনেছিল সে। একবার শোনামাত্রই স্মৃতিতে সে আমরণ গেঁথে নিয়েছিল মন্ত্রটা। বীজের রক্তের আলপনায় এই বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় নরকের দ্বার।

পৃথিবী থেকে পরলোকে যোগাযোগের পথ। মুহূর্তের মধ্যে যোগিনীর দেহকে গ্রাস করল রক্তবৃত্তটা। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল রক্তবৃত্ত। কাঠের মেঝেতে লেগে রইল শুধু বৃত্তাকার রক্তের দাগ।

ভৈরব ধপ করে বসে পড়ে কাঠের মেঝের একপাশে। সে অনুভব করছে, তার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে বিষটা। চিন্তাশক্তি ক্রমে লোপ পেয়ে আসছে। কী এক অসম্ভব মানসিক শক্তিতে, সে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য পরাহত করতে পেরেছিল তীব্র বিষটাকে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে একটা সরু হাসির রেখা ফুটে উঠল ভৈরবের ঠোঁটে। যোগিনী কালসিদ্ধাকে নরকে পাঠাতে পেরেছে সে। এই মুহূর্তে যোগিনীর ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। রক্তবৃত্তের একপাশে গড়িয়ে পড়ল ভৈরবের জ্ঞানহীন দেহ।

স্থানবন্ধন উঠে যেতেই সাধী সর্বাগ্রে ছুটে এল বাংলো বাড়িটার মধ্যে।

সাধী বিস্ফারিত চোখে দেখছিল, তাদের চিরপরিচিত ভৈরবের রূপ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। নক্ষত্রের আলোয় শুয়ে আছে এক অচেনা শ্বেতকায় তরুণ।

বর্তমান সময়কাল, জানুয়ারি ২০১৮

সাতাশ

রক্তে ভেসে যাচ্ছিল তৌফিকের পা। রক্ত মিশে যাচ্ছিল লালচে মাটিতে। জয়ন্ত দ্রুত পকেট থেকে খানিকটা তুলো আর গজ কাপড় বার করে তৌফিককে দিল।

'বেঁধে নে। সোজা বাড়ি চলে যা। ভোরবেলা আমি ডাকলে সোজা চলে আসবি বোলপুর স্টেশনের কাছে। তবে যতক্ষণ না ডাকব, ততক্ষণ বাড়ি থেকে বেরবি না, কারও সঙ্গে কথাও বলবি না।'

জয়ন্তর নির্দেশমতো তৌফিক পা-টা ব্যান্ডেজ করে নিল, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল সাঁকোর দিকে। জয়ন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তৌফিক কোপাইয়ের সাঁকোটা পার হয়ে মোহাচ্ছন্নের মতো হেঁটে যাচ্ছে। এতক্ষণে জয়ন্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। উফ, আরেকটু হলেই সমস্ত কিছু ভন্ডুল হতে বসে ছিল। আগামী পাঁচ দিনের জন্যে সব নিশ্চিন্ত।

পাঁচ দিন। এখনও পাঁচ দিন সবকিছু সামলে রাখতে হবে। জয়ন্ত পরবর্তী পদক্ষেপের ছকটা মনে মনে ঝালিয়ে নিল। আচমকা ফোন বেজে উঠল তার পকেটে।

'হ্যালো।'

'বিশু বলছি। কাজ মিটল? বশ হল?'

'হবে না! আমি তো বলেছিলাম সব থেকে শক্তিশালী প্রক্রিয়া এটা। এদিকটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না। পাঁচ দিন বাছাধন কিছু করতে পারবে না। শেষ মুহূর্তে ওটাকে ডেকে নিয়ে গেলেই হবে। তোর ওদিকের খবর কী?' জয়ন্ত বলে উঠল।

'সব ঠিক আছে।'

'শুধু শুধু বাপটাকে মারতে গেলি কেন?'

'সমস্যা বাড়াতে চাই না। নেহাত সোলাঙ্কীকে দিয়ে ওদের মাকে আর ওই কৃষ্ণাকে ফোন করাতে হচ্ছে, নয়তো ওটাকেও...' বিশু জানাল।

জয়ন্ত সিগারেটে একটা সুখটান দিল। বছরখানেক আগে বিশুকে ঢোকানো হয়েছিল সোলাঙ্কীদের বাড়ির ড্রাইভার হিসাবে। প্রতি মাসে শাম্ভবীর রক্ত এনে দিত বিশু। ছেলেটা যথেষ্ট কাজের।

'সেদিন সোনাঝুরিতে লাশটা সরালি না কেন?' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল।

'সরাব কী করে? অমন কিছু যে ঘটবে তা কি আগে থেকে জানতাম? ওই তৌফিকটা সবসময় গায়ের সঙ্গে লেপটে রইল। অবশ্য ওটাকে যা ভয় দেখিয়েছিলাম, তাতে ও পুলিশকে কিছুই বলত না। তবুও গুরুজি বলল, সাবধানের মার নেই। লাশটা এখন সরিয়ে

দিলে ওই ছেলের সন্দেহ হতে পারে। ওই মেয়ের একটা হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজন হবে, সেটা কি জানা ছিল না?'

'তুই তো জানিস, গুরুজি পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। সেই যোগাযোগ কখনওই এত সুচারু হয় না। মা কালসিদ্ধা স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, শেষ কয়েকদিন শাম্ভবীকে উনি বশীভূত রাখবেন। কিন্তু কখন কী প্রয়োজন হবে, সে ব্যাপারে কিছু বলেননি। তবে কোনও কারণে মা কালসিদ্ধা ওটাকে বশীভূত করে রাখতে পারেননি। সোনাঝুরির ঘটনাটার পরে কোনও কারণে শাম্ভবী মা কালসিদ্ধার আওতার বাইরে চলে যায়।'

'এটা কেউ বুঝতে পারেনি?'

'একদমই না। আচ্ছা! সেদিন তারাপীঠ বেড়াতে গিয়ে কী করেছিল ওই বীজ, শাম্ভবী? কিছু বুঝতে পেরেছিলি?'

'কিচ্ছু বুঝিনি। মেয়েটা কখন আমার পেট থেকে কোথায় কোথায় রক্তবৃত্ত তৈরি করেছি, সেটা টেনে বার করেছে তা-ও বুঝিনি। একটা কেমন যেন মানসিক বিভ্রমের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেছিল। সবাইকে ভুলিয়ে দিচ্ছিল সবকিছু। সবাইকে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য করছিল। ও ইচ্ছা করেই আমাকে সেদিন তোদের সঙ্গে যেতে দেয়নি তারাপীঠে। অবশ্য ও তোদের নিয়ে তারাপীঠ চলে যাওয়ার পরে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। সেদিন তোদের গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়া, অত ঝড়বৃষ্টি, গাছের ডাল ভাঙা; সবই মানসিক বিভ্রম। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে ও তোকে ভাবতে বাধ্য করেছিল যে তুই অসুস্থ। কিন্তু সেইদিন মেয়েটা যে ঠিক কী করেছে তৌফিকের সঙ্গে, সেটাই বোঝা গেল না।'

'অথচ তার পরের দিন থেকে ও ওরকম শান্ত হয়ে গেল কী করে? সারাক্ষণ শুধু ঘুমাচ্ছে।'

'ওর সমস্ত শক্তি ও শেষ করে ফেলেছে ওই দিনই। এখন শাম্ভবী সম্পূর্ণভাবে যোগিনী কালসিদ্ধার বশীভূত। আর কিছুই করতে পারবে না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিশু বলল, 'তবে ওদেরকে ওই বাড়ি থেকে বের করে আনাটা সুপার্ব হয়েছে। আমি ভাবছিলাম, ওরা বুঝি রাত্রে ওখানেই থেকে গেল। দিনের বেলা ওদেরকে সরিয়ে আনাটা খুব সমস্যার হত।'

'গুরুজি প্ল্যানটা একদম ঠিকঠাক দিয়েছিল। খুব কাজে লেগেছে। সুযোগ বুঝে সন্ধ্যাবেলা লুকিয়ে মন্দিরে ওই পায়ের ছাপটা এঁকে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেটা দেখে ভিতুরাম অচিন্ত্যটা হট্টগোল শুরু করে দিল। বাস। তারপরে আগুন-ঘি সব একসঙ্গে। আমি অবশ্য একটু টেনশনে ছিলাম। কৃষ্ণা না আবার ওদের সঙ্গে চলে যেতে চায়। তখন আরেক সমস্যা হত। সেটা হয়নি, বাঁচোয়া।' জয়ন্ত বলল।

'মেয়েটাকে কখন বের করে আনছ ওই বাড়ি থেকে?'

'আজ ভোরেই। তুই রেডি থাকিস। তৌফিক এমন ঝামেলা করেছে আজকে উপাধ্যায়বাড়িতে গিয়ে। কারও আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হবে না। কলকাতা যাওয়ার পথে

প্রাক্তন প্রেমিকের দ্বারা লতা কিডন্যাপ।' খিকখিকিয়ে হেসে উঠল জয়ন্ত। পরক্ষণেই ফিসফিস করে বলল, 'এই, এখন রাখছি। ওরা বেরচ্ছে উপাধ্যায়বাড়ি থেকে।'

ফোনটা কেটে দিল জয়ন্ত। উপাধ্যায়বাড়ি থেকে তিনজন সাধু বেরিয়ে আসছেন। কোপাইয়ের কাছাকাছি এসে জয়ন্তর সামনে দাঁড়ালেন তারা। জয়ন্ত সামান্য ঝুঁকে প্রণাম করল।

'ফল হয়েছে?' একজন সাধু জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। ওই ছেলে এখন আমার বশে।'

'জয় যোগিনী কালসিদ্ধা।' তাবিজবাবা বলে উঠলেন।

'জয়।' চাপা গলায় জয়ধ্বনি দিল বাকি তিনজনে।

আঠাশ

'হ্যালো।' একটা অপরিষ্কার ঘুম-জড়ানো আওয়াজ ভেসে এল ফোনের অন্য ধার থেকে।

'রজত। আমি তৌফিক বলছি।'

'এত রাত্রে! কী হয়েছে?'

'তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'হুঁ। বল্।'

'আমার আর লতার রেজিস্ট্রি হয়ে গেছিল। আমি লিগ্যাল স্টেপ নিতে চাই।'

'কী?' ফোনের অন্য প্রান্ত একটা সংক্ষিপ্ত ধ্বনি তুলে স্তব্ধ হয়ে গেল।

'হ্যালো হ্যালো। রজত, শুনতে পাচ্ছিস? আমি উপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে লিগ্যাল স্টেপ নিতে চাই।'

'গান্ডু, তোদের রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে, আগে বলিসনি কেন? তোর তো একদম প্রথমেই এটা আমাকে বলা উচিত ছিল।'

'আমি জয়ন্ত আর বিমলচন্দ্রর বিরুদ্ধে এফআইআর করলে তুই তো ওদেরকে লকআপে ঢোকাতে বাধ্য, তা-ই না? ওরা আমার লিগ্যাল ওয়াইফকে জোর করে আবার বিয়ে দিয়েছে। অন্য লোকের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করেছে।'

'তুই কি জয়ন্ত আর লতার বাবাকে জেলে পুরতে চাইছিস?' রজতের গলাটা চিন্তিত শোনাল।

'হ্যাঁ।'

'তুই এফআইআর করতেই পারিস। সে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই জয়ন্ত আর লতার বাবাকে তুলে আনব। কিন্তু বন্ধু হিসাবে আমি তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই, এতে কি লতার মত আছে?'

'লতার মত থাকাটা কি জরুরি?' তৌফিকের অধৈর্য গলা শোনা গেল।

'না। মানে তুই এফআইআর করলেই হবে কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে লতা অন্য কিছু বললে ব্যাপারটা ফেঁসে যাবে। তা-ই বলছিলাম, লতার সঙ্গে কথা বলে...'

'রজত, আমি এফআইআর করার কতদিনের মধ্যে তোরা অ্যাকশন নিতে পারবি?'

'ওয়েল। এসব ক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্ট।'

'গুড। তুই ওদেরকে লকআপে ঢোকা। তারপরে আমি দেখছি।'

'ওকে। কাল সকালে তুই তোদের রেজিস্ট্রি পেপারটা শো করে একটা এফআইআর করে দিয়ে যা থানায়।'

'একটু প্রবলেম আছে। আমি বাড়ি থেকে বেরনোর কন্ডিশনে নেই।'

'তাহলে আর কী করার আছে, দু-দিন পরে এফআইআর কর্।'

'না। না।' তৌফিক প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'দে উইল কিল হার। দে উইল কিল হার।'

কলটা কেটে একটু দম নিল তৌফিক। জয়ন্তকে সে সাধারণ অবস্থায় কোনওদিনই চিনতে পারত না। কারণ সে তাকে কোনওদিন চোখে দেখেনি। যারা তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল,

তারা সারাক্ষণই তার চোখ বেঁধে রেখেছিল। অনেক পুলিশি টর্চারের গল্প সে শুনেছিল রজতের কাছে। সে নিজে ছোট থেকে ক্যারাটে শিখেছে। প্রচুর মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা তার আছে, এমনকী হাড় ভাঙারও। কিন্তু এই লোকগুলো জানে, কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে হয় কাউকে। এত বিভীষিকাময়, যন্ত্রণাময় দিনরাত সে কোনওদিন কাটায়নি।

একদিন, দুই দিন, তিন দিন... তার কোনও হিসাব ছিল না। সব থেকে বড় ছিল অনিশ্চয়তা। ওরা তাকে মারছিল, টর্চার করছিল একটাও কথা না বলে। সে যেন একাকী শব্দহীন, আলোহীন, যন্ত্রণাময় একটা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। মনেই হচ্ছিল না তার আশপাশে কোনও মানুষ আছে। শুধু তার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল আগুনের হলকার মতো রবারের পাইপ বা লাঠি। বস্তুগুলোর বাতাস কাটার শব্দে তার আতঙ্ক বাড়ছিল বই কমছিল না। শেষের দিকে অসহ্য যন্ত্রণায় অনুভূতিবোধটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছিল।

শুধু লতার কথা ভেবেই তখনও মনে জোর আনছিল সে। সেই সময়ই এই লোকটা আসে। বাকিদেরকে থামতে বলে। হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরে। রক্ত মুছিয়ে জল খেতে দেয়।

তৌফিকের মনে হচ্ছিল, সে যেন জন্ম থেকে কোনও মানুষের স্পর্শ পায়নি। এতদিন আটকে থাকার পরে হঠাৎ সেই স্পর্শে আসন্ন মৃত্যুভয়ের মধ্যেই তার সমস্ত ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছিল। তৌফিক অনুভব করেছিল, সেই লোকটা তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। একটা অদ্ভুত পারফিউমের গন্ধও তার নাকে ঝাপটা মারে।

লোকটা অন্যদের বলেছিল, ‘আর দরকার নেই। এবার মরে যাবে। ইনজেকশন দিয়ে ফেলে রেখে আয়।’ সেই স্বর, উচ্চারণ, একটু স্পর্শ, একটু গন্ধ। বেঁচে থাকার আশায় তৌফিকের মৃত্যুভয়াচ্ছন্ন মস্তিষ্কের গ্রে সেলে তারা চিরজীবনের জন্যে ছাপ ফেলে যায়। কিছুক্ষণ আগে সেই লোকটাকে চিনতে পেরেছে তৌফিক। জয়ন্ত!

কী করে এরকম একটা খুনি টাইপের লোকের সঙ্গে লতার বিয়ে দিতে পারল বিমলচন্দ্র!

বিছানায় ফোনটা রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আলমারির কাছে গিয়ে লকার থেকে সে একটা ডায়েরি বের করল। ডায়েরিটার মধ্যেই সে তাদের রেজিস্ট্রি পেপারটা রেখেছিল। পেপারটার কয়েকটা ফোটো তুলে রজতকে হোয়াট্সঅ্যাপ করে দিল তৌফিক। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে এল বিছানায়। ড্রয়ার থেকে দুটো পেইনকিলার বার করে জল দিয়ে গিলে নিল।

খুব ক্যালকুলেশন করে ছুরিটা মেরেছিল। খানিকটা মাংস কেটে গেছে। হাড়ে লাগেনি। ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আলোতে জয়ন্ত ভালো করে দেখতে পায়নি। বাড়ি ফিরেই পা-টা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধেছে তৌফিক। তা-ও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ভয়ের চোটে কোনও ডাক্তারের কাছে যেতে পারেনি সে। যদি জয়ন্ত বুঝে যায়, সে বশ হয়নি।

রজত যতক্ষণ না জয়ন্তকে গারদের পিছনে পাঠাচ্ছে, ততক্ষণ তৌফিক বাড়ি থেকে বেরবে না। কিন্তু ভোরবেলা সাঁকোর কাছে জয়ন্ত তাকে যেতে বলল কেন? জয়ন্ত ঠিক কী চাইছে তা তৌফিক বুঝতে পারছে না এখনও।

কী যেন বলছিল লতা? ত্রাটক বন্ধন! এই কথাটা সে পড়েছে চন্দ্রমৌলির ডায়েরির মধ্যে। হাতের ডায়েরিটা খুলল সে। এ পাতা-ও পাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাল।

ত্রিশিরা ত্রাটক সূচিকাভরণ। যে কোনও প্রাণীকে বশীকরণ করার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া। তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করতে হয়। তৈরি হওয়ার দশ পলের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ না করলে কোনও কাজ হয় না। ত্রাটক বশীকরণ বজায় থাকে পাঁচ দিন পর্যন্ত। একবার কাউকে ত্রাটক করালে দশ মাসের মধ্যে তাকে দ্বিতীয়বার কোনওরকম বশীকরণ করা যায় না। মানুষ, দেবতা, অপদেবতা সবার উপরে কাজ করে।

তৌফিক পাতা উলটে গেল। ত্রাটক সূচিকাভরণের উপকরণ, বিধি, মন্ত্র ইত্যাদি লেখা। সেইসব পড়ার ইচ্ছে করল না তৌফিকের। সে মরেনি। সে বশীভূতও হয়নি। এই চূড়ান্ত প্রক্রিয়া তার উপরে কাজ করেনি কেন?

মন্ত্র ইত্যাদির পরে অন্য কালিতে আরও খুদে খুদে অক্ষরে কিছু একটা লেখা। 'ত্রাটক খণ্ডনের উপায়। যদি আগে থেকে কালসূত্র অগ্নিতে প্রাণবন্ধন করা থাকে তবে ব্যক্তির কিছু হয় না।'

তার নিচেই লেখা : 'একমাত্র বীজের রক্তই কালসূত্র অগ্নি তৈরি করে।'

'বীজ!' এই কথাটা সে রৌম্য আর ভৈরবের গল্পে পড়েছে। তৌফিক চাঁদের ডায়েরিটা ঘাঁটতে লাগল। ছেলেটা এই কাল্পনিক রৌম্য নিয়ে অবসেস্‌ড ছিল। ভয়ংকর ভয়ংকর সব ইতিহাস আর পুরাণমিশ্রিত গল্প শোনাত তাকে।

এই ডায়েরিটা খুললেই তৌফিকের মনে হয় যে, সে পৃথিবীতে থেকেও অন্য একটা ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ঢুকে পড়েছে। বীজ, রৌম্য, ভৈরব, রক্তবৃত্ত...

কয়েকটা পাতা ওলটানোর পরে এক জায়গায় তৌফিক থমকাল। রৌম্যজাগরণের প্রক্রিয়া।

'গর্ভবিশিষ্ট পাতরগণ্য নারীর তৃতীয় মাস থেকে প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে রক্তবৃত্তে একটি করে মানুষকে আহুতি দেওয়ার পর প্রসাদি রক্ত গর্ভিণী নারীকে পান করানো হয়।

নবম মাস উপস্থিত হলে চন্দ্রগ্রহণের তিন রাত্রি আগে বীজকে রক্তবৃত্তে বপন করা হয়। চন্দ্রগ্রহণ তিথিতে রক্তবৃত্তে সেই গর্ভিণী মহিলাকে আহুতি দেওয়া হয়। নরক হতে বীজসহ রৌম্যসন্তান ফিরে আসে।'

লেখাটা পড়তে পড়তে আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা চিন্তা তৌফিককে অসাড় করে দিল। ওই রক্তবৃত্তগুলো... রৌম্যজাগরণ... লতাও তো প্রেগন্যান্ট। ন-মাস পেরতে চলেছে তার।

তৌফিকের মাথাটা ঝাঁ করে ঘুরে গেল। সে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল বিছানার উপরে। তার অসুস্থ লাগছে।

জয়ন্ত! জয়ন্তই তার মানে মাস্টারমাইন্ড। এই জন্যেই জয়ন্ত সব জেনে-শুনে লতাকে বিয়ে করেছে! একটা গর্ভবতী মেয়েকে। জয়ন্ত নিশ্চয়ই কোনও তান্ত্রিক দলের সঙ্গে যুক্ত,

যারা এইসব নৃশংস কাজ করে বেড়াচ্ছে! আজকে তাকে বশীকরণ করেছে, যাতে করে আগামী পাঁচ দিন সে কোনও বাধা না দিতে পারে?

ইয়া আল্লাহ্, সে নিশ্চয়ই ভুলভাল ভাবছে। জয়ন্তর সঙ্গে নিশ্চয়ই ওই রক্তবৃত্তের কোনও সম্পর্ক নেই! এইসব পৈশাচিক কর্মকাণ্ড কখনও সত্যি হতে পারে না! তৌফিকের মনে হল, এবার সে পাগল হয়ে যাবে।

এতক্ষণে তৌফিক শুনতে পেল, তার ফোন বাজছে। সে ঝটপট মেঝে ছেড়ে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিল। ফোনটা ধরতেই রজতের চারটে গালাগালি তেড়ে এল।

'থাকিস কোথায়?... তুলে এনেছি... আগামীকাল কোর্ট বন্ধ... বেইল পাবে না। নিশ্চিন্তে থাক্...'

বেশ কিছুক্ষণ রজতের সঙ্গে কথা বলে ফোনটা রাখল তৌফিক। উপাধ্যায়বাড়িতে জয়ন্তর আসল কথাটা নিশ্চয়ই কেউ জানে না। জানলে এই ঘটনা ঘটতেই পারত না। ওদেরকে সে চেনে। ওরা জাত-ধর্মের ব্যাপারে যতই গোঁড়া হোক; নিজেদের ছেলেমেয়েকে খুব ভালোবাসে। তারকনাথ কিংবা বিমলচন্দ্রকে এইসব কথা খুলে বললে কি ওরা বিশ্বাস করবে?

নাহ্, সে আশা নেই। আগে হলে একরকম ছিল। এখন তৌফিকের মুখ থেকে জয়ন্তর বিরুদ্ধে যে কোনও কথাই অন্যরকম মানে তৈরি করবে। সে কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না জয়ন্ত ওইসব তান্ত্রিক দলের সঙ্গে যুক্ত।

জয়ন্তর দলে নিশ্চিত আরও লোক আছে। তার আশঙ্কা সত্যি হলে ওই লোকগুলোও লতার ক্ষতি করে দিতে পারে। অবশ্য লতা নিশ্চয়ই তার ওই শারীরিক অবস্থায় বাড়ির বাইরে বেরবে না।

তবু... তবু তৌফিকের ভয় লাগছিল। জয়ন্তর দলের কেউ যদি ঢুকে আসে বাড়িতে! একটু আগে ফোনে কথা বলার সময়, অনেক কাকুতিমিনতি করে তৌফিক রজতকে রাজি করিয়েছে লতার সেফটির জন্যে পুলিশ প্রোটেকশন দিতে।

তৌফিকের মনে হচ্ছিল, তার মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সকালেই গিয়ে তৌফিক নিয়ে আসবে লতাকে। ভাইয়া ফিরবে বেলার দিকে। সে একা গেলে কিচ্ছু হবে না।

সারারাত্রি জাগরণের পরে সে দেখছিল, সাদা ফ্যাকাশে চাল ধোয়া-জলের মতো আকাশ বেয়ে সুন্দর একটা লাল সূর্য উঠছে দিগন্তের প্রান্তে, গতকাল সন্ধ্যাবেলা লতার রক্তহীন ফ্যাকাশে কপালে বড় লাল সিঁদুরের টিপটার মতোই। তৌফিক অনুভব করছিল, তার মারাত্মক ঘুম পাচ্ছে। ডায়েরির পাতাটা আরেকবার খুলেও সে পড়তে পারল না। তার চোখ বুজে এল।

উনত্রিশ

দুপুরবেলা তৌফিক চুপচাপ শুয়ে ছিল নিজের ঘরে। টেবিলে আঢাকা খাবার শুকাচ্ছে। তৌফিকের খিদে নেই। কিছুক্ষণ আগে সে দাদা-বউদিকে নিয়ে উপাধ্যায়বাড়িতে গিয়েছিল। লতা আসতে রাজি হয়নি কিছুতেই। এমনকী দেখাও করেনি তার সঙ্গে। তৌফিক ভেবেছিল, তারকনাথের সঙ্গে কথা বললে হয়তো কিছু সুরাহা হবে। কিন্তু জয়ন্ত আর বিমলচন্দ্রকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে, সকাল হতে না হতেই তারকনাথ কাটোয়া গেছে উকিল ধরতে। সে যতটা পারা যায়, দাদা-বউদিকে খুলে বলেছে সবকিছু। অবশ্য ওইসব অলৌকিক কথা কিছুই বলেনি।

উপাধ্যায়বাড়ি থেকে সুরমাদেবী এক প্রকার তাদেরকে তাড়িয়েই দিয়েছে। তৌফিক অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিছুই হল না। মাঝখান থেকে দাদা-বউদি প্রচণ্ড রেগে গেছে তার উপরে। বলেছে ইমিডিয়েটলি ডিভোর্স ফাইল করতে। রজতের সঙ্গে কথা বলে তৌফিক আরও বিমর্ষ হয়ে উঠল। আগামীকাল কোর্টে গিয়ে লতা যদি জয়ন্তর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে জয়ন্ত জামিন পেয়ে যাবে। তৌফিক ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে।

বিছানায় ডায়েরিটা উলটো হয়ে পড়ে ছিল। এই ডায়েরিটা চন্দ্রমৌলি নিজে হাতে তৈরি করেছিল। লতার চিন্তা মন থেকে সরাবার জন্যেই সে ডায়েরিটা তুলে নিল। প্রথম আর শেষ কভার দুটো মোটা কাঠের। লালচেরঙা। ডায়েরির কাঠের কভারের উপরে একটা সুন্দর লকও লাগানো আছে। নাম্বার লক। এটা অবশ্য ধাতব, ছয়টা ডিজিট। যদিও সেটার কোনও কাজ নেই।

তৌফিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল একবার ডায়েরিটা। আজকাল বাজারে প্লাস্টিকের সুন্দর সুন্দর নাম্বার লক দেওয়া ডায়েরি পাওয়া যায়।

ডায়েরির সামনের আর পিছনের হার্ডবোর্ড দুটোকে জুড়ে রাখাই হল লকের কাজ। হয়তো চন্দ্রমৌলি চেয়েছিল, তার এই রৌম্য গবেষণার কথা কেউ না জানুক। কিন্তু এই লকটা শুধুই প্রথম মলাটের উপরে বসানো। চন্দ্রমৌলি ঠিকমতো বসাতে পারেনি লকটা।

পরপর কয়েকটা পাতা উলটে গেল তৌফিক। এইসব রৌম্য, ভৈরব, বীজ, স্বর্গদেও, পাতরগণ্য... এগুলো কি সব সত্যি! মানুষকে আটকানো যায় কিন্তু অলৌকিক কিছু হলে! তৌফিকের মনে পড়ল শাম্ভবীর কথা, 'নীলকমলকে ডাক।'

দেবী দিক্করবাসিনীর থানে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হলে বীজ জন্মায়। চন্দ্রমৌলি বলেছিল একবার। সঙ্গে এ-ও বলেছিল, বছরখানেক বাদে একটা পূর্ণ সূর্যগ্রহণ আছে। সেটা একবার পেরলেই তাকে আর উপাধ্যায়বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে না। অথচ ভাগ্যের ফেরে পড়ে তার আগেই চন্দ্রমৌলিকে উপাধ্যায়বাড়ির চৌহদ্দি পেরতে হল।

উপাধ্যায়বাড়ি থেকে পালিয়ে সেইদিন চন্দ্রমৌলি প্রথম তৌফিকের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল। কেউ জানেও না সেই কথা। চন্দ্রমৌলি তৌফিককে না পেয়ে, তার ঘরে রেখে গিয়েছিল এই ডায়েরিটা। পরে তৌফিক এটা পায়। সবকিছুই সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। গত কয়েকদিনে একের পর এক ঘটনা তাকে আবার নতুন করে ডায়েরিটার দিকে আকৃষ্ট

করেছে। এতদিন তৌফিক ভাবত, চন্দ্রমৌলি বোধহয় মারা গেছে সেই আগুনে পুড়ে। কিন্তু এখন শাম্ভবীর কথাতে তার কেমন যেন অন্যরকম বোধ হচ্ছে।

'ইনশাল্লাহ্!'

আচমকা বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা মাথায় এল তৌফিকের। এর আগে সে কখনও ভাবেনি এই কথাটা। আসলে ডায়েরিটাকে সেইভাবে গুরুত্ব দেয়নি সে কোনওদিনও। শুধুই কিছু অলৌকিক কিছু গল্পের সম্ভার বলে মনে হত।

আজ যখন একের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে চলেছে আর শাম্ভবী বারংবার তাকে বলছে, 'নীলকমলকে ডাক পাঠাও'— এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তার মনে হল, চন্দ্রমৌলি তাকে ওই নোটসের তাড়া আর ডায়েরি ভরতি গল্প ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও কিছু দিয়ে গিয়েছিল। ডায়েরির নাম্বার লকটা বুঝি ভাঙা নয়। হয়তো ওটারও কিছু একটা কাজ আছে।

সিক্স ডিজিট নাম্বার লক। তৌফিক মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এটা কি কোনও তারিখ?

তৌফিক চন্দ্রমৌলির উপাধ্যায়বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার দিনের তারিখটা নাম্বার লকে লাগাল। সে ডায়েরিটা ধরে ঝাড়া দিল একবার। কিছুই হল না।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে চাদরে মুখ ঘষল তৌফিক। তাহলে কী করবে এখন সে? জয়ন্ত যদি কালকেই জামিন পেয়ে যায়? তারপর যদি সত্যি সত্যি অলৌকিক কোনও ঘটনা ঘটে, কে বাঁচাবে লতাকে? চন্দ্রমৌলিকে দরকার। ভীষণ দরকার।

আবার কী মনে হতে সে উঠে বসল বিছানায়।

'আল্লাহ্ কসম, এটাই শেষবার, এরপরে আমি আর ওই ডায়েরিটায় হাত ছোঁয়াব না।' নিজের কাছেই প্রতীজ্ঞা করল তৌফিক। ডায়েরিতে লেখা অলৌকিক ঘটনাগুলো তার স্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তার মাথায় সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে বীজ, রৌম্য, রক্তবৃত্ত...

চন্দ্রমৌলি চলে যাওয়ার পরে কবে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল অসম অঞ্চলে? মোবাইলে নেট ঘেঁটে তৌফিক বার করল তারিখটা।

২০০৯ সালের ২২ জুলাই। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। ভারতের উত্তর-পূর্বে অনেকটা অংশ জুড়েই দেখা গেছে। তৌফিকের মনে পড়ল, ওই বছর ওই সময়টা তৌফিককে নিয়ে আব্বা-আম্মা মক্কায় হজ করতে গিয়েছিল। চন্দ্রমৌলির পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়নি মক্কায় বসে।

যদি ২০০৯ সালের পূর্ণ সূর্যগ্রহণে বীজ জন্মায় তাহলে সেই বীজের বয়স এখন ঠিক সাড়ে আট বছর বয়স। শাম্ভবীকে দেখলেও তো আট-নয় বছরের খুকি বলেই মনে হয়! সবই কেমন যেন মিলে যাচ্ছে।

নাম্বার লক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ২২০৭০৯ সংখ্যাটা সে লাগাল। খুট। তৌফিককে অবাক করে কাঠের কভারটা দু-ভাগে খুলে গেল। তার ভিতরে কয়েকটা পাতলা পাতা রাখা।

ত্রিশ

জানুয়ারি মাস প্রায় শেষ হতে চলল। আগের মতো কনকনে ঠান্ডা নেই আর। কাল অনেক রাত্রে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, পুলিশ এসে বাবা আর জামাইবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

দাদুও নেই বাড়িতে। দোতলায় দিদি, কৃষ্ণা, মা আর সে। অবশ্য দিদির ঘরে চব্বিশ ঘণ্টার আয়া আছে একজন। আজকে একতলা থেকে দোতলার ওঠার গেটটাও তালা-দেওয়া। অচিন্ত্য মোবাইলটা দেখল। রাত প্রায় তিনটে বাজে।

শুতে যাওয়ার আগে সে দরজা খুলে উঁকি দিল বারান্দায়। দোতলার বারান্দা শুনশান। কেউ কোথাও নেই। গেটেও তালা দেওয়া যথারীতি। কিন্তু তার একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে।

ঝন। খট।

শব্দ দুটো হতেই অচিন্ত্য চমকে উঠল। ছাতের দরজাটা কেউ যেন খুলে বন্ধ করল। অচিন্ত্য সোজা ছাতে উঠে এল। ছাতের দরজাটা দু-হাত দিয়ে ঠেলতেই ওটা খুলে গেল। আকাশে এক কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ উঠেছে। বসন্তের হালকা গরম হাওয়া ভেসে আসছে কোপাইয়ের দিক থেকে। ছাত ফাঁকা। জনমানুষের চিহ্ন নেই।

কী মনে হতে পায়ে পায়ে চন্দ্রমৌলির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল অচিন্ত্য। দরজার তালাটা খোলা, কড়ায় ঝুলছে। তালার গায়ে লাগানো চাবি। দরজায় একটা জোর ধাক্কা দিল সে। কিছু ভাবার আগেই একটা শক্ত হাত অচিন্ত্যর মুখ চেপে ধরল।

'মার খেতে না চাইলে একটাও শব্দ করবি না।' অচিন্ত্যকে ঘরের ভিতরে টেনে এনে এক কোনায় ঠেলে দিল তৌফিক। 'চুপ করে বসে থাক্।'

অচিন্ত্য চুপচাপ সরে গেলে ঘরের কোনায়। এত রাত্রে তৌফিকদা এই ঘরে কী করছে? বাড়িতে ঢুকলই বা কী করে?

তৌফিক দরজাটা বন্ধ করে একটা মোমবাতি জ্বালল। পকেট থেকে কী যেন একটা বার করল। খাপ খুলতেই আট ইঞ্চির ভারী ফলাটা ঝিকিয়ে উঠল মোমবাতির আলোয়।

অচিন্ত্য আঁতকে উঠল, তৌফিকদা তাকে খুন করবে নাকি? সে সিঁটিয়ে গেল দেওয়ালের কোনায়। তৌফিক অচিন্ত্যকে নজরই করল না। সে ছুরিটা নিয়ে মেঝে থেকে ফুট দুয়েক উঁচুতে দেওয়ালের একটা অংশের চুনবালি খসাতে শুরু করল। একটু খসানোর পরেই একটা ছোট গর্ত দেখা গেল।

তৌফিক গর্ত থেকে যে জিনিসটা বার করে আনল, সেটা দেখে অচিন্ত্যর হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল। এই বস্তুটা অচিন্ত্য খুব ভালো চেনে। ওটার কথা সে কোনওদিন ভুলতে পারবে না। ছোট একটা রক্ত-মাখা সাদা বল। এখন অবশ্য রক্তের দাগ শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে।

বলটা চন্দ্রমৌলির। তৌফিকদা কি কোনওভাবে চন্দ্রমৌলির প্রেতাত্মাকে ডেকে আনছে? তৌফিক লতাকে বশীকরণ করার চেষ্টা করলেও অচিন্ত্য বোধহয় এতটা ভয় পেত না, যতটা সে ওই বলটা দেখে পেল।

চন্দ্রমৌলি ফিরে এলে... অচিন্ত্যর বুক ধড়াস করে উঠল। এই বাড়ি থেকে চন্দ্রমৌলি চলে যাওয়ার পিছনে সব থেকে বড় দায় তার। চন্দ্রমৌলির প্রেতাত্মা ফিরে এলে নিশ্চয়ই

প্রতিশোধ নেবে, সবার আগে তাকেই মারবে।
তৌফিক তার ছোট ব্যাগটা থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বার করল।
অচিন্ত্য কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল, 'তৌফিকদা!'
তৌফিক মনোযোগ দিয়ে লিস্ট মিলিয়ে মিলিয়ে জিনিসগুলো বার করছিল ব্যাগ থেকে।
'ও তৌফিকদা। তুমি কি তাকে ডাকছ?' অচিন্ত্য আর থাকতে না পেরে বলে ফেলল।
'কাকে?'
'তোমার বন্ধুকে?' নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও পারল না অচিন্ত্য।
তৌফিক একটু অবাক হয়ে তাকাল অচিন্ত্যর দিকে। 'বাপ রে! তোর ইনটুইশন দেখছি শিউলি ফুলের মতো ঝরে ঝরে পড়ছে।'
'সত্যি তুমি তাকে ডাকছ?'
'হুঁ।' তৌফিক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।
'কেন ডাকছ তৌফিকদা?' অচিন্ত্য কাতর গলায় জানতে চাইল। তৌফিক অচিন্ত্যর প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। 'তৌফিকদা, শুনছ!'
'কী হয়েছে? চুপ করে বসে থাকতে বললাম না?' তৌফিক খিঁচিয়ে উঠল।
'প্লিজ তৌফিকদা!'
'হয়েছেটা কী?'
'তুমি ডেকো না।' অচিন্ত্য প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। 'তুমি কী চাও? টাকা? সম্পত্তি? এই বাড়িটা?' পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার সময় বাবা সারাক্ষণ বলেছে, বাড়ি-সম্পত্তির লোভে তৌফিকদা তার দিদিকে ফাঁসিয়েছে। তা-ই সেই কথাটাই প্রথম মাথায় এল অচিন্ত্যর।
'বাড়ি!' তৌফিক অবাক হয়ে তাকাল অচিন্ত্যর দিকে।
অচিন্ত্য তড়িঘড়ি বলল, 'উত্তরসূরি হিসাবে আমিই তো পাব বাড়ি। আমি পইতে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি, তোমাকে দিয়ে দেব।'
'উত্তরসূরি হিসাবে যে মাথা ভরতি গোবর আর রক্তে জাতিভেদটা ভালোই পেয়েছিস, তা আমি জানি।' তৌফিক মেঝে থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে নাচাল। 'চুপচাপ বসে থাক্, নয়তো তোর মুখ বেঁধে রাখতে হবে। সেটাই চাইছিস নাকি?'
অচিন্ত্য একটা ঢোক গিলে চুপ করে গেল।
তৌফিক পাতাগুলো দেখে নিচ্ছিল। পালাবার আগে চন্দ্রমৌলি তাকে একটা ছোট চিঠি লিখে গেছে।

লাল,
আমি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। কালো পরির হাতে ধরা পড়লে সে হয়তো আমার স্মৃতি নষ্ট করে দেবে। সাদা বলটাকে আমি বন্ধন করে রেখে গেলাম। ওটা দিয়ে আমাকে 'ডাক' পাঠালেই আমি ফিরে আসব।
নীলকমল

অন্য পাতাগুলোয় লেখা ‘ডাক’ পাঠানোর জিনিসের তালিকা আর নিয়মাবলি। তৌফিক জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখল মেঝেতে। প্রথমে আলপনার মতো কীসব আঁকতে হবে লাল রং দিয়ে। লাল রঙের জন্যে তৌফিক সিঁদুর নিয়ে এসেছে কঙ্কালীতলা মন্দির থেকে। জ্যামিতিক আকারের আলপনাটার মাঝখানে একটা পাত্র ভরতি দুধ রাখতে হবে। তাতে সাদা বলটা রেখে, তার উপরে একটা কঙ্কালের মুণ্ডু রাখতে হবে। এটাও জোগাড় করার জন্য ভালোই খাটতে হয়েছে তৌফিককে। মণিদির বাড়ি গিয়ে ওর ভাইয়ের থেকে বহু ভুজুংভাজুং দিয়ে চেয়ে এনেছে সেটা। মুণ্ডুর উপরে সিঁদুর-মাখানো অশ্বত্থপাতা রেখে প্রদীপ জ্বালতে হবে। তারপরে তার নিজের এক ফোঁটা রক্ত দুধে মিশিয়ে দিতে হবে। অভিচার সফল হলে দুধটা সম্পূর্ণ লাল হয়ে যাবে।

আর কিছু নেই? তৌফিক পাতাগুলো ওলটালো। কোনও মন্ত্রোচ্চারণ নেই? তৌফিক সবসময় দেখেছে, সাধুসন্ন্যাসীরা যাগযজ্ঞ করার সময় মন্ত্র বলে। কই, চন্দ্রমৌলি তো আর কিছু লিখে রাখেনি! এতে করে কাজ হবে তো? যাক গে, তাড়াতাড়ি শেষ করে কেটে পড়তে হবে। খুব একটা কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। তৌফিক পিতলের পাত্রটায় দুধ ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে খেয়াল করল না, অচিন্ত্য হাতড়ে হাতড়ে কখন পাশ থেকে একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়েছে।

‘আহ্।’ কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল তৌফিক। অচিন্ত্য কাঠের টুকরোটা তার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মেরেছে। তৌফিকের হাত লেগে মোমবাতিটা গড়িয়ে গেল। অচিন্ত্য চটপট উঠে এসে খপ করে একটা জিনিস তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে পালিয়ে এল। তৌফিক উঠে দাঁড়ানোর আগেই অচিন্ত্য দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। অচিন্ত্য প্রায় ছুটে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। সে বলটা তুলে নিয়ে চলে এসেছে। ওই বলটাই যত নষ্টের গোড়া।

***

সাদা হাতির দাঁতের ইঞ্চি দুয়েক ব্যাসের বলটার গায়ে সুন্দর কারুকার্য করা। আট বছরের অচিন্ত্যর বড় লোভ ছিল বলটার উপরে, কিন্তু বলটা যার, তার কাছ থেকে পাওয়াটা অসম্ভব। দু-চার বার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল অচিন্ত্য। চন্দ্রমৌলির সঙ্গে হাতাহাতি হলে হয়তো অচিন্ত্য জিতে যেত, কিন্তু সে সুযোগ আসেনি কখনও।

এক, চন্দ্রমৌলির চারপাশে অদ্ভুত অশুভ নিষেধাজ্ঞা। দুই, তৌফিকের হাতে মার খাওয়ার সম্ভাবনা।

অনেক ভেবে অচিন্ত্য মতলব ভেঁজেছিল বলটা নেওয়ার। চন্দ্রমৌলি প্রায় প্রতিদিনই ঠিক বেলা আড়াইটে নাগাদ লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করত। সব ভারী ভারী বই সে টেনে তুলতে পারত না তিনতলায়। সেই সময় বাড়ির সবাই ঘুমাত। সে ঠিক করেছিল, চন্দ্রমৌলিকে ফেলে দেবে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়। পড়ে গেলে চন্দ্রমৌলি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন সে বলটা চুপিচুপি নিয়ে নেবে। কেউ জানবে না।

সেই ছেলেমানুষি বুদ্ধিতেই অচিন্ত্য চন্দ্রমৌলিকে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেই নিচের সিঁড়িতে সাবান-গোলা জল ফেলেছিল। কিন্তু চন্দ্রমৌলি কী বুদ্ধিমান ছেলে! সে যেন আগে থেকেই জানত, অচিন্ত্য সিঁড়িতে সাবান-জল দিয়ে রেখেছে। সে সিঁড়ির ধাপিতে পা-ই রাখেনি। দিব্যি সিঁড়ির হাতল বেয়ে হড়কে নিচে নেমে এসে তার দিকে একটা মিচকে হাসি ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই ঘটনাটা ঘটেছিল। ওরা দুজনে কেউই খেয়াল করেনি, পিসিমণি নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। চন্দ্রমৌলি চেঁচিয়েও উঠেছিল, 'সাবধান!' কিন্তু তার আগেই পিসিমণির পা পড়ে গিয়েছিল সাবান-জলে।

কী রক্ত, কী রক্ত! তার মধ্যেও সে দেখেছিল, চন্দ্রমৌলির কাঁপা কাঁপা হাত থেকে বলটা গড়িয়ে পড়ে গেল রক্তের মধ্যে। বলটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে রক্ত লেগে গেল চন্দ্রমৌলির হাতে।

অচিন্ত্য ভয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছিল। সবাই ছুটে এসে যখন জিজ্ঞেস করছে, কী করে হল, তখন সে ভয়ের চোটেই আঙুল তুলে চন্দ্রমৌলিকে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেদিন চন্দ্রমৌলির চোখে কী দেখেছিল, সে জানে না, কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত স্বপ্নে ওই চোখ দুটো তাকে তাড়া করে বেড়াত। ভয়ের চোটে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার।

পিসিমণিকে অনেক কষ্টে বাঁচানো গিয়েছিল। বাবা চন্দ্রমৌলিকে আটকে রাখে ছাতের ঘরে। কিন্তু সে সেই ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তৌফিকদা আর চন্দ্রমৌলিকে ডাকতে পারবে না। সে বলটা নিয়ে চলে এসেছে। দোতলার বারান্দায় আলোর নিচে দাঁড়িয়ে সে মুঠোটা খুলল।

এ কী! বলটা কোথায়? এ তো সিঁদুর কৌটোটা। উত্তেজনায়, অন্ধকারে ভুল করে সে বলের বদলে সিঁদুর কৌটোটা নিয়ে চলে এসেছে!

এবার কী হবে? উপরের ঘরে একলা ফিরে যাওয়ার সাহস নেই তার। সে বাইরে থেকে তালাচাবি দিয়ে এসেছে। তৌফিকদা কিছুতেই পালাতে পারবে না। তৌফিকদাকে কি পুলিশে দেওয়া যাবে? অচিন্ত্য মায়ের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

একত্রিশ

রজত বাইকটা নিয়ে উপাধ্যায়বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ভোর হতে না হতেই থানা থেকে ফোন করে রজতকে জানিয়েছে যে, তৌফিক নাকি সর্বানন্দপুরের উপাধ্যায়বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। রজত বলে দিয়েছে, সে থানায় যাওয়ার আগে উপাধ্যায়বাড়িতে ঢুঁ মেরে ব্যাপারটা দেখে যাচ্ছে, যদি সত্যিই তৌফিক ধরা পড়ে তাহলে সে-ই থানায় জানাবে, আগে থেকে স্টেপ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

রজত কলিং বেল টেপার আগেই সুরমাদেবী দরজা খুললেন। 'আসুন অফিসার।'

রজত জুতো খুলে ভিতরে ঢুকল। 'কোথায় চোর?'

'কাল রাত্রিবেলা ওই হারামজাদা ছেলে আমাদের বাড়ির দরজা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে এসেছে।' সুরমাদেবী উত্তেজিত স্বরে বললেন।

সেটা খুবই স্বাভাবিক, রজত মনে মনে ভাবল। কালকে লতার প্রত্যাখ্যানের পরে তৌফিক যে রাতের অন্ধকারে লতার সঙ্গে কথা বলার আর-একটা চেষ্টা করবে, সেটা রজতের মনেই হয়েছিল, কিন্তু বেটাচ্ছেলে যে এমন গাড়লের মতো ধরা পড়ে যাবে, সেটা সে ভাবেনি।

'তা চোর কোথায়? ধরে রেখেছেন শুনলাম নাকি।' রজত বলল।

'হ্যাঁ, তিনতলায়। চিলেকোঠায়।' অচিন্ত্য বলল।

'চিলেকোঠায়?' রজত অবাক হল। চিলেকোঠায় কী করতে গিয়েছিল তৌফিক? সে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনাদের চিলেকোঠায় কী এমন মূল্যবান জিনিস থাকে যে চুরি করতে গিয়েছিল?'

অচিন্ত্য আর সুরমাদেবী শুকনো মুখে মাথা নাড়ল, তারা জানে না। অচিন্ত্যরা দোতলায় উঠতে দেখল, কৃষ্ণা দাঁত মাজছে।

'এ কী আবার পুলিশ কেন?' কৃষ্ণা একমুখ ফেনা নিয়ে জিজ্ঞেস করল। অচিন্ত্য হড়বড় করে বলল গতকাল রাত্রের কথা। কোনওরকমে কুলকুচি করে মুখটা ধুয়ে নিয়ে সবার পিছন পিছন কৃষ্ণাও ছাতে উঠল। এত বড় কাণ্ড ঘটে গেছে, তাকে কেউ বলেওনি। দাদার উপরে বেশ রাগ হল তার।

রজত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই ঘরে আটকে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ।' অচিন্ত্য বলল। 'তখন ভোর চারটে হবে প্রায়। আমি তারপরেই মাকে বলেছি আর মা থানায় ফোন করেছে।'

রজত দেখল তালাচাবি লাগানো। 'চাবি?'

অচিন্ত্য পকেট থেকে চাবিটা বার করে দিল। রজত দরজা খুলল। সবাই প্রায় রজতের ঘাড়ের উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে উঁকি মারল।

ঘর শুনশান, কেউ নেই। ঘরের মাঝখানে রক্ত দিয়ে একটা আলপনা আঁকা। তার উপরে একটা পাত্র ভরতি দুধ। তার মধ্যে একটা নরকরোটি। নরকরোটির মাথায় একটা রক্তের দাগ-লাগা অশ্বত্থপাতা, তার উপরে একটা প্রদীপ জ্বলজ্বল করছে।

অচিন্ত্যর মুখ থেকে একটা ভয়ের আওয়াজ বেরিয়ে এল।

***

'হ্যালো।'

'রজত বলছি।'

'বল্।'

'তুই কোথায়?'

'আমি বোলপুর হসপিটালে।'

'হসপিটালে? হুহ্। আমি আসছি। ওখানেই থাকবি।'

রজত বোলপুর হসপিটালে এসে দেখল, শ্রীমান একটা জেনারেল বেডে শুয়ে আছেন। তৌফিকের হাসি দেখে রজতের গা-পিত্তি জ্বলে গেল।

'হাতে কী হয়েছে তোর?' রজত তৌফিকের ব্যান্ডেজ-বাঁধা কাঁধের দিকে নির্দেশ করল।

'কাল রাত্রে বাথরুমে পড়ে গেছি। কাঁধের হাড়টা একটু সরে গেছে। ডাক্তার তা-ই ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।' তৌফিক নিরীহ মুখে বলল।

'পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব তোমায়। বাথরুমে পড়ে গেছি... উপাধ্যায়বাড়ির ছাতের ঘরে কী করছিলি কালকে রাতে?'

'আমি!' তৌফিক আকাশ থেকে পড়ার ভান করল।

'কাল রাত্রে তুই উপাধ্যায়বাড়ির তিনতলার ছাতে একটা রিচুয়ালস করেছিস। আমি জানতাম না যে তুই এসবেও বিশ্বাস করিস। কী রিচুয়ালস ওটা? লতা বশীকরণ?' রজত জিজ্ঞেস করল।

'উপাধ্যায়বাড়ির ছাতে কী হল তা আমি কী করে জানব? কালকে রাত্রে আমি আমার ঘরে ছিলাম। তুই আমার বাড়ির যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারিস।' তৌফিক বলল।

রজত পকেট থেকে দুটো বোতাম বার করে পাশের টেবিলে রাখল। 'তোর জামার বোতাম উপাধ্যায়বাড়ির চিলেকোঠায় পাওয়া যায় কেন? তোর দু-হাতে এত কাটাকুটি কীসের? তুই যদি বাড়ি থেকেই হাসপাতালে এসেছিস তাহলে তোর জামা-প্যান্টে এত কাদার দাগ কী করে? তুই বুঝি রাত্তিরে জিন্সের প্যান্ট পরে শুতে যাস?'

তৌফিক ঢোক গিলল। রজত তৌফিকের নাকের ডগায় রুলটা নাচাল। 'এবার বল্, ওই ঘর থেকে পালালি কী করে? ওরা বলছিল, ঘরটায় নাকি অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার আছে? ওদের বাড়ির কে একটা ছেলে নাকি ওই ঘরেই থাকত আর মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত। আমি তো ঘরটা ভালো করে দেখলাম, কই, সেরকম কোনও গুপ্তপথ কিছু দেখতে পেলাম না। ঘরের ভিতর থেকে দরজার তালা খোলারও কোনও রাস্তা নেই। পিসি সরকার হয়েছিস নাকি?'

'তুই ভালো করে খেয়াল করিসনি। পুকুরের দিকের একটা জানালা খোলা ছিল।' তৌফিক বিড়বিড় করে বলল।

'হ্যাঁ, তা ছিল। জানালায় তো গরাদ দেওয়া।'

'ওই জানালার ফ্রেমটা খোলা যায়। ট্রিকস আছে। আগে ওইদিকে একটা বড় জামরুল গাছ ছিল। তার মগডালটা একদম ওই ঘরটার জানালা ঘেঁষে ছিল। ওই ডালে দাঁড়িয়ে অতি সহজেই খুলে ফেলা যেত কপাটের হাঁসকল, জানালার ফ্রেম। তারপর ওই গাছটা

বেয়েই ছাতে চলে আসা যেত, কি নিচে নেমে যাওয়া যেত। লোকে ভাবত চাঁদের অলৌকিক শক্তি আছে, বন্ধ ঘরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারে।'

'কিন্তু এখন তো ওইপাশে কিচ্ছু নেই। একদম ফাঁকা। দেওয়াল-লাগোয়া কোনও পাইপও নেই। তুই নামলি কী করে?'

'গাছটা কেটে দিয়েছে... ওখান থেকে ঝুল খেয়ে দোতলার জানালার প্যারাপিটে... তারপর একতলার জানলাটায় নামতে গিয়েই, হাতটা পিছলে গেল। ওই জন্যেই কাঁধের হাড়টা...'

'তোকে তো এখনই এই বেডে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকে রাখতে ইচ্ছা করছে আমার।' রজত উঠতে উঠতে বলল।

'রজত! ওদেরকে কখন কোর্টে তোলা হবে?'

'এই আমি থানায় গিয়েই পাঠাব...'

'রজত!' তৌফিক হঠাৎ রজতের হাত চেপে ধরল।

'কিছু করার নেই আমার। তোকে বলেছিলাম। লতার সঙ্গে কথা না বলেই তুই স্টেপ নিয়েছিস।'

'রজত, প্লিজ। দোহাই তোর। ওদেরকে আটকে রাখ্। তিন দিন। মাত্র তিন দিন।'

'তিন দিন! কী হবে তিন দিনে?' রজত হাঁ হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আর তিন দিন পরেই চন্দ্রগ্রহণ। তৌফিক সে কথা রজতকে বলতে পারল না। সে অনুনয় করল, 'তোরা তো পুলিশ। তোদের তো কত ক্ষমতা।'

'পাগল হয়েছিস নাকি? চাকরি চলে যাবে আমার।'

'না, যাবে না। আমি বলছি। আমি প্রমাণ এনে দেব। বিশ্বাস কর্। জয়ন্ত ভালো লোক নয়। লতা ওকে মারাত্মক ভয় পাচ্ছে, তা-ই কিছু বলতে চাইছে না। তুই আমাকে চার দিন সময় দে। যে করেই হোক ওদের চার দিন আটকে রাখ্।'

'একদিন।' রজত ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল। 'একদিন সময় দিচ্ছি তোকে। আমি আজকে ওদের কেস সাবমিট করাব না। এই একদিনের মধ্যেই তোকে প্রমাণ আনতে হবে জয়ন্তর বিরুদ্ধে। ঠিক আছে?'

তৌফিক ঘাড় নাড়ল।

'চল্। তোর বাবা আর দাদা এসে গেছে। তুই বাড়ি যা। তবে আমি বলব, তুই ওই বাড়িতে গিয়ে লতাকে বোঝা। লতা যদি একবার লিখে দেয়, তাহলে জয়ন্তর নন-বেইলেব্‌ল অফেন্স হয়ে যাবে। মিনিমাম ছয় মাস গরাদের পিছনে।'

তৌফিক মাথা নিচু করে বসে রইল। লতাকে বোঝানো এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। লতা অসম্ভব ভয় পেয়ে আছে। তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চাইছে না। কী করবে সে?

বাড়িতে ফিরে তৌফিক দেখল আবহাওয়া বেশ গরম। বেজায় চেঁচামেচি চলছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির বুয়া, তৌফিকের মা আর বউদি প্রচণ্ড উত্তেজিত স্বরে কথা কাটাকাটি করছে। উপলক্ষ তৌফিক।

তৌফিক উঠোনে পা দিতেই তৌফিকের মা দাওয়া থেকে একটা চেলাকাঠ তুলে তেড়ে এলেন। 'আল্লাহ্‌র কিরে, লাল! জীবনে কি একটুও শান্তি দিবি না তুই?'

'ছেলের নামে মাজারে চাদর চড়াও আপা। নয়তো ওই ডাইনি ওর ঘাড় থেকে নামবে না।' পাশের বাড়ির বুয়া প্রতিবেশিকৃত্য করতে এগিয়ে এল।

হাতের চেলাকাঠটা নিজের মাথাতেই ঠুকে তৌফিকের মা কেঁদে উঠলেন। 'সবই আমার কপাল বুবু। কী আর বলব।'

দাদা আর বাবা তৌফিককে একটা কথা বলারও সুযোগ দিল না। ঠেলে নিয়ে গিয়ে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাচাবি আটকে দিল। এতটা বিরোধিতা তৌফিক আশা করেনি।

সে জানালার কাছে ছুটে এল। 'কী হচ্ছেটা কী?'

'আগে তুই ওই মেয়েকে ডিভোর্স দিবি, তারপর এই ঘর থেকে বেরবি। আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলছি।' তৌফিকের বাবা ঘোষণা করলেন।

তৌফিক হতাশ হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। আর পারা যাচ্ছে না।

এতক্ষণে সে খেয়াল করল, কাঁধে যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাক্তারের ইনজেকশনের প্রভাবে বেশ ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। গতকাল রাত্রে একদম ঘুম হয়নি। কাজটাও হয়নি। এখন বাড়ির লোকের এই ব্যবহার। সব মিলিয়ে হতাশার ক্লান্তি ঘিরে ধরল তৌফিককে। যদিও সে কখনওই ভাবেনি যে, ওই অভিচারটা করলেই সত্যি সত্যি চন্দ্রমৌলি হাওয়া থেকে তার সামনে উদয় হবে। কিন্তু অনেকটা অলৌকিক আশা তার মনের মধ্যেও জন্মেছিল।

লেখা ছিল, সফল হলে দুধটা লাল হয়ে যাবে। দুধটা যেমন সাদা, তেমনিই রয়ে গেল। যতসব গুলতাপ্পি ব্যাপার। তৌফিকের চোখের পাতায় ঘুম নেমে এল।

বত্রিশ

তৌফিক টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, খেয়াল নেই তার, হঠাৎ একটা ঠান্ডা ভিজে ভিজে স্পর্শ তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তৌফিক চোখ মেলল। জিমি বসে আছে টেবিলের উপরে। ছোট্ট লাল তুকতুকে জিব বার করে তাকে চাটছে মনোযোগ দিয়ে। তৌফিক মাথা তুলল। তৌফিক দেখল, সিরিন বসে আছে খাটের উপরে। তার মুখ গম্ভীর।

'এ কী শাহাজাদি? তুমি এ ঘরে ঢুকলে কী করে?' তৌফিক চমকে গেল।

'জানানা তিয়ে। তুমি ঘুমু কল, আম্মা বকে।' সিরিন ঠোঁট ফুলিয়ে অনুযোগ করল। তৌফিক চোখ রগড়ে জানালার দিকে তাকাল। মাটির সঙ্গে অনুভূমিক রডগুলোর ফাঁক দিয়ে ছোট সিরিন দিব্যি গলে যাবে, জিমিও; সে গলতে পারবে না।

'ভাবি তো বকবেই। তোমার মাথায় লেগে গেলে কী হত?' তৌফিক বলল।

বউদি এসে জানালায় দাঁড়াল। 'এই যে, নবাবজাদার ঘুম ভেঙেছে। খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর এবার। আর সিরিনকেও খাওয়া। তোকে সবাই বকেছে বলে ওঁর গোসা হয়েছে। আমাদের হাত থেকে খাবে না কিচ্ছু।'

তৌফিক সিরিনের দিকে তাকাল। বছর তিনের এই ভাইঝিটা তার অত্যন্ত নেওটা।

'ভাবি!' জানালার রডের ফাঁক দিয়ে বউদির হাত থেকে ভাতের থালাটা নিতে নিতে সে অনুনয় করল।

'উঁহু। এখন নয়। সন্ধেবেলা। বাড়ির বাকিরা তোর জন্যে দোয়া পড়তে যাবে মাজারে। ঘণ্টা দুয়েক টাইম পাবি।' বউদি ফিসফিসিয়ে বলে দিল।

ঘণ্টা দুয়েক! তা-ই সই। তৌফিক হাসল বউদির দিকে চেয়ে।

খাইয়েদাইয়ে তৌফিক সিরিনকে বিছানায় শুইয়ে দিল। সিরিন ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে তৌফিক খাওয়াদাওয়া সেরে এঁটো বাসন বউদিকে দিয়ে, আবার চেয়ারে গিয়ে বসল।

জয়ন্তর সঙ্গে যদি রক্তবৃত্তের কোনও সম্বন্ধ থাকে তাহলে তৌফিকের মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এদের মূল ঘাঁটিটা কোনওভাবে যদি সে একবার খুঁজে পায়। খাম থেকে রজতের দিয়ে-যাওয়া কাগজগুলো আবার বার করল। এগুলোর থেকে কিছু কি খুঁজে পাবে তৌফিক! তবু সন্ধের আগে কিছুই যখন করার নেই, তখন এইগুলোই আরেকবার ঘেঁটে দেখা যাক।

তবু কী মনে হতে কাগজগুলোকে টেবিলের উপরে রেখে সে মোবাইলটা তুলল। কৃষ্ণাকে একবার ফোন করতে হবে। গতকালই কথাটা মাথায় এসেছিল তার। শাম্ভবী যদি বীজ হয়, তাহলে জয়ন্তর লোকেরা কি শাম্ভবীকেও কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে? সেদিন অচিন্ত্যর জন্মদিনে ওদের বাড়ি গিয়ে সে সোলাঙ্কী আর শাম্ভবীকে দেখতে পায়নি। খবরও নেওয়া হয়নি তারপর থেকে। কৃষ্ণাকে ফোন করে জানানো দরকার, শাম্ভবীকে যেন ওর বাবা-মা একটু সাবধানে রাখে।

কৃষ্ণার সঙ্গে ফোনে কথা বলে তৌফিক একটু নিশ্চিন্ত হল। কৃষ্ণা জানাল, সোলাঙ্কীরা দু-দিন আগে কলকাতায় গেছে ওদের বাবার সঙ্গে। তারপর কৃষ্ণার সঙ্গে সোলাঙ্কীর কথাও

হয়েছে বেশ কয়েকবার। পরের বার কথা হলে কাকুকে বা সোলাঙ্কীকে সে অবশ্যই তৌফিকের কথা জানাবে।

ফোনটা কেটে দিয়ে তৌফিক আবার ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপরে। পাঁচটা রক্তবৃত্ত, পাঁচটা জায়গা।

রাখালেশ্বর

পূর্ব কালিকাপুর

নিরল

পুন্ড্র

আর... আর... চৌহাট্টা

তৌফিক গুগ্‌ল ম্যাপে সেভ করে রাখা ফাইলটা আবার খুলল। প্রিন্ট আউটগুলো ভালো করে দেখল। নাহ্, আগের দিনও সে দেখেছে এগুলো। আশপাশেই সব ক-টা, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনও লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না। তৌফিক দু-তিনবার ভালো করে দেখল পয়েন্টগুলোকে। কি হয় পাঁচটা পয়েন্ট দিয়ে? পঞ্চভুজ। কিন্তু তাতেও কোন কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

আচমকা কী মনে হতে সে একের পর এক নাম টাইপ করতে লাগল। তার মাথায় অন্য একটা ছবি ফুটে উঠেছে। সেইদিন সাঁইথিয়ার মন্দিরে বসে তারা যে তন্ত্র জ্যামিতি ফলাচ্ছিল গুগ্‌ল ম্যাপে, সেই বাঁকাটেড়া দুটো ত্রিভুজ দিয়ে বানানো স্টার অব ডেভিড্। তৌফিক সেই ছয়কোনা তারকার শীর্ষবিন্দুর নামগুলো বসাতে লাগল গুগ্‌ল ম্যাপে।

উফ! গুগ্‌ল ম্যাপে একবারে দশটার বেশি নাম আবার দেওয়া যায় না। ছয়টা শক্তিপীঠ আর পাঁচটা রক্তবৃত্ত।

উজানি

কঙ্কালীতলা

নন্দিকেশ্বরী

নলাটেশ্বরী

কিরীটেশ্বরী

বাহুলা

রক্তবৃত্তগুলোর নিজেদের মধ্যে সে কোনও প্যাটার্ন পাচ্ছিল না, কিন্তু এখন সে একটা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছে রক্তবৃত্ত আর এই শক্তিপীঠগুলোর মধ্যে।

গুগ্‌ল ম্যাপে নাম ইনপুট শেষ। তৌফিক একটা সাদা পাতাকে কম্পিউটার স্ক্রিনে চেপে ধরে ট্রেসিং করে নিল জায়গাগুলোকে।
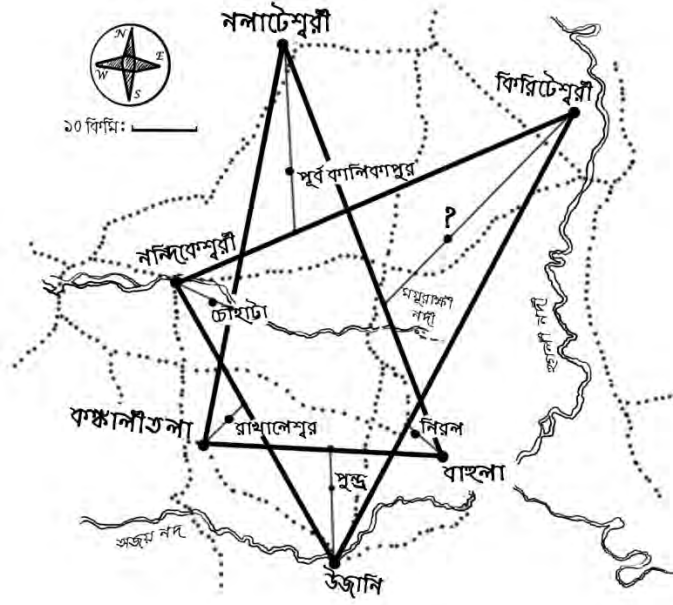
ইউরেকা! ট্রেসিং-এ চোখ রাখতেই তৌফিকের নিজেকে আর্কিমিডিস মনে হল। একটা বড় ত্রিভুজ আরেকটা বড় ত্রিভুজকে ছেদ করলে যে ছোট ছোট ছয়টা ত্রিভুজ তৈরি হয়, সেই ত্রিভুজগুলোর প্রায় ভরকেন্দ্রেই প্রতিটা রক্তবৃত্ত অবস্থিত। শুধু কিরীটেশ্বরীর দিকের ত্রিভুজটার ভরকেন্দ্রের রক্তবৃত্তটার পয়েন্টটা মিসিং। ওই পয়েন্টটার খোঁজ হয়তো পুলিশ পায়নি এখনও। তৌফিক আন্দাজে শেষোক্ত ভরকেন্দ্র বরাবর একটা পয়েন্ট এঁকে নিল। ছয়টা রক্তবৃত্ত। ছয়টা স্থান।

তৌফিক জ্যামিতি নকশা-আঁকা কাগজটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ষড়ভুজের মধ্যবর্তী গর্ভক্ষেত্রটা অনেকটা বিস্তৃত। এত বড় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কোথায় রৌম্যজাগরণ হচ্ছে, সে বুঝবে কী করে? বড় ত্রিভুজ দুটোর ভরকেন্দ্রও আলাদা আলাদা স্থানে।
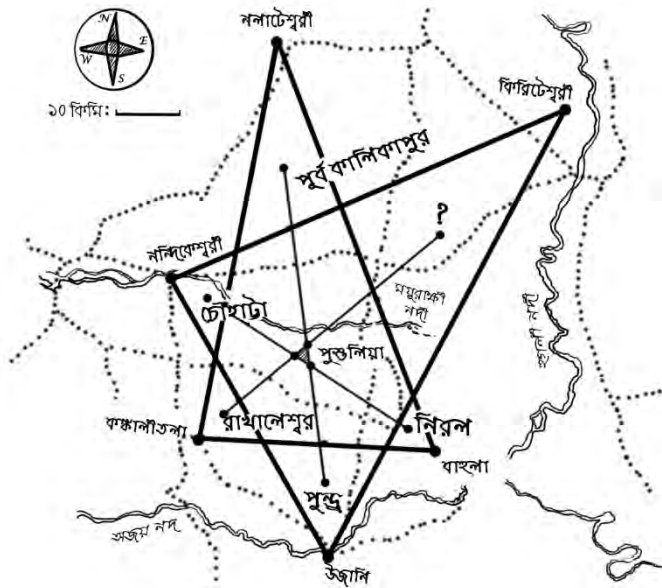
কী মনে হতে তৌফিক বিপরীত স্থানে অবস্থিত রক্তবৃত্তগুলোকে একটা করে রেখা টেনে যোগ করতে লাগল। মোট তিনটে সরলরেখা পরস্পরকে ভেদ করে একটা ত্রিভুজের জন্ম দিয়েছে। খাতার পাতায় আরও কিছুক্ষণ জ্যামিতির চাষ করে তৌফিক বুঝতে পারল, প্রত্যেকটা ছোট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রগুলো অথবা এক্ষেত্রে রক্তবৃত্তগুলো ষড়ভুজের পেটের মধ্যে একটা সমবাহু ত্রিভুজের জন্ম দিয়েছে!

সমবাহু ত্রিভুজ! সব থেকে পবিত্র এবং শক্তিশালী স্থান ত্রিভুজের নাভি। পুশুলিয়ার মাঠ!

তেত্রিশ

আগামী পরশুই পূর্ণিমা, রাস্তাঘাট চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে।

পুসানি, কাম্সুন্দী আর পুশুলিয়া – দক্ষিণে এই তিন গ্রাম দিয়ে ঘেরা বিশাল পুশুলিয়ার মাঠ। মাইলের পর মাইল দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দু-একটা বাগান, পুকুর ইত্যাদি আছে। উত্তরে আছে একটা খাল। তারপরে আবার চক সৈয়দপুরের মাঠ।

তৌফিক শেষমেশ এই জায়গাটা চিহ্নিত করেছে রৌম্যজাগরণের স্থান হিসাবে। কঙ্কালীতলা থেকে অনেকটাই দূরে, প্রায় তেইশ-চব্বিশ কিলোমিটার হবে। কঙ্কালীতলা থেকে পুশুলিয়া যেতে মধ্যিখানে গঞ্জ বলতে একমাত্র লাভপুর। বাইক চালাতে চালাতে তৌফিক ভাবছিল, সত্যিই কি কিছু পাবে সে ওখানে?

বউদি তাকে ঘণ্টা দুয়েক সময় দিয়েছে। অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকে কিছুই হবে না, তৌফিক জানে। সে শুধু একবার ঘর থেকে বেরবার রাস্তা খুঁজছিল।

পুশুলিয়ায় পৌঁছে তৌফিক মোবাইলটা বার করল। জিপিএস অন করে গুগ্‌ল ম্যাপে তার চিহ্নিত স্থানগুলো নির্দিষ্ট করল তৌফিক। রক্তবৃত্তগুলো ছোট ত্রিভুজগুলোর প্রায় ভরকেন্দ্রে অবস্থিত। ওগুলো যদি পুরুষ ত্রিভুজ হয় তাহলে এটা গর্ভক্ষেত্রের মধ্যে একটা নারী ত্রিভুজ। স্থানটা তবে সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর দিকের নাভিতে।
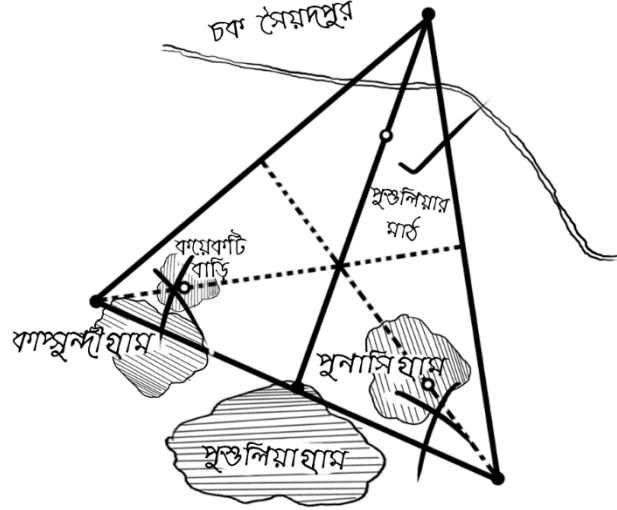
দুটো নাভি পড়েছে জনাকীর্ণ স্থানে। দুটো গ্রামের মধ্যে। পুসানি আর কাম্সুন্দী। তৃতীয় নাভিটা আছে পুশুলিয়ার মাঠের মাঝখানে। তৌফিক পুশুলিয়ার মাঠে ঢোকার আগে, পুসানি আর কাম্সুন্দী গ্রামের জায়গা দুটো ঘুরে এল। কিছু নেই ওখানে। তা ছাড়াও গ্রামের মাঝখানে রক্তবৃত্ত হলে অথবা অন্য কিছু করতে হলে হইচই হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। জয়ন্তরা নিশ্চয়ই মাঠের মাঝাখানের পয়েন্টটাকেই বেছে নিয়েছে।

শেষমেশ পুশুলিয়ার মাঠের ধারে এসে বাইক দাঁড় করাল তৌফিক। দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত জুড়ে ঘন কুয়াশার আচ্ছাদন। তৌফিক আর একবার মোবাইল খুলে দেখল, মাঠের প্রায় মাঝখানে জায়গাটা। স্যাটেলাইট ভিউ দেখাচ্ছে, এখানে একটা বাগান আছে। কাঁকর-বিছানো চওড়া পথটা বিশাল মাঠটাকে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে গেছে। মাঠ জুড়ে

বোরো ধানের চাষ হয়েছে। মাঝে মাঝে অনেক দূরে দূরে দু-একটা বাগান। কাঁকর-বিছানো রাঙামাটির চওড়া রাস্তা থেকে সরু সরু পায়ে-চলা পথ চলে গেছে বাগানগুলো পর্যন্ত।

তৌফিক বাইক নিয়ে পিচ রাস্তা ছেড়ে মাটির রাস্তায় নেমে পড়ল। গাড়ি যাবে এমন চওড়া রাস্তা। মাঠের রাস্তায় নেমে কিছু দূর যেতেই তৌফিকের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। কেউ যেন তাকে থেমে যেতে বলল। অনুভূতিটা এতটাই আচমকা এসে ধাক্কা মারল যে, তৌফিক কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল।

বাইকটা দ্রুত স্কিড করে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল ধানখেতের মধ্যে। একটু পরে কোনওমতে গোঁ গোঁ করতে-থাকা বাইকটা ঠেলে সরিয়ে তৌফিক উঠে বসল। বাইকটার তলায় তার পা আটকে গেছে। একটা চাকা শূন্যে পাক খাচ্ছে। বাইকের তলা থেকে পা-টা টেনে বার করতে করতে তৌফিক খেয়াল করল, আকাশের চাঁদ আর দেখা যাচ্ছে না। মেঘে ঢেকে গেছে সারা আকাশ। হেডলাইটের আলোয় সে দেখল, সারা মাঠ জুড়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে সাদা কুয়াশা।

হঠাৎ তৌফিকের সারা শরীর শিউরে উঠল। ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল। বিশ্রী একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরল তৌফিককে। আচমকাই তার বুকের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে একটা আতঙ্কের অনুভূতি। কে যেন তাকে বলল, একা আসাটা উচিত হয়নি একদম। তৌফিক পকেট থেকে মোবাইলটা বার করল। টাওয়ার নেই। তৌফিক ঠিক করল, এই সিমটা কালকেই ফেলে দেবে। একটু এদিক-ওদিক গেলেই আর টাওয়ার থাকে না। সে ভাগ্যিস লোকেশন সেভ করে রেখেছিল। জিপিএস দেখাচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত স্থানটি খুব বেশি দূর নয়। এক-দেড় কিলোমিটার মাত্র।

তৌফিক বাইকটা মাঠ থেকে উঠিয়ে ধানখেতের ধারে দাঁড় করিয়ে রাখল। সেটা আর কিছুতেই স্টার্ট নিল না। তৌফিক ব্যাগ থেকে পাঁচ সেলের টর্চটা বার করে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তৌফিক বুঝতে পারল তার অস্বস্তির কারণটা। কোনও শব্দ নেই কোথাও। ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, এমনকী হাওয়াও বইছে না। এক অলৌকিক নিস্তব্ধতায় ঢেকে গেছে চরাচর।

কুয়াশার মধ্যে স্যাঁত করে কী যেন একটা সরে গেল। তৌফিক ঝট করে ফিরে তাকাল। এক হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না এমন গাঢ় কুয়াশা। মোবাইল আর ঘড়িতে লাগানো কম্পাস দেখে দিক ঠিক করে নিল তৌফিক। দ্রুতপায়ে গন্তব্য স্থানের দিকে হাঁটা লাগাল মাঠ ভেদ করে।

হাঁটতে হাঁটতে তৌফিক দেখল, তার আশপাশের কুয়াশাগুলো ক্রমশ যেন জমাট বেঁধে আরও পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কে যেন তৌফিককে বলল, দৌড়ো।

কুয়াশাগুলো ক্রমশ রূপ ধারণ করছিল। তৌফিক একবার আড়চোখে দেখে ছুট লাগাল মাঠ চিরে। প্রেতাত্মার মতো জীবিত কুয়াশার দল ধাওয়া করেছে তৌফিককে।

পিছন থেকে পিঠের উপরে একটা হাত এসে পড়ল। কে যেন শক্তিশালী ধারালো থাবায় ছিনিয়ে নিল ব্যাগটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধাক্কা খেয়ে তৌফিক ছিটকে পড়ল মাঠের মধ্যে। জমাট-বাঁধা কুয়াশা ঘিরে ধরেছে তাকে। সাদা কুয়াশায় ফুটে উঠেছে ভয়ংকর

একটা মুখ। সেই মুখে ফুটে উঠল অত্যন্ত নৃশংস একটা বিশাল চোখ। সেই চোখের অমানুষিক দৃষ্টি দেখে সারা পুশুলিয়ার মাঠ যেন শিউরে উঠল তৌফিকের সঙ্গে।

চারপাশ থেকে কুয়াশাগুলো দাঁত-নখ বার করে তৌফিকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঁচার জন্যে তৌফিক হাত তুলে আড়াল করল নিজেকে। সে অনুভব করছিল, একটা ধারালো দাঁতের সারি তার জিন্‌সের প্যান্ট ভেদ করে পায়ের ডিমে ঢুকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে তার মণিবন্ধে ছড়িয়ে পড়ছে একটা অস্বাভাবিক জ্বালা-ধরা ভাব। আচমকা তার হাতের সাদা সুতোর মতো দাগটা বিনা আলোতেই ঝিকিয়ে উঠল। কুয়াশার মধ্যে থেকে সেই চোখ, মুখ, দাঁত, নখ মিলিয়ে গেল, ঠিক যেমন জেগে উঠেছিল।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের দলের মতো গাঢ় কুয়াশার দল এখনও ঘিরে রয়েছে চারপাশ। এখনও শ্মশানভূমির নিস্তব্ধতা চাদর বিছিয়ে রেখেছে বিস্তীর্ণ পুশুলিয়ার মাঠে। সে অনুভব করল, তার সারা দেহ কাঁপছে। হাতের সাদা সুতোর মতো দাগটা তার কৃষ্ণাঙ্গে বিদ্যুৎরেখার মতো ঝলকাচ্ছে থেকে থেকে। 'লা ইলাহা ইল্লা... রসুল্লাল্লাহ্...' বিড়বিড় করতে করতে তৌফিক উঠে দাঁড়াল ভূমিশয্যা ছেড়ে।

এই মাঠে পা দেওয়ার আগেও সে জিন-পির-তাগা-তাবিজ কিচ্ছু মানত না। জীবন্ত কুয়াশার দল এখনও তাকে ঘিরে রয়েছে, কিন্তু তার কাছে ঘেঁষছে না। '...ইল্লাল্লাহু মহম্মদুর রসুল্লা...' শব্দগুলো জপ করতে করতে তৌফিক মনে সাহস আনার চেষ্টা করল। পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। জিন্‌সের উপরে নখরাঘাতের চিহ্ন। রক্ত বেরচ্ছে ছেঁড়া জায়গাটা থেকে। মোবাইল আর টর্চটা কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে। তৌফিক লক্ষ করল, সে বাগানটার একদম কাছেই চলে এসেছে। একটু দূরেই কুয়াশার মধ্যেও বাগানের কালো গাছগুলোর ঝুপসি ছায়া দেখা যাচ্ছে।

তৌফিক কাঁপা কাঁপা পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে লাগল। তার কবজিতে জ্বালা-ধরা ভাবটা একই রকম আছে। সুতোর মতো দাগগুলো ঝলকে ঝলকে উঠছিল। তৌফিক অনুভব করছিল, তাকে ভর করে অন্য কোনও অদৃশ্য সত্তা দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই। তৌফিকের সাহস ফিরছিল।

***

শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বাগানটায় পৌঁছাল তৌফিক। বাগানের মধ্যে পা রাখতে তৌফিক খেয়াল করল, কুয়াশার দল মুছে গেছে। অদৃশ্য এক বেড়ার ওপাশে মাঠের ধারে থমকে আছে তারা। আকাশে মেঘ নেই। চন্দ্রকিরণে ধুয়ে যাচ্ছে বড় বড় ঝুপসি কালো গাছ। তৌফিক হাঁপ ছাড়ল। মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়। এমনকী জীবজন্তু, পাখি, মায় সাপ, নেউল; কিন্তু অশরীরী অলৌকিক জিনিসের সঙ্গে কীভাবে লড়বে সে!

বিশাল বিশাল গাছের চন্দ্রাতপ চুঁইয়ে নেমে আসা জ্যোৎস্নায় তৌফিক সাবধানে এগতে লাগল শব্দ লক্ষ্য করে।

বাগানের মধ্যে গাছপালার আড়ালে একটা মাঠকোঠা বাড়ি। তার খোলা সদর দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে বাইরের বাগানে। তৌফিক গাছের আড়াল থেকে লক্ষ

করল বাড়িটাকে কিছুক্ষণ। নিস্তব্ধতা গ্রাস করছে বাড়িটাকে। এখানে কি কিছু আছে? কেউ আছে?

সদর দরজা খোলা তবু তৌফিক বাড়ির দেওয়াল-লাগোয়া একটা গাছ খুঁজে নিয়ে সেটায় উঠল। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল টালির ছাতে। একটা বড় উঠোন ঘিরে চতুর্দিকে ঘর। একদিকে গলিপথ, তারপর সদর দরজা। উঠোনের মাঝখানে একটা চারকোনা বেদি বানানো। তার মধ্যে একটা বিশাল রক্তবৃত্ত।

তৌফিকের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। রক্তবৃত্তটা জ্যান্ত। মাটিটা কেমন যেন ফুলে ফুলে উঠছে। যেন বিশাল একটা কড়াইতে টগবগ করে ফুটে চলেছে লালচে-কালো রক্ততরল। এটা কি গত অমাবস্যায় বানানো হয়েছে?

রক্তবৃত্তের চারধারে মশাল পোঁতা। সেই আলোয় বেদিটা দেখতে দেখতে তৌফিক হঠাৎ চমকে উঠল। বেদির একপাশে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা সোলাঙ্কী!

এ এখানে কী করে এল? জয়ন্তর দল কি ওদেরকে কিডন্যাপ করেছে? তাহলে কৃষ্ণা যে বলল, সোলাঙ্কীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে, ওরা এখন কলকাতায়। শাম্ভবী! শাম্ভবী কোথায়?

চুপচাপ টালির ছাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তৌফিক। সোলাঙ্কী ছাড়া আর কোনও প্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও। জয়ন্তকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদের দলটা কি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে? সোলাঙ্কীকে ফেলে রেখে পালিয়েছে বাকিরা?

এদিক-ওদিক দেখে টালির ছাত থেকে বিড়াল-পায়ে উঠোনে নেমে এল তৌফিক। সোলাঙ্কীকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। শাম্ভবীকে খুঁজে পেলে, ওকেও নিয়ে যেতে হবে।

তৌফিক দ্রুত ছুটে এসে সোলাঙ্কীর বাঁধন খুলে দিল। তৌফিককে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল সোলাঙ্কী। তার সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে। মুখে বাঁধা কাপড়টা খুলতেই সোলাঙ্কী চেঁচিয়ে উঠল, 'তৌফিকদা!'

তার দৃষ্টি তৌফিকের কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে নিবদ্ধ।

ব্যাপারটা বুঝতে তৌফিকের সেকেন্ডের ভগ্নাংশও লাগল না। সে দ্রুত সোলাঙ্কীকে জড়িয়ে ধরে গড়িয়ে গেল উঠোনের একপাশে। পরক্ষণেই তৌফিক যেখানে ছিল, সেখানে একটা বাঁশের লাঠি আছড়ে পড়ল। সোলাঙ্কীকে আড়াল করে তৌফিক এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

বেদির ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে একটা সাধু। তার মাথা লক্ষ্য করে লাঠি চালিয়েছিল। সোলাঙ্কী চিৎকার না করলে সে এতক্ষণে বেহেস্তের পথে যাত্রা করত।

আশপাশের ঘর থেকে দু-তিনজন সাধু বেরিয়ে এসেছে। এই সাধুগুলো কি লুকিয়ে থেকে সোলাঙ্কীকে পাহারা দিচ্ছিল?

কথাটা ভাবতে ভাবতেই তৌফিক দেখল, সাধুটা আবারও লাঠিটা তুলছে। দ্বিতীয়বার সে সাধুটাকে লাঠিটা বসানোর সুযোগ দিল না। দ্রুতগতিতে দু-পা এগিয়ে গিয়ে চমৎকার একটা আপার কাট বসাল সাধুটার থুতনিতে।

সাধুর হাত থেকে লাঠিটা খসে পড়ল। সে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। পরক্ষণে যেটা ঘটল, সেটার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। বেদির উঁচু মাটিতে পা আটকে সেই সাধু পড়ে গেল রক্তবৃত্তের মধ্যে।

তৌফিকের চোখের সামনেই রক্তাক্ত মাটিটা মুহূর্তের মধ্যে চোরাবালির মতো সাধুটাকে গিলে ফেলল। একটা মরণান্তিক তীক্ষ্ণ চিৎকার ভাসতে লাগল বাতাসে। বগবগ করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল মাটিটার মধ্যে থেকে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকের মতো তৌফিকও ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু সবার আগে সে-ই সংবিৎ ফিরে পেল। দ্রুত সোলাঙ্কীকে মাটি থেকে টেনে তুলল তৌফিক।

দেখল, উঠোনের এক ধারের খোলা দরজাটা সাধুগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। একটা মাটির দাওয়ায় উঠে তৌফিক দ্রুত সোলাঙ্কীকে কোলে তুলে নিল।

'আমার কাঁধে ভর দিয়ে টালির চালে ওঠ্। ওপাশ দিয়ে নেমে, পালা তুই। আমি এদেরকে আটকাচ্ছি।'

সোলাঙ্কী টালির চালের উপরে শরীরটাকে উঠিয়ে নেওয়ার পরমুহূর্তেই, কে যেন তৌফিককে প্রায় বেড়ালছানার মতোই ঘাড় ধরে তুলে ছুড়ে দিল উঠোনের মাঝখানে।

মাটিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে তৌফিক দেখতে পেল, একটা দৈত্যের মতো চেহারার সাধু এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনের মাঝখানে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৌফিক প্রায় স্প্রিং-এর মতোই উঠে দাঁড়াল। তৌফিক নিজে বেশ লম্বা, কিন্তু এই সাধুটা তৌফিকের থেকেও আধ হাত লম্বা হবে। ঘাড়ে-গর্দানে মোটা একটা ষাঁড়ের মতো।

দৈত্যটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করার আগেই, তৌফিক শরীরটাকে প্রায় ভূমির সমান্তরালে হেলিয়ে বাঁ পা-টা সমকোণের থেকে বেশি উচ্চতায় তুলে সে চমৎকার একটা কিক বসাল দৈত্যটার চোয়ালে। পালটা অভিঘাতে তৌফিকের গোড়ালি ঝনঝন করে উঠল।

দৈত্যটা সত্যি ক্ষমতাবান! এত কড়া একটা লাথির পরেও, সে একটা পিস্টনের মতো ঘুষি কষাল তৌফিককে লক্ষ্য করে। ঘুষিটা লাগলে তৌফিকের খবর ছিল। কিন্তু তৌফিক আকারে ছোট হলেও, দৈত্যটার থেকে অনেক বেশি ক্ষিপ্র। সে শরীরের এক মোচড়ে পাশ কাটাল ঘুষিটা। সাধুটাকে তৌফিক পালটা আক্রমণের সুযোগ দিল না। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, ওই সাধুটার একটাও আঘাত তার শরীরে লাগলে তাকে মাটি ছেড়ে আর উঠতে হবে না। পরের পর অস্বাভাবিক দ্রুততায় তার বেশ কিছু লাথি আছড়ে পড়ল দৈত্যটার মাথার দু-পাশে, চোয়ালে। একসময় দৈত্যটা ছোটখাটো একটা ভূমিকম্প তুলে উলটে পড়ে গেল মাটিতে।

দৈত্যটা যেন সম্পূর্ণ উঠোন দখল করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে উলটে পড়ে যেতে তৌফিক দেখল, সাধুগুলো হাতে টাঙ্গি, ত্রিশূল, কৃপাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তৌফিক মাটিতে পড়ে-থাকা বাঁশের লাঠিটা তুলে নিল। আড়চোখে একবার দেখল সোলাঙ্কী টালির উপরে দাঁড়িয়ে নেই। এদেরকে যে করেই হোক আটকাতে হবেই।

কিন্তু দুটো সাধুকে আহত করার পরেই তৌফিক বুঝল, সে আর পারছে না। তার কাঁধের যন্ত্রণাটা বাড়ছে। হাত কাঁপছে। গতি কমে আসছে। আঙুল-কাটা পায়ে একটা

অসহ্য টনটনানি ব্যথা ক্রমে মাস্‌ল বেয়ে উপরে উঠছে। এখনও দুজন বাকি।

ঠিক সেই সময় একটা অত্যন্ত মোলায়েম পুরুষকণ্ঠ তাকে পিছন থেকে নরম সুরে ডাকল, ‘তৌফিক।’

তৌফিক এক ঝটকায় পিছন ফিরল। সোলাঙ্কীর কানের ফুটোয় একটা রিভলভারের নল ঠেকানো। মশালের আলোয় কালো রিভলভারটা চকচক করছিল। জয়ন্ত! প্রচণ্ড এক আঘাতে তৌফিকের চোখের সামনে দ্রুত একটা কালো পরদা নেমে এল।

চৌত্রিশ

সকালে রজত চলে যাওয়ার পরে সুরমাদেবী মাথায় হাত দিয়ে ছাতের উপরেই বসে পড়লেন। জানালার ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ গিয়ে পড়ছিল থালা ভরতি দুধ আর নরকরোটির উপরে। অচিন্ত্য আর কৃষ্ণা সামান্য কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল দরজাটার পাশে।

'কত বড় সর্বনাশ করতে চেয়েছিল শয়তানটা আমাদের! আমি ঠিক জানতাম, ও ছেলে তন্ত্রমন্ত্র জানে। কী ভাগ্যিস সাধুজি বাড়িবন্ধন করিয়ে দিয়েছিলেন, তা-ই আজ আমার মেয়েটা প্রাণে বেঁচে গেল।'

'বাড়িবন্ধন!' অচিন্ত্য চমকে উঠল। ঠিক তাদের জন্মদিনের দিনই তো 'বাড়িবন্ধন' করে গিয়েছিল ওই সাধুজি। অচিন্ত্যর মনে ক্ষীণ আশা জাগল। যদি 'বাড়িবন্ধন'-এর জন্য 'ডাক'টা বাইরে না গিয়ে থাকে। অচিন্ত্য কখনওই চায় না চন্দ্রমৌলির প্রেতাত্মা ফিরে আসুক। অচিন্ত্য তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'আমি ওগুলোকে ফেলে দিয়ে আসব।'

'না। খবরদার। ওইসব ভয়ংকর জিনিসে একদম হাত দিবি না। তোর দাদু বাড়ি ফিরুক। দেখেটেখে কিছু একটা করবে।'

'ঠিক আছে।' অচিন্ত্য মনে মনে বেশ খুশি হয়েই ঘাড় নাড়ল। ঘরটায় তালাচাবি লাগিয়ে দিল আবার।

দুপুরবেলা কৃষ্ণা ঘরে শুয়ে শুয়ে একলা ঠ্যাং নাচাচ্ছিল। দাদু গতকাল সন্ধ্যাবেলা লতাদিকে নিয়ে কলকাতা গেছে। মামা আর জামাইবাবুকে নাকি কলকাতার কোর্টে তোলা হবে। লতাদি কী সব বললে জয়ন্তদা আর মামা জামিন পেয়ে যাবে। আজ সকালে কৃষ্ণার বাবা ফোন করে জানিয়েছে, পুলিশ নাকি কী একটা অর্ডার জারি করে জয়ন্তদা আর মামাকে আটকে দিয়েছে। কোর্টে ওঠায়নি। ওদেরকে নিয়ে কৃষ্ণার বাবা-মা আসছে বোলপুরে।

এর মধ্যেই দাদাইটা আবার দাদুর কান ভাঙিয়েছে তৌফিকদার কাণ্ডগুলো বলে। দাদু রেগে ফায়ার। বলেছে, থালাটা যেমন আছে, তেমনই যেন রাখা হয়। ওটা দেখিয়ে তৌফিকদা আর তৌফিকদার পুলিশ বন্ধু, দুটোকেই জেলে পাঠাবে দাদু।

কথাটা শুনে থেকে কৃষ্ণার মনটা খারাপ হয়ে আছে। এ বাড়িতে সবার মধ্যে দাদুই যা একটু তৌফিকদাকে পছন্দ করত। কিন্তু তৌফিকদা এমনসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে যে শেষমেশ দাদুও রেগে গেছে তৌফিকদার উপরে।

কৃষ্ণা উঠে বসল। একটু আগেই তৌফিকদা ফোন করে খোঁজ নিচ্ছিল শাম্ভবীদের। তারপরেই কৃষ্ণা মনস্থির করেছে। তৌফিকদা লতাদিকে বশীকরণ করতে চায় কি না, সে জানে না। কিন্তু ওইসব জিনিস দেখিয়ে দাদু যদি সত্যি তৌফিকদার নামে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে, আর পুলিশ যদি ইনভেস্টিগেট করে তৌফিকদাকেই খুঁজে পায়, তাহলে তৌফিকদার জেল হয়ে যাবে। আজকাল এইসব ব্যাপারে আইনকানুন নাকি বেশ কড়া। একটু আগেই দাদুর কাছ থেকে শুনে দাদাই তাকে বলে গেছে। নাহ্, তৌফিকদাকে এইভাবে ফাঁসতে দেবে না সে।

খাওয়ার সময় সবাই একতলায় নেমে যেতে, ছাতের ঘরের চাবিটা কৃষ্ণা অচিন্ত্যর ড্রয়ার থেকে হাতসাফাই করল। দুপুরবেলা সুযোগ বুঝে চুপিচুপি ছাতের ঘরে উঠে এল কৃষ্ণা।

পিতলের থালা ভরতি দুধের উপরে সাজানো জিনিসটা একইভাবে রাখা আছে মেঝের উপরে। কৃষ্ণা থালাটা হাতে করে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। নিজের ঘরে এসে একটা খবরের কাগজ চাপা দিয়ে নিল সে। রাস্তায় কেউ না দেখে ফেলে, একেবারে কোপাইতে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে আসবে কৃষ্ণা এটা। শীতের ছোট দুপুর দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। গোধূলিলগ্নের অদ্ভুত লালচে আভায় ভরে গেছে প্রকৃতি। দু-হাতে থালাটা ধরে বিশাল কালো গেটটা পায়ে ঠেলে উপাধ্যায়বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল কৃষ্ণার সামনে। তারকনাথ বিমলচন্দ্র আর জয়ন্তকে ছাড়িয়ে এনেছেন থানা থেকে।

নিজেকে সামলানোর আগেই খবরের কাগজটা উড়ে গেল। পরক্ষণেই একটা আতঙ্কের শব্দ বেরিয়ে এল কৃষ্ণার মুখ থেকে। পরক্ষণেই কৃষ্ণা থালাটা প্রায় ছুড়ে ফেলে দিল হাত থেকে। নরকরোটি আর থালাটা ছিটকে পড়ল কাঁকুরে রাস্তার উপরে। একট বল গড়িয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল।

কৃষ্ণার পায়ের কাছে থালা ভরতি লাল রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার উপরে। রক্তে ভিজে গেছে রাস্তা, কৃষ্ণার পা।

পঁয়ত্রিশ

স্মেলিং সল্টের তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে তৌফিকের জ্ঞান ফিরল। মাথাটা একটু নাড়ানোর চেষ্টা করতেই ঘাড় থেকে শিরদাঁড়া পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল। যন্ত্রণা সয়ে আসতে তৌফিক বুঝল, সে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো মাথার উপরে জড়ো করে কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। টি-শার্টের কলারটা রক্তে ভিজে গেছে।

'উঠুন তৌফিকবাবু।' স্মেলিং সল্টের শিশিটা বন্ধ করতে করতে জয়ন্ত বলল।

জয়ন্ত! সামান্য চোখ খুলে জয়ন্তর পজিশনটা দেখেই, তৌফিক স্প্রিং-এর মতো পা চালাল জয়ন্তর তলপেট লক্ষ্য করে। জয়ন্ত ছিটকে পড়ল কয়েক ফুট দূরে। তার হাত থেকে স্মেলিং সল্টের শিশিটা গড়িয়ে গেল ঘরের কোণে। আচমকা তৌফিক পা চালাবে, সে বুঝতেই পারেনি। মাটি ছেড়ে উঠতে তার একটু দেরি হল। সাপের মতো ঠান্ডা চোখে কিছুক্ষণ মাপল তৌফিককে। মোলায়েম গলায় ডাকল, 'বিশু।'

পরক্ষণেই একটা মেয়েলি কণ্ঠের আর্তনাদে তৌফিক চমকে উঠল। সোলাঙ্কী! ঘরের অন্যদিকে তাকাতেই তৌফিক দেখল, সোলাঙ্কী মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে। তার পায়ের কাছে বিশু ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা ছোট্ট কালো রঙের টিভি রিমোটের মতো জিনিস। মাথার কাছে দুটো ধাতব অংশ বেরিয়ে আছে। জিনিসটা তৌফিক চেনে। স্টানগান। ইলেকট্রিক শক দেওয়ার জন্যে পুলিশরা ব্যবহার করে। সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশে কয়েক হাজার ভোল্টের ঝটকা। অসহ্য রকমের যন্ত্রণা হয়।

বিশু দ্বিতীয়বার সোলাঙ্কীকে শক দেবার জন্যে নিচু হতেই তৌফিক চেঁচিয়ে উঠল, 'না!'

বিশু একবার তৌফিকের দিকে তাকাল শুধু। পরক্ষণেই স্টানগানটা চেপে ধরল সোলাঙ্কীর পায়ে। সোলাঙ্কী যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। তৌফিক এবার জয়ন্তর দিকে ফিরে ছটফট করে উঠল, 'জয়ন্ত। প্লিজ। আই অ্যাম সরি। ডোন্ট হার্ট হার। প্লিজ।'

'বড্ড ছটফটে আপনি তৌফিকবাবু। তবে চিন্তা নেই, আপনার জন্যেও আমার অন্য খেলনা আছে। একটু পরেই দেখতে পাবেন। ওটার স্বাদ একবার পেলে আপনি একদম ঠান্ডা হয়ে যাবেন।' জয়ন্ত চিনি-মাখানো গলায় বলল। 'আপনি যতই পাঞ্জা লড়তে চান, আপনার সঙ্গে সাপ-লুডো খেলাটাই ভালো। আপনার ভাগ্যটা একদমই খারাপ। সর্বক্ষণ সাপের মুখেই পড়ে আছেন। এই ঘরটা চিনতে পারছেন?'

তৌফিক কোনও কথা বলল না।

নিচু ছাতওয়ালা ঘরটায় একটাও জানালা নেই। মাথার উপরে লম্বা লম্বা কাঠের কড়িবরগা। ঘরের একধার দিয়ে একটা মাটির সিঁড়ি উঠে গেছে। ছাতের কাছে একটা চাপা দরজা। তৌফিকের মনে হল ঘরটা মাটির তলায়। বাইরের ঠান্ডার বিন্দুমাত্র আভাস ঘরটায় নেই। একটা ভ্যাপসা গুমট ভাব।

তৌফিকের মুখের ভাব লক্ষ করেই জয়ন্ত আবার বলে উঠল, 'চিনতে পারছেন না? আমার আর লতার বিয়ের সময় এই ঘরে আপনি পাঁচ-পাঁচটা দিন কাটিয়ে গেলেন। লতাকে সে সময় একবার এখানে আমি এনেছিলাম। বড্ড ঝামেলা করছিল বিয়ে নিয়ে, তারপর আপনার অবস্থা দেখে... সে যা-ই হোক। এই জায়গাটা খুঁজে পেলেন কী করে?'

তৌফিক ইতস্তত করছিল। আবার সোলাঙ্কী চিৎকার করে উঠল। দেওয়ালের গায়ে সিঁটিয়ে গেছে মেয়েটা। থরথর করে কাঁপছে। ব্যথায় ভয়ে কচি পানপাতা মুখটা নীল হয়ে গেছে। বিশু নিষ্ঠুর শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বেচাল দেখলেই সোলাঙ্কীকে... তৌফিক আর চুপ থাকতে পারল না। সে জানিয়ে দিল কীভাবে খুঁজে পেয়েছে এই জায়গাটা।

'মার্ভেলাস! অবশ্য আমি যখনই শুনেছি আপনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন অথচ উপাধ্যায়বাড়ির দিকে জাননি, তখনই আমার মনে হয়েছিল, আপনি কোনওভাবে এই জায়গাটার খোঁজ পেয়েছেন। কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি পুশুলিয়ার মাঠটাও টপকে চলে আসবেন। তবু সাবধানের মার নেই বলেই আপনার জন্য আসর সাজিয়ে বসেছিলাম।' জয়ন্ত একটা ছোট টুল টেনে এনে বসল।

'স্থানবন্ধনটা পেরলি কী করে?' জয়ন্ত আপনি থেকে সরাসরি তুইতে নেমে এসেছে। কোনও কারণে সে একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তৌফিক প্রথমে বুঝতে পারল না জয়ন্তর প্রশ্নটা। জয়ন্ত আবার বলল, 'আরে, পুশুলিয়ার মাঠটা টপকালি কী করে? ওটা তো স্থানবন্ধন করা আছে।'

'জানি না।' বলেই তৌফিক বিশুর দিকে তাকাল। সে আবারও সোলাঙ্কীকে শক দিতে যাচ্ছিল। তৌফিক চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যি জানি না। বিশ্বাস করুন।'

জয়ন্ত হাত তুলে বিশুকে থামাল, 'শাম্ভবী রক্তবৃত্তের মধ্যে কী করেছিল তোকে?'

তৌফিক ঢোক গিলল, বলে দিল সেদিন রাত্রে কী কী ঘটেছিল।

'আরে! কালসূত্র প্রাণবন্ধন! এ তো অতি প্রাচীন ক্রিয়াপদ্ধতি! এর নিয়মকানুন তো কয়েক হাজার বছর আগেই হারিয়ে গেছে।' জয়ন্ত অবাক গলায় বিড়বিড় করল। 'বীজ এই পদ্ধতি জানল কী করে?'

তৌফিক ঘাড় নাড়ল। সে জানে না। চাঁদের ডায়েরিতে লেখা ছিল শব্দটা। তৌফিকের মন বলছিল, শাম্ভবী কোনওভাবে চন্দ্রমৌলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। চন্দ্রমৌলির থেকে জেনেছে ওই ক্রিয়াপদ্ধতি। যতক্ষণ না তৌফিক চন্দ্রমৌলিকে ডাক পাঠায়, ততক্ষণ যেন কেউ তৌফিককে বশ না করে। শাম্ভবী নিশ্চয়ই এটাই চাইছিল।

'ওটা কীসের রিচুয়ালস ছিল?' জয়ন্ত একটু গুম মেরে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল।

'কোনটা?'

'কাল রাতে যেটা করেছিস লতাদের ছাতে। দুধ রক্ত হয়ে যায়। কী ওটা?' জয়ন্ত অধৈর্য গলায় বলে উঠল।

'দুধ রক্ত হয়ে যায়!' তৌফিক চমকে উঠল। কিন্তু দুধটা তো সাদাই ছিল কাল রাতে। তাহলে কি কোনওভাবে সে চলে আসার পরে কিছু হয়েছে। 'ইনসাল্লাহ্'। তৌফিক ঠিক করে নিল, সে এদেরকে সত্যি কথাটা বলবে না। 'বশীকরণ।'

'বশীকরণ!' জয়ন্ত যেন ঠিক বিশ্বাস করল না তৌফিকের কথাটা। 'ওই প্রক্রিয়া কোথায় পেলি?'

'মাজারে। এক পির এসেছিল...' তৌফিক কথাটা শেষ করতে পারল না, সোলাঙ্কী চিৎকার করে উঠল। তৌফিকের গলা কেঁপে গেল, 'না। না। জয়ন্ত। স্টপ হার্টিং হার।'

'দেন ইউ মাস্ট নট লাই।' জয়ন্ত উঠে এল তৌফিকের কাছে। 'কী ছিল ওটা?'

তৌফিক দ্রুত ভাবছিল। অচিন্ত্য খানিকটা আন্দাজ করেছিল, সে কী করছে। জয়ন্ত আদৌ কতটা কী জানে?

'ওটা বশীকরণ ওঠাবার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম, লতাকেও বুঝি বশীকরণ করা হয়েছে।' তৌফিক জয়ন্তর চোখে চোখ রেখে বলল।

জয়ন্তর ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কোথা থেকে জানলি ওই ক্রিয়াপদ্ধতি?'

'চন্দ্রমৌলি আমাকে বলেছিল। অনেকদিন আগে।' তৌফিক মরিয়া হয়ে উঠল।

'আচ্ছা!' জয়ন্ত যেন একটু চিন্তিত হয়ে উঠল।

আল্লাহ্, জয়ন্ত যেন মিথ্যেটা ধরে না ফেলে। মনে মনে ভাবল তৌফিক। জয়ন্তর মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যে তৌফিক আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'লতাকে বিয়ে করলেন কেন?'

জয়ন্ত কৌতুকের চোখে তাকাল তৌফিকের দিকে, 'ওটা না হলে যেটা করতে হত, সেটা হচ্ছে কিডন্যাপ। তাতে করে হইচইটা বড্ড বেশি হত। এতদিন ধরে চুপচাপ কাজ করতে পারতাম না আমরা। একেই বেঙ্গল বড্ড ক্রাউডেড। তবে আপনি আমাদের একটা টাফ কমপিটিশন দিয়েছেন। বয়স কত আপনার?' জয়ন্ত আবার তার ব্যঙ্গাত্মক স্বরে ফিরে গেছে।

'একুশ।'

'বাহ্ বাহ্। এই বয়সের রক্ত একটু বেশিই গরম থাকে। সেই যে কবি কী যেন বলেছিল, 'একুশ বছর বয়সের নেই ভয়...' জয়ন্ত একটা সিগারেট ধরাল।

'ওটা আঠারো।' তৌফিক শান্ত স্বরে বলল।

'ওই হল তৌফিকবাবু। যাহা আঠারো, তাহাই একুশ। মান-অপমানবোধটা একটু বেশিই থাকে। লতাটাও সেরকম। একটু সুযোগ পেয়েছে কী, গ্রাম থেকে আপনাকে তাড়ানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অবশ্য লতাকে তার কাজের ফল ভোগ করতে হয়েছে। তবে আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি সহজে লতাকে ছাড়বেন না, বিশেষত যেখানে আপনাদের রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। কিন্তু আপনিও মশাই ট্রেনের টিকিটফিকিট কেটে রেডি। তা-ই আপনার ছোট্ট ভাইঝিটাকে একটু বিপদে ফেলতে হল।'

তৌফিকের মনে পড়ল, শাম্ভবী মাঝে মাঝেই বলছিল, 'ওরা তোমায় যেতে দেবে না। শাহজাদির বিপদ।' হাত খোলা থাকলে তৌফিক আগে জয়ন্তর গলা টিপে ধরত। জয়ন্ত সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল তৌফিকের মুখের উপর, 'আপনাকে আটকে রাখার বড্ড দরকার ছিল। সেটা বুঝতে পারছেন আশা করি।'

'কেন? আমাকে কেন?'

'মা কালসিদ্ধা স্বয়ং আপনাকে চেয়েছে যে। চন্দ্রগ্রহণের সময় লতার সঙ্গে আপনাকেও আহুতি দেওয়া হবে রক্তবৃত্তে। আপনার ভাগ্যের সত্যি কোনও তুলনা হয় না। বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও মা আপনাকেই চেয়েছে।'

'মা কালসিদ্ধা!?'

জয়ন্ত তৌফিকের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল, বলল, 'আপনিও কিছুতেই আসবেন না উপাধ্যায়বাড়িতে। ত্রাটকের হ্যাপা জানেন? তৈরি হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে কাজ সারতে

হয়। একে তো অত জটিল যজ্ঞ! অত উপাচার। তার উপরে আবার টাইম লিমিট। তাই তো আর উপায় না পেয়ে, প্রেগন্যান্সির টাইমটা ডিসক্লোজ করতে হল।'

'মণিদি আপনাদের দলে!' তৌফিক যারপরনাই অবাক হল।

'তা কেন হবে? ওই ডাক্তারকে শুধু লতাকে চেক করার জন্যে ডেকে পাঠানোটাই কাজ ছিল। বাকিটা সে স্বাভাবিক মেয়েলি কৌতূহল আর বুদ্ধিতে করে দিয়েছে। আর আপনিও ফাঁদে পা দিলেন।'

'লতার বাবা-মা...'

'আপনি পাগল নাকি তৌফিকবাবু?' জয়ন্ত মেয়েদের মতো খিলখিলিয়ে হাসল, 'এসব কথা দশ কান করতে আছে নাকি? এগুলো সব মন্ত্রগুহ্য ব্যাপারস্যাপার। ওরা জানত, আপনার আর লতার মধ্যের রিলেশনটা কাটানোর জন্যে যজ্ঞ হচ্ছে।'

'আমাকে ভোরবেলা কঙ্কালীতলা সাঁকোর সামনে আসতে বলেছিলেন কেন?' তৌফিক জিজ্ঞেস করল।

'আপনি সত্যি পারেন। ভাগ্যের খেলায় না নেমে পাঞ্জা লড়লে আপনিই হয়তো জিতে যেতেন। কী সুন্দর নিজের পায়ের আঙুলটা নিজেই কেটে ফেললেন। শুধু প্রমাণ করার জন্য, যে আপনি বশ হয়েছেন। গ্রেট।' জয়ন্ত প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আপনি সেইদিন সকালে কঙ্কালীতলায় এলে লতাকে পেতেন। আপনাকে আর লতাকে আমরা একসঙ্গে উঠিয়ে নিয়ে আসতাম এই বাড়িতে। কিন্তু সবাই জানত, আপনি লতাকে কিডন্যাপ করেছেন। কী ভালো প্ল্যান না?'

তৌফিক কিছু বলল না। ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইল। জয়ন্ত নিজের থেকেই আবার বলল, 'প্ল্যানটা আপনি ভন্ডুল করেছেন। এখন ওই বাড়ি থেকে লতাকে বের করে আনাটা একটা বড় সমস্যা। তবে রাস্তা একটা ঠিকই বেরিয়ে যাবে। কী বলেন তৌফিকবাবু?'

জয়ন্তর শ্লেষটা অগ্রাহ্য করে তৌফিক জিজ্ঞেস করল, 'ওই রক্তবৃত্তগুলো কি রৌম্যজাগরণের জন্য?'

জয়ন্ত একবার সরু চোখে তাকাল তৌফিকের দিকে। বলল, 'হ্যাঁ। রৌম্যজাগরণের জন্যই। ওই ছয়টা রক্তবৃত্ত তৈরি করা হয়েছে ছয় মাস ধরে। একেক মাসের অমাবস্যায় একেকটা। প্রত্যেকটা রক্তবৃত্তে একজন করে আহুতি দেওয়া হয়েছে। একটু আগে আপনি দেখলেন, রক্তবৃত্তে মানুষ পড়ে গেলে রক্ত বেরিয়ে আসে। ওটাকে আমরা বলি প্রসাদি রক্ত। লতার প্রেগন্যান্সি দু-মাস হওয়ার পর থেকেই ওকে রক্তবৃত্তের রক্ত খাওয়ানো শুরু হয়েছে। ছয় মাসে ছয়টা। আর নবম মাস হওয়ার পরে রটন্তী কালীপুজোয় তৈরি হয়েছে এই রক্তবৃত্তটা। অন্যগুলোর সঙ্গে এটার পার্থক্য কী বলুন তো তৌফিকবাবু?'

'এটা জ্যান্ত। অন্যগুলো মৃত।' যেরকম মনে হয়েছিল, সেটাই বলে দিল তৌফিক।

'কারেক্ট।' জয়ন্ত প্রশংসার চোখে তাকাল তৌফিকের দিকে। 'রিয়েলি আপনার ব্রেইনের তুলনা করতে হয়। সাধারণত রক্তবৃত্ত তৈরি হয় অমাবস্যায়। মন্ত্র পড়ার পরে সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য খোলা থাকে। কিন্তু এই ভাবে ছয়কোনা তারকা বানিয়ে গর্ভক্ষেত্রে রক্তবৃত্ত তৈরি করলে, ওই কেন্দ্রস্থ রক্তবৃত্ত খোলা থাকে টানা পনেরো দিন। পরবর্তী পূর্ণিমা

পর্যন্ত। এইজন্য রৌম্যজাগরণের সময় সর্বদা এই জ্যামিতিক নকশাতেই রক্তবৃত্ত স্থাপন করা হয়।'

'কিন্তু রক্তবৃত্তগুলো তো কোনও শক্তিপীঠে ছিল না।' তৌফিক প্রশ্নটা করেই ফেলল। তার খুব জানতে ইচ্ছা করছিল, শক্তিপীঠকে শীর্ষ ধরে বানানো তারকার ছোট ত্রিভুজের নাভিগুলোতে কেন রক্তবৃত্ত তৈরি করা হয়েছে।

'না। শক্তিপীঠকে সর্বদা শীর্ষে রাখতে হয়। কারণ ওইগুলো হল গণহত্যার স্থান। মাত্র এক-দেড়শো বছর আগেও ওই প্রত্যেকটা স্থানে নরবলি হত। রৌম্যজাগরণের সময় ছয়কোনা তারকার শীর্ষবিন্দুতে গণহত্যার স্থানকে স্থাপন করাই নির্দেশ। তাতেই আচার সফল হয়।' কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ জয়ন্ত টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একবার ঘড়ি দেখল।

'এবার আপনার ব্যবস্থাটা করেই ফেলি। আমাকে আবার বীজ বপন করতে হবে। টাইম হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছিলেন, কেন এইবারে বাড়ি এসে লতা কাউকে কিছু জানায়নি ওইসব রক্তবৃত্তের ব্যাপারে। ওই জন্যেই আপনার মাথায় বশীকরণের ব্যাপারটা এসেছে। আসলে তা নয়। আসলে ভয়। লতা জানে, ও যদি মুখ খোলে তাহলে ওর পরিবারের কেউ বাঁচবে না। সেই ভয়েই... এই দেখুন সোলাঙ্কীকে। ওকে যদি আমি এখন বলি আপনাকে মেরে ফেলতে তাহলে ও তা-ই করবে। কী, তা-ই না সোলাঙ্কী?'

জয়ন্তর ইশারায় বিশু সোলাঙ্কীকে ঘরের মাঝখানে টেনে নিয়ে এসেছে। তৌফিক দেখল, সোলাঙ্কী ভয়ে ভয়ে ঘাড় কাত করে সায় দিল জয়ন্তর কথায়।

'সোনা মেয়ে।' জয়ন্ত সোলাঙ্কীর চুলে হাত বোলাল। সোলাঙ্কী কুঁকড়ে গেল একেবারে।

'আপনার তো শাম্ভবীকে প্রয়োজন। সোলাঙ্কীকে অন্তত ছেড়ে দিন।' তৌফিকের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তৌফিকের কথার উত্তরেই যেন জয়ন্ত আচমকা সোলাঙ্কীর মুখটা টেনে তুলে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল ঠোঁটে। সোলাঙ্কী আর্তনাদ করে উঠল। জয়ন্তর কর্কশ হাতের মধ্যে তার ছোট শরীরটা ছটফট করছিল। ঠোঁট দিয়ে সোলাঙ্কীর পাতলা ঠোঁট দুটো পিষে দিতে দিতে, জয়ন্ত আড়চোখে দেখল তৌফিককে। রাগে তৌফিকের সারা শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। জয়ন্ত তার পায়ের নাগালের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। তবু তৌফিক চুপ করে থাকল। সে বুঝে গেছে, রাগ দেখালে, বা সোলাঙ্কীর হয়ে কিছু বলতে গেলেই জয়ন্ত আরও বাড়াবাড়ি করবে।

'মিষ্টি মেয়ে।' জয়ন্ত সোলাঙ্কীকে ছেড়ে দিল। বিশু একটা ছোট বাক্স এনে দিয়েছে জয়ন্তকে। সেটা নিতে নিতে জয়ন্ত বলল, 'ওইসব বশীকরণ-ফরনে আমি আর ভরসা রাখতে পারছি না। কে কখন কী কবচ নিয়ে বসে থাকবে। এত পাওয়ারফুল ত্রাটক আপনার উপরে কাজ করল না। অথচ আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, কাজ করবে।'

বাক্স থেকে দুটো চওড়া গোল গোল জিনিস বার করল জয়ন্ত। জয়ন্ত জিনিস দুটো আলোয় তুলে ধরল। প্রায় ইঞ্চি তিনেক চওড়া মোটা পাতের তৈরি অদ্ভুতদর্শন বস্তু দুটো ঝকঝক করছে সাদা আলোয়। খোলাচুড়ি। একপাশে স্ক্রু লাগানোর জায়গা। এখন স্ক্রু-টা খোলা।

জয়ন্ত সোলাঙ্কীর হাতে একটা বালা রাখল, 'এটা কী বল তো?'

'চুড়ি।' সোলাঙ্কী নিস্তেজ গলায় বলল।

'এই দুটো তৌফিককে পরিয়ে দাও।' সোলাঙ্কী একবার তাকাল তৌফিকের দিকে, তার চোখে দ্বিধা। সে আবার জয়ন্তর দিকে ফিরে তাকাল। জয়ন্ত শ্লেষাত্মক স্বরে বলল, 'তৌফিকের চুড়ি পরে বসে থাকাই উচিত। ও একটাও কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। নিজের বিয়ে করা বউকে পর্যন্ত বাঁচাতে পারে না। কী বল?'

সোলাঙ্কী কোনও কথা বলল না। তৌফিকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সে বুঝল, তৌফিকের হাত অবধি তার হাত পৌঁছাবে না। সে বেঁটেখাটো মানুষ, তৌফিক অনেকটাই লম্বা। তার উপরে তৌফিকের হাত দুটো উঁচু করে দেওয়ালের গায়ে একটা আংটার সঙ্গে বাঁধা। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, সে বেঁচে গেল। কাজটা তাকে করতে হবে না।

বিশু ঘরের মধ্যে থেকে নিচু টুলটা এগিয়ে দিল। সোলাঙ্কী তীব্র অনিচ্ছায় টুলের উপরে উঠে পড়ল। তার পা কাঁপছে। এদের কথা অমান্য করার কথা সে ভাবতেও পারছে না।

তৌফিকের ফুলহাতা টি-শার্টটা গুটিয়ে একটা চুড়ি হাতে পরিয়ে দিল সোলাঙ্কী। অদ্ভুতদর্শন চুড়িটা চেপে বসল তৌফিকের হাতে। সোলাঙ্কী জয়ন্তর কথামতো স্ক্রু-টা আঁটতে শুরু করল। তৌফিকের মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সোলাঙ্কী অবাক চোখে তাকাল তৌফিকের দিকে। তৌফিক হাতের বাঁধনের দড়িটাই চেপে ধরেছে শক্ত হাতে।

জয়ন্ত সোলাঙ্কীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ভালো করে এঁটে দাও স্ক্রু-টা।'

সোলাঙ্কী একটু একটু করে প্যাঁচ ঘুরিয়ে স্ক্রু-টা এঁটে দিল। স্ক্রু-টা বড্ড টাইট। এখনও খানিকটা বেরিয়ে আছে।

জয়ন্ত বলল, 'আরও একটু ঢুকবে।'

এক হাতে তৌফিকের হাতটা চেপে ধরতেই সোলাঙ্কী টের পেল, তৌফিকের বলিষ্ঠ হাতটা কাঁপছে। দুই আঙুলে স্ক্রু-টায় জোরে একটা মোচড় দিল সোলাঙ্কী। তৌফিক এবার সজোরে ঝাঁকি দিয়ে উঠল। সে দাঁতে দাঁত চেপে আছে। তার চোখে-মুখে স্পষ্ট যন্ত্রণার ছাপ। সোলাঙ্কী বুঝতে পারছিল না তৌফিক ছটফট করছে কেন। শুধু চুড়িই তো। পরক্ষণেই সে খেয়াল করল, তৌফিকের হাত বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। একটা আতঙ্কের চিৎকার করে তৌফিকের হাতটা ছেড়ে দিল সোলাঙ্কী।

জয়ন্ত সোলাঙ্কীর হাতে অন্য চুড়িটা তুলে দিল, 'এটাও।'

সোলাঙ্কী খোলা স্ক্রু-টা একবার ঘোরাল। বালাটার ভিতরে শঙ্কু আকৃতির বড় বড় তীক্ষ্ণ স্টিলের কাঁটা বেরিয়ে এল। এটা হাতে পরিয়ে স্ক্রু ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা চামড়া ভেদ করে মাংসের ভিতরে ঢুকে যাবে। সোলাঙ্কীর অবশ হাত থেকে বালাটা পড়ে গেল।

ছত্রিশ

জয়ন্ত কিছুতেই ছাড়ল না সোলাঙ্কীকে। দ্বিতীয় বালাটাও তৌফিককে পরাতে সে বাধ্য করল। বাক্সটা থেকে একটা ছোট শিশি বার করল জয়ন্ত। শিশির তরলটা ভাগ করে দুটো বালার গায়ের নির্দিষ্ট ফুটোতে ঢেলে দিল। তরলটা ফোঁটা ফোঁটা করে চুঁইয়ে ঢুকে যাচ্ছিল বালার মধ্যে। মাংসে গেঁথে-যাওয়া শঙ্কু আকৃতির কাঁটাগুলোর মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে মিশে যাচ্ছিল রক্তে। তরলটা ক্ষতস্থান ছুঁতেই, অসহ্য যন্ত্রণা তৌফিককে গ্রাস করল। তার মুখ থেকে আপনা-আপনিই তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

জয়ন্ত হাসল, 'কুরারি পয়জনের নাম শুনেছেন তৌফিকবাবু? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বডি প্যারালিসিস করে দেয়। এটাতে ৭০% কুরারি আছে। বাকিটা অঘোরী তন্ত্রের দান। আপনার সারা শরীর অবশ হয়ে যাবে, জিব জড়িয়ে যাবে, কোনও শব্দ করতে পারবেন না। কিন্তু ওই আগুনের মতো জ্বালাটা ক্রমে বাড়তে থাকবে আর সেটা আপনি বুঝতেও পারবেন। শিশি দুটোতে যা জিনিস আছে, তাতে আপনি একদিন অন্তত নড়তেচড়তে পারবেন না। একটু জ্বলুন। অনেক জ্বালিয়েছেন আমাদের।'

তৌফিক কোনও কথা বলতে পারল না। তার মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের উপরে। গলা থেকে কাতরানি ভেসে আসছিল। সোলাঙ্কী দেখল, তৌফিকের ঠোঁটের কোণে ফেনা ভাঙছে।

জয়ন্ত বিশুর হাতে নিজের রিভলভারটা দিয়ে দিল। সোলাঙ্কীকে দেখিয়ে বলল, 'এটাকে বেঁধে রাখ। আমি বীজরোপণে বসি। অনেকটা সময় নষ্ট হল।'

জয়ন্ত দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চাপা দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। মাধ্যাকর্ষণের টানে দরজাটা নিজে থেকেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

বিশু সোলাঙ্কীকে ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের খুঁটির সামনে এনে দাঁড় করাল। দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে সোলাঙ্কীর হাত দুটো বাঁধতে শুরু করল। সোলাঙ্কীর একবার মনে হল, তৌফিকদা যেন নড়ল। পরক্ষণেই সে দেখল, তৌফিকের শরীরটা যেন হাওয়ায় উড়ল। দেওয়ালের উপরে হাতের ভার রেখে তৌফিক এক ঝটকায় পুরো দেহটাকে শূন্যে তুলল। বিশুর ঘাড় লক্ষ্য করে জোড়া পায়ে একটা মারাত্মক লাথি কষাল তৌফিক। উলটোদিকের কাঠের খুঁটিটায় সজোরে মাথা ঠুকে গেল বিশুর। একটা আওয়াজ তোলারও সময় পেল না সে। গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

তৌফিকের দেহটাও সশব্দে বাড়ি খেল দেওয়ালের গায়ে। সোলাঙ্কী আতঙ্কের মুহূর্তেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিল। অন্য কেউ হলে হয়তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সময় নষ্ট করত। কিন্তু সে দ্রুত হাতের দড়িটা খুলে ছুটে গেল তৌফিকের কাছে। টুলটা টেনে এনে আগেই বিষাক্ত বালা দুটো খুলে ফেলল তৌফিকের হাত থেকে। বিশুর পকেট থেকে ছুরি বার করে তৌফিকের হাতের দড়িটা কেটে দিল। তৌফিকের শিথিল শরীরটা এলিয়ে পড়ল দেওয়াল ঘেঁষে। সে জ্ঞান হারিয়েছে।

স্মেলিং সল্টের ঝাঁজালো গন্ধটা আবারও পেল তৌফিক। কিন্তু তার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। কেউ যেন লক্ষ-কোটি সুচ ফুটিয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। যন্ত্রণাটা ধীরে ধীরে কমে

আসছে। তার হাতে-পায়ে সাড় ফিরে আসছে। তার বুকের উপরে নরম নরম কী যেন একটা। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মতো যন্ত্রণাটা ফিরে এলে তৌফিক আবার ডুবে যাচ্ছে।

কে যেন কান্না-জড়ানো গলায় ডাকছে তাকে! মা নাকি?

যন্ত্রণাটা একটু কমে আসতেই তৌফিক চোখ খুলে তাকাল। সে দেখল, তার বুকের উপরে সোলাঙ্কী মাথা কুটছে। 'ওঠ তৌফিকদা! ওঠ।'

সোলাঙ্কী ঘরের কোণ থেকে স্মেলিং সল্টের শিশিটা কুড়িয়ে এনেছে। তার জ্ঞান ফেরানোর জন্য সোলাঙ্কী স্মেলিং সল্ট শোঁকাচ্ছিল, জয়ন্ত বা বিশু নয়, কথাটা মগজে প্রবেশ করতেই তৌফিকের যন্ত্রণাবোধটা অনেকটা কমে গেল। সে ফ্যাকাশেভাবে হাসল সোলাঙ্কীর দিকে চেয়ে। সোলাঙ্কী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তৌফিকের বুকের উপর। হু হু করে কাঁদছিল সে।

'আমি চাইনি। আমি চাইনি তোমায় বালাটা পরাতে। বিশ্বাস কর। আমার খুব ভয় করছিল।'

তৌফিক দুর্বল হাতটা তুলে সোলাঙ্কীর পিঠে রাখল। 'চুপ কর্। যা করেছিস, ঠিক করেছিস।'

সোলাঙ্কী থামতে পারছিল না। গত কয়েকদিনের ভয়, আতঙ্ক তাকে পাগল করে দিচ্ছিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলে উঠল, 'ওরা বাবাকে মেরে ফেলেছে। ওরা শামুকে মেরে ফেলবে তৌফিকদা। বাঁচাও আমাদের।'

একটু পরে সোলাঙ্কীকে কোনওমতে শান্ত করে, তৌফিক উঠে গিয়ে বিশুকে পরীক্ষা করল। নাহ্, মরেনি। অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার ভয় লাগছিল, সে বোধহয় মানুষটার ঘাড়ই ভেঙে দিয়েছে। তৌফিক যতটা জোর লাথি চালিয়েছে বলে ভেবেছিল, আসলে ততটাও জোর হয়নি। বিষের প্রভাবে সে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। কী ভাগ্যিস প্যারালিটিক হয়ে যায়নি!

সোলাঙ্কীর সাহায্যে বিশুকে বেঁধে রেখে চাপা দরজাটা তুলে বাইরে উঁকি দিল তৌফিক। বিশুর রিভলভারটা নিয়ে নিয়েছে সে। যদিও কখনও রিভলভার চালায়নি সে। তবুও ভয় দেখাতে তো কাজে লাগবে। এখান থেকে বেরিয়ে কোনওভাবে একবার রজতকে খবর দিতে পারলেই হয়। জয়ন্তর মুখোশ এবার খুলে যাবে সবার সামনে।

চাপা দরজাটা খুলতে একরাশ শব্দ ঝাঁপিয়ে এল। কালীপুজোর রাতের মতো জোরদার ঢাক, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা বাজছে। কারা যেন সমস্বরে বিকট চিৎকার করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। ওঁ হং হং সর্বং মারয় মারয়... সোলাঙ্কী আর তৌফিক উঠে এল একটা ঘরের মধ্যে। ঘরটার দরজাটা অল্প ফাঁক করে তৌফিক উঁকি দিল উঠোনে।

উঠোনের মাঝখানে বেদিটা ঘিরে নির্দিষ্ট রীতিতে বসে আছে চারজোড়া নারী এবং পুরুষ। বেদির বাহুর মধ্যভাগে নারীরা আর কৌণিক অবস্থানে পুরুষরা। বেদির মধ্যে তিন ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটা বৃত্তের পরিধি বরাবর আগুন জ্বলছে।

তাদের প্রত্যেকের পাশে রাখা উপাচার থেকে তারা একের পর এক বস্তু তুলে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষেপ করছে বৃত্তের মধ্যে। আগুনের আংটি পেরিয়ে উপাচারগুলো ভিতরের মাটিতে গিয়ে পড়ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আগুনের আভায় উপাচারগুলো

স্পষ্ট দেখতে পেল তৌফিক। সিঁদুর-মাখানো ফল, হাড়, দুধ, আর পায়ে-ডানায় সুতো বেঁধে রাখা আটখানা কালো দাঁড়কাক।

উপাচারগুলোর প্রায় শেষের মুখে তৌফিক দেখল, আটজনে আটখানা জীবন্ত কাক তুলে গলা মুচড়ে রক্ত আহুতি দিল আগুনে। শেষ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আগুনটা দপ করে নিবে গেল। বৃত্তের মাটিতে অদ্ভুত এক আলোড়ন। মাটিটা নির্দিষ্ট বৃত্ত রচনা করে ওলটানো কড়াইয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। পরক্ষণেই গভীর গর্ত করে মাটিটা অনেকটা বসে গেল। যেন রক্তবৃত্ত উথালপাথাল করছে বীজের প্রতীক্ষায়।

তৌফিক হাঁ করে দেখছিল ঘটনাটা। বৃত্তমধ্যস্থিত ওঠানামা করতে থাকা মাটিটায় অস্বাভাবিক কিছু কৌণিক আকৃতি ফুটে উঠেছে। এ যেন তিন মাত্রার পৃথিবীর জ্যামিতি নয়। কোথাও যেন কোনও অলৌকিক শক্তি আরও কিছু মাত্রা যোগ করেছে আকৃতিটায়। কোনও এক অস্বাভাবিক জগৎ নিজের অধিকার বিস্তার করতে চাইছে এই পৃথিবীর বুকে।

তৌফিক মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৃত্তটাকে দেখছিল। মৃদু লাল আভায় সমস্ত বৃত্তটা আলোকিত। বৃত্তের মধ্যে বুদ্‌বুদের মতো অদ্ভুত সব ত্রিকোণ-ষড়কোণ ফুটে উঠছে। কেউ যেন একটা বিশাল রক্তলাল তরল বোঝাই কড়াইয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চোখা চোখা কোনাবিশিষ্ট বল ফেলে সেগুলোকে ফোটাচ্ছে।

শামু!

সোলাঙ্কীর চাপা গলার ডাকটা শুধু তৌফিকই শুনতে পেল। ঢাকের আওয়াজে বাকিদের কান পর্যন্ত পৌঁছাল না।

তৌফিক দেখল, জয়ন্ত শাম্ভবীকে একটা ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসছে। একদম শান্ত মেয়ের মতো, ভাবলেশহীন শাম্ভবী হেঁটে আসছে।

'জয়ন্ত।' তৌফিক ঘর থেকে উঠোনে নেমে এল।

তৌফিককে দেখে জয়ন্ত চমকে উঠল। তৌফিকের হাতে কালো রিভলভারটা চকচক করছে।

'শাম্ভবীকে ছেড়ে দে, নয়তো আমি গুলি চালাব।'

সোলাঙ্কী তৌফিকের পিছনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'শামু। পালিয়ে আয়।'

শাম্ভবী একবার মুখ ফেরাল। ভাবলেশহীন মুখ। আগুনের আভায় তার মোহাবিষ্ট মুখটা অতিপ্রাকৃত হয়ে উঠেছে। পরক্ষণেই সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিল রক্তবৃত্তের মধ্যে। মুহূর্তে দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল। রক্তের বদলে একটা বিশাল অগ্নিশলাকা ছিটকে বেরল রক্তবৃত্ত থেকে। সোজা উঠে গিয়ে আকাশ ফুঁড়ে মিলিয়ে গেল অগ্নিশলাকাটা।

'জয় দেবী কেচাইখাতি। জয় যোগিনী কালসিদ্ধা।' সমবেত জয়ধ্বনি উঠল বাড়িটার মধ্যে।

তৌফিক অস্বাভাবিক দৃশ্যটা দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিল। সেই সুযোগে জয়ন্ত একটা ছুরি তুলে নিখুঁত লক্ষ্যে ছুড়ল তৌফিকের দিকে। কিন্তু ছুরিটা তৌফিককে লাগল না, লাগল সোলাঙ্কীর গায়ে। সে বেচারা বোনকে আগুনে পুড়ে যেতে দেখে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তৌফিকের পিছন থেকে।

তৌফিক দেখল, সোলাঙ্কী একটা পাক খেয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল মাটির উপরে। ছুরিটা তার বুকে বিঁধে গেছে বাঁট অবধি।

জয়ন্তকে লক্ষ্য করে পরপর দুবার ট্রিগার টিপে দিল তৌফিক। কান-ফাটানো দুটো আওয়াজ হল। জয়ন্তর শরীরটা একবার ঝাঁকি দিয়ে উঠল। আগুনের আভায় তৌফিক দেখল, জয়ন্ত হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। দু-দুটো গর্ত তৈরি হয়েছে জয়ন্তর শরীরে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে শরীরটা। তার চোখের পাতা খোলা, অবাক বিস্ময়ে সে চেয়ে আছে তৌফিকের দিকে। অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমায় ঝুপ করে উলটে গেল জয়ন্ত। বেঁচে থাকলে মানুষ ওইভাবে পড়ে যায় না।

কেউ কিছু করার আগেই তৌফিক দ্রুত সোলাঙ্কীর রক্ত-মাখা দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে উলটোদিকে ফিরে দৌড় দিল, বাড়ির দরজা খুলে বাগানের মধ্যে। বাগান পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, কুয়াশার মধ্যে একটানা ছুটে যাচ্ছিল তৌফিক। মারাত্মক একটা ভয় তাকে গ্রাস করছিল। সে মানুষ খুন করেছে! একটা জলজ্যান্ত মানুষ!

সাঁইত্রিশ

চন্দ্রমৌলির কথা

চন্দ্রমৌলি পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিল। কিছুক্ষণ আগে 'ডাক'টা আসাতে সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'ডাক' আসার সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতির উপর থেকে কালো পরদা সরে গেছে। তার স্মৃতি ফিরে এসেছে! যোগিনী কালসিদ্ধার হাতে পড়ার আগেও তার একটা বালক বয়স ছিল। সেই বয়সে তার এক বন্ধু ছিল। যে ছেলে কোনওরকম প্রত্যাশা ছাড়াই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল তার জন্য। এই পৃথিবীতে তার একমাত্র বন্ধু! ভৈরবের একমাত্র দুর্বলতা।

না! শুধু ভৈরব নয়। সে চন্দ্রমৌলি। তার সব মনে পড়ে গেছে। তার নাম চন্দ্রমৌলি। লালকমলের বন্ধু নীলকমল।

লালের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন। লালকে কোনও অলৌকিক শক্তি আক্রমণ করলে চন্দ্রমৌলি নিজের মধ্যে সেই আঘাত অনুভব করে।

পুশুলিয়ার মাঠের মাঝখানে কী ভয়ংকর বিপদে পড়ে ছিল লাল! কয়েক মুহূর্তের জন্য চন্দ্রমৌলি পাথর হয়ে গিয়েছিল। এত দূর থেকে কিছু করার ক্ষমতা নেই তার। পরক্ষণেই সে বুঝেছিল, অলৌকিক কোনও শক্তিতে লাল মরবে না, বড়জোর সামান্য আহত হবে। লালের হাতে কালকবচ আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে চন্দ্রমৌলি।

জ্ঞান ফেরার পর থেকে, একটু শক্তি ফিরে পাওয়ার পর থেকে, সে বারবার বীজটার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছিল। সেই থেকেই বীজটা তার শক্তি নিয়ে নিজের চারপাশের মানুষজনদের ভেলকি দেখাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল বীজটা এমন কোনও একটা জায়গায় আছে, যেখানে সে ছিল এককালে। তার ব্যবহৃত কিছু জিনিস, বা তার রক্ত, এমনকি কোনও স্থান যেখানে তার জীবনের কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটেছে সেই জায়গার খোঁজ পেয়েছে বীজটা। নয়তো বীজটার পক্ষে সম্ভব হত না তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।

প্রথমেই সে বীজটাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বীজটা কোথায় আছে। কিন্তু বীজটা কিছুতেই বলতে পারছিল না জায়গাটার কথা। সে বুঝেছিল, কেউ বীজটাকে বাধা দিচ্ছে। তখন বীজটা তাকে জানায় লালকমলের কথা। লালকমল নাকি তার ছোটবেলার বন্ধু।

ক্রমে চন্দ্রমৌলি বুঝতে পেরেছিল, বীজটা যে সময়ের কথা বলছে, সেই সময়ের কথা তার মনে নেই। বীজটাকে সে বলে ফেলেছিল লালকমলকে দিয়ে তাকে 'ডাক' পাঠাতে। তারপরেই সে বুঝতে পারে, 'ডাক' পাঠানোর জন্যে যে জিনিসটা সে বন্ধন করেছিল, সেটার কথাও তার মনে নেই। ওদিকে বীজটা ক্রমাগত লালের মাথা খাচ্ছিল, 'ডাক পাঠাও', 'ডাক পাঠাও'।

তারপরে বীজটা তাকে জানিয়েছে লালকমলের মারাত্মক বিপদ। জানতে চেয়েছে কীভাবে বশীকরণের হাত থেকে বাঁচানো যায় লালকমলকে? চন্দ্রমৌলি তখনও জানত না, 'কে লালকমল?' তবু সে বীজটাকে 'কালসূত্র প্রাণবন্ধন'-এর কথা বলেছিল।

রক্তবৃত্তের মাটির উপরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বীজের রক্ত ফেললে কয়েক মুহূর্তের জন্য তৈরি হয় কালসূত্র আগুন। সেই আগুন যাকে খাওয়ানো হয়, তাকে কেউ বশীকরণ করতে পারে না।

রক্তবৃত্ত খুঁজতে গিয়ে বীজ তাকে জানিয়েছিল 'মাটি নেই'। তখন সে ভীষণ রেগে গিয়ে বলে ফেলেছিল, তাহলে লালকমলকে মেরে ফেল। কী কাণ্ড! বীজটা সেই চেষ্টাই করেছিল। একটা পাগলকে দিয়ে লালকে...

কী ভাগ্যিস লালের কিছু হয়নি তখন! লালের কিছু হয়ে গেলে চন্দ্রমৌলি নিজেকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারত না।

অবশ্য নিজের ভুল পরক্ষণেই শুধরে নিয়েছিল সে। বীজকে বুঝিয়ে বলেছিল, রক্তবৃত্ত পেতে গেলে তাকে অনুভব করতে হবে। সে যদি ভীষণভাবে কোনও রক্তবৃত্তের কাছে যেতে চায় তাহলেই যেতে পারবে।

বীজ সেইরাত্রে সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করে শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, 'কালসূত্র' আগুন তৈরির প্রায় পরক্ষণেই বীজটাকে অন্য এক অতিপ্রাকৃত শক্তি নিজের আওতায় টেনে নেয়। তখনই সে চমকে উঠেছিল। অন্য অতিপ্রাকৃত শক্তিটা আর কেউ নয়, স্বয়ং যোগিনী কালসিদ্ধা!

তারপরেই সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিল এই কারাগার থেকে বেরবার জন্য। সাধীকে এক বিশেষ জিনিস নিয়ে আসার অনুরোধ করে। অবশ্য তখনও সে জানত না, কোথায় আছে বীজটা।

কিছুক্ষণ আগে ডাকটা আসার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছে স্থানটা কোথায়।

পাতরগণ্যরা রক্তবৃত্ত বানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে। রৌম্যজাগরণের জন্য ছয়কোনা তারকাকৃতি ক্ষেত্রে রক্তবৃত্ত!

যে কোনও অমাবস্যায় মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে বীজের রক্তে আলপনা আঁকলে পরলোকের দ্বার খুলে যায়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে নরকের জীবরা উঠে আসতে পারে না পৃথিবীতে। রৌম্যজাগরণের প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত জটিল। পূর্ণিমার তিন দিন আগে তারকার গর্ভক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থ অঞ্চলে বীজকে আহুতি দেওয়া হয়, রক্তবৃত্তের মধ্যে। তিন দিন পরে পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হওয়ার সময় পাতরগণ্য নারীকে রক্তবৃত্তে আহুতি দেওয়া হয়। চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণের সময়টুকুর মধ্যেই বীজসহ রৌম্যশিশু ফিরে আসে পৃথিবীতে।

বীজের সঙ্গ ছাড়া কেউ নরক থেকে ফিরে আসতে পারে না পৃথিবীর মাটিতে।

কী ভয়ানক! যোগিনী কালসিদ্ধা এখনও আশা ছাড়েনি। এত দীর্ঘ অথচ সুচারু পরিকল্পনা স্থাপন করেছে! গত যুদ্ধে কালসিদ্ধাকে নরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। আগের মিসেস ডি'সিলভার দেহটা হারিয়ে, কালসিদ্ধা এখন নতুন আধার খুঁজছে! পুরানো শরীর ঝেড়ে ফেলে নতুন শরীর!

চন্দ্রমৌলি যোগিনী কালসিদ্ধার পরিকল্পনাটা বুঝে গেছে।

বীজের জন্ম হয়েছে ২২ জুলাই, ২০০৯ সালে। চল্লিশ ঘণ্টা মাত্র বাকি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ হতে। ওই দিন ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ সাল। চন্দ্রগ্রহণের সময় বীজের নবম বর্ষ চলবে।

বীজের নবম বর্ষে তৈরি হয় কালসন্দর্ভা। কালসন্দর্ভা গোত্রের রৌম্যরা হল একরকম 'আধার'। ওদের দেহের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারে অন্য আত্মা। যোগিনী হয়তো এই পরিকল্পনা বেশ কয়েক বছর ধরেই করে রেখেছে। কারণ এই সুবর্ণ সুযোগ কেউই হাতছাড়া করবে না। কয়েক হাজার বছরেও কালসন্দর্ভা গোত্রের রৌম্য নাও জন্মাতে পারে। বীজের জন্মের ঠিক নবম বর্ষে পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ নাও থাকতে পারে। যেমন, এই বীজটার চতুর্থ আর অষ্টম বর্ষ চলাকালীন কোনও পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ হয়নি, তাই কালিকা অথবা কুষ্ঠিকা গোত্রের রৌম্য জন্মায়নি। কিন্তু কালসন্দর্ভা জন্মাতে চলেছে।

নরকে দীর্ঘদিন থাকার ফলে যোগিনী কালসিদ্ধার মানবশরীরটা নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তা-ই সে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারছে না। এখন সে একটা রৌম্যদেহের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। রৌম্যদেহটাকে অবলম্বন করে সে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

পালঙ্কে শুয়ে চন্দ্রাতপের বিশাল আয়নাটার দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল চন্দ্রমৌলি। যোগিনী কালসিদ্ধা যদি 'কালসন্দর্ভা' রৌম্যরূপে পৃথিবীতে ফিরে আসে তাহলেও এত চিন্তার কিছু নেই। আগামী বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ওই রৌম্যশিশুটাকে চন্দ্রমৌলি সহজেই হত্যা করতে পারবে।

কিন্তু তবু তাকে এই মুহূর্তেই বেরতে হবে এই স্থান থেকে। লালকমলের বিপদ। কীভাবে ও পাতরগণ্য সাধকগুলোর খপ্পরে গিয়ে পড়ল? কী অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে ও? সাধকগুলো ওকে ঠিক হত্যা করবে। কিছু ঘটার আগেই ওদেরকে বাধা দেওয়া প্রয়োজন।

এখন তার একমাত্র ভরসা সাধী। তিন দিন হয়ে গেল, সাধীকে সে একটা জিনিস আনতে পাঠিয়েছে। সাধী কেন এত দেরি করছে? বদ্ধ ঘরে ছটফট করছিল চন্দ্রমৌলি। সাধী এখনও কেন আসছে না?

'ভৈরব!' ডাকটা শুনে চন্দ্রমৌলি প্রায় ছুটে এল কাঠের দরজাটার কাছে। দরজা খুলে দিল। সাধী এসেছে।

সাধী ঘরে এসে ঢুকতেই চন্দ্রমৌলি দ্রুতহাতে দরজাটা বন্ধ করে দিল। উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। সাধী পেরেছে।

একটা বিশাল সোনালি ইগল। বাজবৈরি তার সুগঠিত দেহ নিয়ে শান্তভাবে বসে আছে সাধীর হাতের উপরে। ভৈরবের দিকে সে বঙ্কিম গ্রীবায় কটাক্ষে তাকাল। চন্দ্রমৌলি হাত বাড়াল পাখিটার দিকে। শক্তিশালী পেলব ডানা দুটো মেলে ইগলটা ছটফট করে উঠল। তার সুন্দর খয়েরিরঙা পালক থেকে স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়ছিল। উড়ে এসে চন্দ্রমৌলির দক্ষিণ হস্তে বিনা দ্বিধায় আসীন হল সে।

'এরকমই চেয়েছিলে তো?' সাধী জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' চন্দ্রমৌলি হাসি মুখে সোনালি ইগলটা দেখতে দেখতে বলল। 'কিছুক্ষণ পরে তুমি বাকি স্বর্গদেও-প্রধানদের আসতে বল মন্ত্রণাকক্ষে। আমি প্রমাণ করে দেব আমি ভৈরব কি

না।’

কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রণাকক্ষে এসে স্বর্গদেও-প্রধানরা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার দেখল। ভৈরব বেরিয়ে এসেছে তার কক্ষ থেকে। বসে আছে সিংহাসনে। স্বর্গদেও-প্রধানদের চোখের সামনেই খুলে গেল বিশাল স্বর্ণদ্বার। সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াল ভৈরব। ধীরপায়ে হেঁটে চলে গেল ভৈরব অঞ্চলে। স্বর্ণদ্বার বন্ধ হয়ে গেল সবার চোখের উপরে। কোনও কথা বলল না ভৈরব। তার দৃঢ় পদক্ষেপে চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই স্বর্গদেও-প্রধানরা বুঝল, ভৈরব আর কোনওরকম সম্পর্ক রাখবে না তাদের সঙ্গে। মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল মন্ত্রণা -কক্ষ থেকে স্বর্গদেও-প্রধানরা।

স্বর্গদেও-প্রধানগুলো চলে গেলে চন্দ্রমৌলি ছোট কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। মায়াবিভ্রম সৃষ্টি করে সে সবাইকে ভুল বুঝিয়েছে। মন্ত্র পড়ে ছোট কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। ঘরটাকে সুরক্ষিত রাখা দরকার। কেউ যেন না এসে ঢুকতে পারে। সোনালি ইগলটাকে হাতে ধরে চন্দ্রমৌলি এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে।

একটা বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করছিল, তার দেহটা ক্রমে মিশে যাচ্ছে পাখিটার শরীরে। ধীরে ধীরে একসময় চন্দ্রমৌলি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল সোনালি ইগলে। একবার সে ডানা ঝাপটে ঘুরপাক খেল ঘরের মধ্যে। মাটিতে নামার আগের মুহূর্তে রূপ পরিবর্তন করে মানুষ হল। আবার পরিবর্তিত হল পাখিতে। দু-একবার অনুশীলন করে ব্যাপারটায় ধাতস্থ হল সে।

‘সোনালি ইগল কেন?’

‘সোনালি ইগলের রক্ত খেলে আমি আরও শক্তি পাব। বেরিয়ে যেতে পারব এই ঘর থেকে।’ চন্দ্রমৌলি বলেছিল।

সাধী ভুলেছে। আসলে সাধী কেন, কোনও স্বর্গদেও-প্রধানই স্বপ্নেও ভাবেনি, এই ছোট কক্ষটার মধ্যেও একটা গুপ্তদ্বার আছে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে যাওয়ার।

অপরূপ পালঙ্কটার উপরে উঠে এল চন্দ্রমৌলি। শয্যার উপরে দাঁড়িয়ে মাথার উপরের চন্দ্রাতপটায় আঙুল ছোঁয়াল সে। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল আয়নাটা চুম্বকের মতো টেনে নিল তাকে। পরক্ষণেই ছুড়ে দিল বাইরের পৃথিবীতে।

শূন্য থেকে পড়তে পড়তে চন্দ্রমৌলি নিজেকে পরিবর্তন করে নিল ইগলে। এই দ্বার দিয়ে কোনও মানুষ বেরিয়ে এলে তার মৃত্যু অবধারিত। দ্বারটা এক অদ্ভুত স্থানে বার করে মানুষকে। বরফের এক অতলান্ত ফাটলের মধ্যে, শূন্যের মাঝখানে। চারপাশে বরফের খাড়াই প্রাচীর উঠে গেছে। মাথার অনেক উপরে এক টুকরো নীলাভ আকাশ দেখা যাচ্ছে।

বিশাল বিশাল ডানা ঝাপটে চন্দ্রমৌলি একটু একটু করে চক্র কেটে উঠে গেল উপরের দিকে। বাতাস অত্যন্ত পাতলা আর হিমশীতল। সোনালি ইগল ছাড়া অন্য কোনও পাখির পক্ষে এই ফাটল অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একসময় ফাটল থেকে বেরিয়ে এল সে। হিমালয় পর্বত। চারদিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণি।

চন্দ্রগ্রহণ হতে আর মাত্র আটত্রিশ ঘণ্টা বাকি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না। তাকে যেতে হবে এখন বহু দূর।

আটত্রিশ

সামান্য একটা আওয়াজ হতেই লতা উঠে পড়ল। ঘরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। ঘুমের ওষুধ খেলেও লতার ঘুম হয় না আজকাল। মড়ার মতো পড়ে থাকে শুধু, ভয়ে। যদি কোনওদিন ধরে ফেলে জয়ন্ত যে, সে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছে না, যদি ডোজ বাড়িয়ে দেয়? আজকে জয়ন্ত নেই ঘরে, কিন্তু তবুও তার বেরনোর উপায় নেই। ঘরের মেঝেতেই আয়াটা ঘুমাচ্ছে। আসলে সে জয়ন্তদের দলের লোক।

মেয়েটা ভান করে থাকে যেন হাবাগোবা, কিছু বোঝে না। আসলে লতাকে সর্বক্ষণ নজরে রাখার জন্যেই জয়ন্ত ওকে রেখেছে।

লতা শুয়ে শুয়ে অন্ধকার কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। জয়ন্ত তাকে মাঠের মাঝখানে একটা বাড়িতে আটকে রেখেছিল এতদিন। প্রতি মাসে অমাবস্যাতে জয়ন্ত কোথা থেকে বাটি ভরতি রক্ত নিয়ে আসত। তাকে খাওয়াত। লতা পেটের উপরে হাত রাখল। একটা পিশাচ বড় হচ্ছে তার পেটের মধ্যে। জয়ন্ত বলেছে, পিশাচটা জন্মে গেলেই তাকে ছেড়ে দেবে। সে আর কিছু জানে না।

তৌফিক এত কাণ্ড করল লতার জন্য, অথচ লতা কিছুই করতে পারল না। অবশ্য সে তো চেষ্টা করেছিল! বারবার বলেছিল তৌফিককে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে। ছেলেটা কোনও কথাই শুনল না। সেই গোঁ ধরে পড়ে রইল বোলপুরেই। আর কী করতে পারত সে? জয়ন্তরা বড়ই নিষ্ঠুর। কেউ সামান্য কোনও কথা আঁচ করলেই সেই মানুষকে সরিয়ে দেবে পৃথিবী থেকে। টুকলু, মা, বাবা, দাদু... কেউ যেন কিছু না জানতে পারে।

ঠক ঠক... ঠক ঠক... ঠক ঠক... লতা চমকে উঠল।

'লতা! লতা!' একটা চাপা গলার আওয়াজ শোনা গেল। এই গলার স্বর লতা কখনও ভুলবে না। আয়াটা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। লতা নিঃশব্দে ছুটে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলতেই তৌফিক ঘরে ঢুকল।

'কে?' কর্কশ আওয়াজে লতা চমকে উঠল, আয়া উঠে পড়েছে। তৌফিক অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ছুটে গিয়ে আয়ার মুখ চেপে ধরে শক্ত হাতে ঘাড়ের উপরে একটা রদ্দা দিল। আয়া নেতিয়ে পড়ল। লতা চাপা গলায় আর্তনাদ করল, 'তৌফিক!'

'চেঁচিয়ো না।' বলতে বলতে তৌফিক ধপ করে দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল।

'তৌফিক, কেন এসেছ? তুমি এখুনি চলে যাও।' লতা নিজেকে সামলে নিল।

'লতা, আমি সব জানি।' তৌফিক কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো ফিসফিস করে বলল। 'আমি দেখেছি, রক্তবৃত্ত। জয়ন্ত শয়তান। ও আমাদেরকে মারতে চাইছিল।'

'চুপ কর, চুপ কর।' লতা খিঁচিয়ে উঠল, 'চলে যাও তুমি। জয়ন্ত জেনে গেলে মেরে ফেলবে সবাইকে।'

'জয়ন্ত মরে গেছে। আমি ওকে মেরে ফেলেছি। লতা, আমি খুন করেছি।' লতা উত্তেজনায় তৌফিকের হাত চেপে ধরল, তৌফিক থরথর করে কাঁপছে। 'আমি খুন করেছি লতা!'

'চুপ কর।' লতা ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'কোথায় পেলে তুমি জয়ন্তকে?'

‘ওরা সোলাঙ্কীর বাবাকে মেরে ফেলেছে... ওদের কিডন্যাপ করেছে... শাম্ভবীকে রক্তবৃত্তে ফেলে দিল... শামু আমার চোখের সামনে তলিয়ে গেল... কিচ্ছু করতে পারলাম না!’ তৌফিক বিড়বিড় করল। ‘সোলাঙ্কীর গায়ে ছুরি লেগেছিল... আমি ওকে লাভপুর হাসপাতালে রেখে এসেছি... ওটাই পড়ল রাস্তায়... তারপরে পালিয়ে এলাম... নয়তো কী করব বল?’ তৌফিকের কথাবার্তা ক্রমে অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিল।

লতা তৌফিকের ঘোর কাটাতে গালে একটা থাপ্পড় মারল। ‘জয়ন্তকে কোথায় খুন করলে তুমি? সত্যি মেরেছ?’

‘হ্যাঁ। আমি... আমি গুলি করলাম... বন্দুক দিয়ে... দুবার... জয়ন্ত মরে গেল... লতা, আমার কি ফাঁসি হবে?’ তৌফিক কেমন এক অসহায় নিরাবলম্ব মানুষের মতো মাথা ঠুকল মেঝেতে। দু-হাতে মাথার চুল আঁকড়ে ধরল। ‘আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। ওই রিভলভারে আমার হাতের ছাপ আছে। সোলাঙ্কী জানে, আমি ওখানে ছিলাম।’

‘এটা তুমি কী করলে তৌফিক! ওরা আমার বাড়ির সবাইকে মেরে দেবে।’ লতা কেঁদে ফেলল।

তৌফিক পাগলের মতো লতার হাত চেপে ধরল। ‘আমি মারতে চাইনি। বিশ্বাস কর। আমি... আমি...’

‘জয়ন্ত ছাড়াও ওদের দলে আরও লোক আছে। আমি জানি না, চিনি না। কিন্তু জয়ন্তর উপরেও লোক আছে। আমি জয়ন্তকে ফোনে কথা বলতে শুনেছি। ওই লোকটা এবার আমার বাড়ির সবাইকে মেরে দেবে।’ লতা ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপছিল।

তৌফিক হতবাক হয়ে লতার দিকে তাকিয়ে থাকল। জয়ন্তর উপরেও লোক আছে!

আচমকা লতার ঘরের দরজা খুলে গেল। কয়েকজন কালো পোশাক-পরা লোক দ্রুত ঘরে ঢুকে এল। তৌফিক কিছু করার আগেই দুজনে তাকে চেপে ধরল।

লতা আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, ‘বাঁচাও, বাঁচাও। মাআআ। বাপিইই।’

একটা কাপড়ের টুকরো নিমেষে লতার মুখে গুঁজে দিল একজন। তৌফিক লোক দুটোর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারত, কিন্তু সে দেখল, আর দুটো লোক লতার দখল নিয়েছে। তাদের হাতে টাঙ্গি।

জানলা দিয়ে ঢুকে-আসা রুপোলি জ্যোৎস্নায় লতার কণ্ঠনালিতে ধরে-থাকা ধারালো ফলাটা চকচক করছে!

***

দিনটা শুরু হল অত্যন্ত খারাপভাবে।

সকাল হতে না হতেই থানা থেকে ফোন এল, গতকাল রাত্রিবেলা উপাধ্যায়বাড়িতে তৌফিক এসে জয়ন্তকে খুন করে, লতাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। রজত সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল তৌফিককে। সুইচ্‌ড অফ।

সে তড়িঘড়ি ধড়াচূড়া পরে ছুটল উপাধ্যায়বাড়ির দিকে। গতকাল সন্ধেবেলায় তারকনাথ রীতিমতো ওপরমহলে চাপ দিয়ে নাতজামাই এবং ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। সে

নানান ঝামেলায় কথাটা আর তৌফিককে জানায়নি। বড় মুখ করে তৌফিককে বলেছিল, একদিন আটকে রাখতে পারবে।

জয়ন্ত খুন হয়েছে। উপাধ্যায়বাড়ি থেকে কয়েক মিটার দূরে রাস্তার ধারে তার দেহটা পড়ে ছিল। একজন প্রাতর্ভ্রমণকারী সেটা আবিষ্কার করেছে। কে খুন করেছে তা অবশ্য কেউ দেখেনি। কিন্তু বিমলচন্দ্র সরাসরি তৌফিকের নামটাই তুললেন। মৃতদেহ পরীক্ষা করে রজত দেখল, খুব কাছ থেকেই পরপর দুবার গুলি চালানো হয়েছে। একটু দূরে রাস্তার ধারেই ঝোপের মধ্যে মার্ডার ওয়েপ্‌নটাও পাওয়া গেল। রজত সেটাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেকিং-এর জন্য পাঠাল।

যে কনস্টেবলটাকে রজত পাহারায় বসিয়েছিল, সে জানাল, গতকাল অনেক রাত্রে কেউ একজন লাল-হলুদ অ্যাপাচে বাইকে চেপে এসেছিল। সে যখন দেখেছে, তখন খালি বাইকটা উপাধ্যায়বাড়ির গেট থেকে কিছু দূরে রাখা ছিল। তারপরেই কে যেন তাকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে।

লাল-হলুদ অ্যাপাচে বাইক এ তল্লাটে একজনেরই আছে। তৌফিক।

ইস্, তৌফিক তাদের ব্যাচের সব থেকে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। লতার সঙ্গে জড়িয়ে নিজের পুরো লাইফটা শেষ করে ফেলল। রজত ভেবে পেল না, গতকাল রাত্রে কী এমন ঘটল যে, জয়ন্তকে একেবারে খুন করে ফেলল তৌফিক! অবশ্য শেষের দিকে তৌফিককে বেশ রেস্টলেস লাগছিল। লতাদের ছাতের ঘরে বশীকরণ, ওইসব অভিচারক্রিয়া! তৌফিক সাত জন্মে ওইসবে বিশ্বাস করত না।

জয়ন্তকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে এখন রজতের নিজেরই বেশ খারাপ লাগছে। তারকনাথ ওপরমহলে ফোনটোন করে একাকার। রজতকে তার দু-ধাপ ওপরের বস ফোন করে কী কড়কানিটাই না দিল।

কিন্তু ঘটলটা কী? ছেলেটা এত বড় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল কী করে? ফাঁসি না হলেও, যাবজ্জীবন কেউ আটকাতে পারবে না। রজত হতাশভাবে জয়ন্তর বডিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটা স্রেফ পাগল হয়ে গেছে। খুন করার পরে লতাকে কিডন্যাপ! একটা গর্ভবতী মেয়েকে নিয়ে কোথায় পালাবে? দু-দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে। একলা থাকলে তা-ও যদি বা...

রজত আবার একবার ভালো করে পরীক্ষা করল লাশটা। এই ব্যাপারটাই বড় অদ্ভুত! খুব কাছ থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছে। একটা গুলি লেগেছে পেটে, অন্যটা ফুসফুসে। দুই ক্ষেত্রেই প্রচুর রক্তপাত হওয়ার কথা, কিন্তু মাটি বা ঝোপেঝাড়ে সেরকম রক্তের চিহ্ন নেই। গতকাল রাত্রিতে কিছু বৃষ্টিও হয়নি যে মুছে যাবে রক্তের দাগ। তাহলে অন্য কোথাও খুন করে কি এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে লাশটা?

তৌফিক যদি হঠাৎ মাথা গরম করে একটা খুন করেও ফেলে থাকে, সে ক্ষেত্রে তার একার পক্ষে একটা লাশকে সরিয়ে আনা... রাস্তা দিয়ে টেনে আনলেও তো কিছু না কিছু দাগ থাকবে। কিচ্ছু নেই। লাশের নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরে ডানা গজায়নি। এটা ঠিক একজন মানুষের কাজ নয় বলেই মনে হল রজতের। রজত এবার লাশটাকে পোস্টমর্টেমের জন্য তুলে নিয়ে যেতে বলল।

উপাধ্যায়বাড়ির সবার জবানবন্দি নিতে নিতে আরও কিছু অদ্ভুত তথ্য পেল রজত। তৌফিক যে অভিচারক্রিয়াটা করেছিল, সেটা নাকি কৃষ্ণা বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতেই রক্ত হয়ে গিয়েছিল।

জয়ন্ত গতকাল বাড়ির দরজার সামনে এইসব কাণ্ড দেখে রাগারাগি করে আর বাড়িতে ঢোকেইনি। তাহলে রাত্রিবেলা এসেছিল কেন? এ-ও কি লুকিয়ে লতার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিল?

গতকাল রাত্রে সবাই এমন মড়ার মতন ঘুমিয়েছে যে, কেউ টেরই পায়নি তৌফিক আর লতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। তবে লতার হাবাগোবা আয়াটা জানাল, কালকে রাত্রে তৌফিক নাকি তাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করেছে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রজত বাইকটা স্টার্ট দেওয়ার আগে দেখল, উপাধ্যায়বাড়ি থেকে একটা কিশোরী মেয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে। সে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দাঁড়াল।

'দাঁড়ান। একটু শুনুন।' কৃষ্ণা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রজতের বাইকের হ্যান্ডেলে হাত রাখল।

রজত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কৃষ্ণার দিকে।

'আমার দুটো বন্ধুর কোনও খোঁজ নেই কাল থেকে। সোলাঙ্কী আর ওর বোন শাম্ভবী। ওরা তিন দিন হল এখান থেকে গেছে। ওদের বাবা নিজে এসে নিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সোলাঙ্কীর কথা হয়েছিল কাল সকালেও। কিন্তু কাল রাত থেকে সোলাঙ্কীর মা আর ওর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারছে না। আন্টি আমাকে সকালে ফোন করেছিল। বলছিল, গত কয়েকদিন নাকি শুধু সোলাঙ্কীর সঙ্গেই ওর মায়ের কথা হয়েছিল। সোলাঙ্কীর বাবার সঙ্গে হয়নি। অনেক সময় সোলাঙ্কীর বাবা বিজি থাকে বলে কথা হয় না, আন্টি তেমনটাই ভেবেছিল। কিন্তু কাল রাতে আন্টি সোলাঙ্কীকে না পেয়ে ওদের ফ্ল্যাটের সিকিয়োরিটিতে ফোন করে। তখন তারা বলে, সোলাঙ্কীরা নাকি বাড়ি ফেরেইনি।' প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে কৃষ্ণা দম নিল।

আন্টির সঙ্গে কথা বলে তার খুব টেনশন হচ্ছে। ব্যাপারটা দু-দিন আগে জানলেও কলকাতায় বাবা-মা গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসত। কিন্তু এখন বাবা-মা-ও এখানে চলে এসেছে। আর কাল থেকে একের পর এক ঘটনায় বাড়ির যা হাল, কৃষ্ণা ব্যাপারটা নিয়ে সঠিকভাবে কারও সঙ্গে আলোচনাও করতে পারছে না।

রজত মন দিয়ে কৃষ্ণার সব কথা শুনল, তারপর সোলাঙ্কীদের ফোন নম্বরগুলো কৃষ্ণার কাছ থেকে নিল। সোলাঙ্কীদের ছবিও নিল কৃষ্ণার থেকে।

'আচ্ছা! ওরা যে গাড়িতে গেছে, তার ড্রাইভার, এই বিশুর কোনও ছবি আছে তোমার কাছে?'

কৃষ্ণা তারাপীঠ ইত্যাদি বেড়াতে যাওয়ার ছবিগুলো থেকে খুঁজে খুঁজে অনেক কষ্টে বিশুর একটা ছবি খুঁজে পেল। রজতের ফোনে পাঠিয়ে দিল।

কৃষ্ণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রজত তৌফিকের বাড়িতে গেল। জয়ন্তর খুনের ব্যাপারটা কঙ্কালীতলা গ্রামেরও অনেকেই জেনে গেছে। আশপাশের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশি ভালোই

জড়ো হয়েছে তৌফিকদের বাড়ির সামনে। সবাই কানাঘুষো, ফিসফিস করছে। বাড়ির সবার মুখ থমথমে।

তৌফিকের বাবা আর দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রজতের কাছে থানা থেকে ফোন এল। তৌফিকের বাইকটা বোলপুর স্টেশনে পাওয়া গেছে। ওরা নিশ্চয়ই ট্রেনে করে পালিয়েছে। রজত রেল পুলিশকে খবরটা দিতে বলে তৌফিকের ঘরে ঢুকল।

তৌফিকের বিছানাটা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। টেবিলটা একদম পরিষ্কার। ডায়েরি, ল্যাপটপ, খামে করে রাখা কাগজ অথবা লুজ পেপার কিচ্ছু নেই। ঘরের তাকে রাখা পুরানো নোটসের খাতা ইত্যাদি, যা তৌফিক যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, কিচ্ছু নেই। এক কুচি কাগজও পড়ে নেই। তৌফিক যদি পালিয়েও যায়, খাতা-বইপত্র নিয়ে পালাল নাকি? কী অদ্ভুত!

উনচল্লিশ

ঘুমের মধ্যে তৌফিক একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। একটা সাদা রঙের বিশাল পাখি উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নদীর উপর দিয়ে। দিবসের প্রথম সূর্যের প্রখর রশ্মি তার ডানায় ঝিকিয়ে উঠছে। প্রচুর তুষার পড়েছে। হাই অল্টিচিউড, পাতলা হাওয়া। কিন্তু পাখিটা অতিশয় সাবলীলভাবে হাওয়া কেটে উড়ে যাচ্ছে। তৌফিক দেখতে পেল, বরফাবৃত গিরিশিখরের চূড়াগুলোয় যেন আগুন ধরে যাচ্ছে। উত্তুঙ্গ শৃঙ্গগুলো ছুঁচালো বল্লমের মতো বিঁধে আছে স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। রোদে ঝলসে যাচ্ছে পাখিটার তুষারধবল শরীর। ঠান্ডা হাওয়া তিরের মতো এসে বিঁধছে। দুটো পাহাড়ের মাঝের সরু গিরিখাত দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখিটা। আচমকা পাহাড়ের কন্দরে গুরুগুরু আওয়াজ উঠল। পরক্ষণেই বাজ-পড়া আওয়াজে কেঁপে উঠল প্রকৃতি। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রাশি রাশি বরফের চাঁই। একবার মনে হল, পাখিটা বুঝি তলিয়ে যাবে ধসে পড়া বরফের গ্রাসে। ক্ষণিকের কৌশলে পাখিটা নিজেকে রক্ষা করল এগিয়ে-আসা বরফের ঢেউ থেকে। তার অবিশ্বাস্য দ্রুততা দেখে মনে হচ্ছিল সে কোনও পাখি নয়, এক বিদ্যুৎরেখা। বরফের ছুট-দৌড়ে প্রকৃতিকে হারিয়ে বিজয়ী পাখিটার গতি কয়েক মুহূর্তের জন্য শ্লথ হল। পরক্ষণেই আবার সে দ্রুত থেকে দ্রুতবেগে উড়ান দিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। উঠোনের উপর ধুলোর মধ্যে শুয়ে ছিল তৌফিক। একটু একটু করে জলের তলা থেকে উঠে আসার মতো চেতনা ফিরছিল তার। শিরায় শিরায় অসহ্য যন্ত্রণাটা কমে আসতে সে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে ছিল।

কতক্ষণ সে অজ্ঞান হয়ে আছে? নাকি, কতদিন! জিবটা শিরীষ কাগজের মতো খসখস করছে। মারাত্মক তেষ্টা পেয়েছে। মেরে ফেলার আগে এরা কি তাকে একটু জল দেবে? আধো-চেতনায় দুলতে দুলতে তৌফিক বিশুর গলা শুনতে পেল।

‘সব সাজিয়ে এসেছি। জয়ন্তর বডি গেটের কাছে। মার্ডার ওয়েপ্‌ন পাশের ঝোপে। পুলিশটাকে লাল বাইকটা দেখিয়ে তারপর মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান... বাইক রেখে আসা হয়েছে বোলপুর স্টেশনে। সব ব্যবস্থা পাকা। পুলিশ এইদিকের খবর কিছু টের পাবেই না। কলকাতায় খুঁজতে যাবে।’

অন্য কেউ একজন খুব নিচুস্বরে কিছু একটা বলল।

‘হ্যাঁ, মেয়েটার ট্রেস পেয়েছি... লোক পাঠিয়েছি...’ কার সঙ্গে কথা বলছে বিশু?

তৌফিক আবারও বিশুর গলার আওয়াজ পেল। ‘চিন্তা করবেন না। সমস্ত কাগজপত্র, ডায়েরি, নোটের খাতা সব পুড়িয়ে দিয়েছি গুরুজি।’

‘গুরুজি!’ ‘জয়ন্তর উপরেও লোক আছে ওই দলে।’ লতার কথাটা মনে পড়তেই, লোকটাকে দেখার জন্য তৌফিক মাথাটা তুলতে চাইল। নড়াচড়া করতেই একটা যন্ত্রণা বিদ্যুৎঝলকের মতো গ্রাস করল তৌফিককে। মুখ থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তৌফিকের ঘোর কেটে গেল। চোখের পাতায় সূর্যের তীব্র আলো এসে বিঁধছে।

তৌফিকের মনে হল, কেউ যেন ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বিশু! সূর্যের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে-থাকা ছায়ামূর্তিটাকে ঝাপসা দেখছে সে।

'এর মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এসেছে! উফ, জ্বালাল।' বিশুর গলা শুনতে পেল সে। 'এই, ওকে ইনজেকশন দে। বিষের শিশিটা কোথায় গেল?'

এরা কি আবারও তাকে জয়ন্তর ওই বিষটা দেবে? কালকে রাতে, তখন প্রায় ভোর, ওদের দুজনকে ধরে এনে গাড়িতে তোলার পর বিশু ওই বিষটা ইনজেক্ট করেছিল তার শরীরে। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাচ্ছিল তৌফিক। ভোর থেকে এখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল, বিষের প্রভাবে তৌফিকের সারা শরীর এখনও টনটন করছে। মাথা ভার। পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না সে।

কেন এত কষ্ট দিচ্ছে এরা? একেবারে মেরে ফেললেই তো পারে। তিলে তিলে মারবে! লতা কোথায়? তাকেও কি... তৌফিকের মনে হল, আরও কয়েকজন এসে দাঁড়াল তার চারপাশে।

আবারও বিশুর গলা শুনতে পেল সে, 'বিষটা কই... শেষ? উফ, কাল অতখানি নষ্ট না হলে, বেটাকে আর-একদিন দিব্যি শুইয়ে রাখা যেত। কী যে যন্ত্রণায় পড়া গেল! নজর রাখ্ ওর দিকে। আমি গুরুজির সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

লোকগুলো সরে গেল। দুপুর-রোদ সরাসরি আঘাত করল তৌফিককে। তেতে-ওঠা মাটি রীতিমতো ছেঁকা দিচ্ছে খোলা চামড়ায়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। তৌফিক ঝিম মেরে পড়ে রইল। সে বোঝার চেষ্টা করছিল, আসলে কী ঘটছে।

গতকাল সে ভেবেছিল, জয়ন্ত মারা যেতে এরা দিশেহারা হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার কোনওরকম আক্রমণের আশঙ্কা না করে সে ছুটে গিয়েছিল লতার কাছে। এই লোকগুলো আগে থেকেই ফাঁদ পেতে রেখেছিল। উপাধ্যায়বাড়ির ভিতরে গিয়ে তাকে আর লতাকে তুলে এনেছে! কেউ আঁচ পর্যন্ত পায়নি। উপাধ্যায়বাড়িতে সে এদেরকে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পারেনি। বাধা দিলেই ওরা লতাকে খুন করবে এমন ইশারা করছিল।

একসময় যন্ত্রণাটা কমে যেতে তৌফিক মাথা তুলে দেখল একবার চারদিক। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। কিছুক্ষণ বাদেই সন্ধের অন্ধকার নেমে আসবে। উঠোনের একপাশে দাওয়ার নিচে পড়ে আছে সে। লতাকে আশপাশে কোথাও দেখতে পেল না। ওরা কী করছে লতাকে নিয়ে? লতা বেঁচে আছে তো?

তৌফিক কোনওরকমে মাটির দেওয়ালে ঘষটে শরীরটা টেনে তুলল। ওর দু-হাত জড়ো করে পিছনে শক্ত দড়ি দিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। পা-ও বাঁধা। কোনাকুনি একটা ঘরের দাওয়ার উপরে দুজন মধ্যবয়স্ক যোগিনী বসে বসে দূর্বাঘাস বেছে বেছে রাখছে একটা থালায়। তারা একবার তৌফিককে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, আবার নিজেদের কাজে মন দিল। তৌফিক আশপাশে বিশু বা অন্য কোনও সাধুকে দেখতে পেল না।

'শুনছেন...' তৌফিকের শুকিয়ে-যাওয়া গলা থেকে শব্দটা ঠিকঠাক বেরল না। সে শুকনো গলাতেই একবার ঢোক গিলল। আবারও ডাকল, 'শুনছেন।'

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মহিলাটি শক্ত মুখে ফিরে তাকাল তার দিকে। 'কী হয়েছে?'

'একটু জল খাব।' তৌফিক কাঁচুমাচু মুখে বলল। হাতের বাঁধন না খুললেও একটু জল কি দেবে না? খিদে-তেষ্টায় তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

মহিলা দুটো ঠান্ডা চোখে তাকাল তৌফিকের দিকে। একজন মহিলা ধমকে উঠল, 'জল দেওয়া হবে না তোকে। দেড়-দুই দিন জল না খেলে কেউ মরে না।'

'আপনারা কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ। আগামীকাল সন্ধেবেলা তোকে রক্তবৃত্তে আহুতি দেওয়া হবে।'

'আর লতা?'

'ওকেও।'

তৌফিক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। 'লতা কোথায়?'

এবার অন্য মহিলা বললেন, 'এখন ওর প্রায়ণ হচ্ছে।'

'প্রায়ণ? সেটা কী?' প্রশ্নটা করতে গিয়ে তৌফিকের গলা কেঁপে গেল। লতাকে ওরা মেরে ফেলছে নাকি?

'বীজবপনের পরে শেষবারের মতো রক্তবৃত্তের প্রসাদি রক্ত খাওয়ানো হয় রৌম্য মাকে। প্রায়ণের পরে মানুষের আর জ্ঞান-হুঁশ থাকে না। রৌম্যজাগরণের ক্রিয়া সুচারু হয়।' বয়স্ক মহিলা বললেন।

অন্যজন দাওয়ায় বসতে বসতে বলল, 'প্রায়ণ হয় চব্বিশ ঘণ্টার আগে। কাল এই সময় চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণকালে তোদের আহুতি দেওয়া হবে রক্তবৃত্তে।'

প্রায়ণ যা-ই হোক, লতা এখুনি মরে যাচ্ছে না জেনে তৌফিক একটু আশ্বস্ত বোধ করছিল। সে আবারও একবার চেষ্টা করল, 'আমাকে আপনারা বলি দেবেন। তো মানে, ইয়ে, বলি দেওয়ার আগে হিন্দুরা তো ছাগলকেও কাঁঠালপাতা খাওয়ায়। আমি শুধু একটু জল চাইছিলাম। যদিও আমার খুব খিদেও পেয়েছে।'

বয়স্ক মহিলার চোখে কৌতুক ঝিলিক দিল, 'জ্ঞান ফিরেছে কী, ফরফর করছে দেখ। ভয়ডর নেই তোর?'

'খুব আছে। বিশ্বাস করুন, মারাত্মক ভয় লাগছে। কিন্তু এই মুহূর্তে...' তৌফিক কথা শেষ করতে পারল না, কাশির দমকে শরীরটা নুয়ে পড়ল। গলা চড়চড় করছে তার। রাঢ়ের শীতকালীন রুক্ষ হাওয়ায় শ্বাস নিলেও শুকনো কাশি উঠে আসছে। একটুক্ষণের মধ্যেই কাশির চোটে তৌফিকের দম আটকে যাওয়ার জোগাড় হল। তৌফিক চেষ্টা করল ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে। একটু যদি কমে কাশিটা। সে দেখল, মহিলা দুজন উঠে কোথায় যেন চলে গেছে। ওরা তাকে জল দেবে না।

তৌফিক নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। ছোটবেলায় কতদিন রোজা রেখেছে সে। গরমকালে। মে মাস, জুন মাসের গরমে সারাদিন জল না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। আজ এত কষ্ট হচ্ছে কেন? মাত্র একদিন জল খায়নি। কী হয়েছে তাতে? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করেনি? যতীন দাস তেষট্টি দিন না খেয়ে ছিলেন। কারবালার যুদ্ধে হাসান-হোসেনরা কি জল পেয়েছিল? মরুভূমির মাঝখানে যুদ্ধই তো করছিল তারা। তৌফিকের মতোই এক অসম যুদ্ধ। বোকার মতো তৈরি-করা ফাঁদে পা রেখে সারাক্ষণ...

তৌফিক মনটা অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করল। যত জলের কথা ভাববে, তত তেষ্টা বাড়বে।

সোলাঙ্কী কেমন আছে? ওর অপারেশন শেষ হয়েছে? ও কি সুস্থ হয়েছে? জ্ঞান ফিরেছে? কালকে রাত্রেই তো ডাক্তারটা থানায় ফোন করেছিল। রজত কি এখনও কিছু জানে না?

আবারও কাশির দমকে তৌফিকের শরীরটা ঝুঁকে পড়ল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তার।

'এই নে, জল খা।' অন্য মহিলা নেমে এসেছে দাওয়া থেকে। তার হাতে এক গ্লাস জল। তৌফিক শুকনো মুখে তাকাল। মহিলা তৌফিকের মুখের কাছে গ্লাসটা ধরল, 'খেয়ে নে। এরপরে অমৃতকাল শুরু হয়ে গেলে আর খেতে পাবি না।'

তৌফিক উচ্চবাচ্য না করে জলের গ্লাসে ঠোঁট ডোবাল। সত্যি তার মারাত্মক তেষ্টা পেয়েছে। গতকাল রাত থেকে বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় আর বিষের প্রভাবে বুকের মধ্যে যেন একটা মরুভূমি তৈরি হয়েছে। এক গ্লাস কেন, তৌফিক এখন চুমুক দিয়ে সমুদ্র খেয়ে নিতে পারে। পরে কী হবে সে জানে না, কিন্তু এই মুহূর্তে জল না খেলে সে মরেই যাবে।

কিন্তু এক গ্লাস জলও তৌফিকের ভাগ্যে ছিল না। দু-ঢোক জল খেতে না খেতেই কেউ একজন সপাটে লাথি মারল তৌফিককে। তৌফিক হুমড়ি খেয়ে পড়ল দাওয়ার উপরে। জলের গ্লাসটাও ছিটকে পড়ল।

কালকের সেই দৈত্যের মতো ঘাড়ে-গর্দানে সাধুটা। গতকাল রাত্রে যেটাকে তৌফিক খুব পিটিয়েছিল।

আরেকটা লাথি পড়ল তৌফিকের তলপেটে। এক ঝলক রক্ত উঠে এল মুখ দিয়ে। যন্ত্রণায় পৃথিবীটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেও তৌফিক দেখল, জল ভরতি গ্লাসটা ছিটকে পড়েছে উঠোনের মধ্যে। শুকনো লালমাটি দ্রুত শুষে নিল জলটুকু। তৌফিকের গলার কাছে কান্না দলা পাকিয়ে উঠল। এতটা দুর্বল সে কখনও বোধ করেনি।

'অ্যাই, হচ্ছেটা কী? ওকে মারার কোনও দরকার নেই।' অতি পরিচিত গলার স্বরে তৌফিক আচ্ছন্ন অবস্থাতেও চমকে উঠল।

এক দীর্ঘদেহী মানুষ বেরিয়ে এসেছে টালির ঘর থেকে। ফরসা শরীরে বেলের আঠায় মাজা সামবেদি পইতে। এই মানুষটা! গুরুজি! তৌফিক আর কিছু ভাবতে পারল না।

চল্লিশ

সন্ধে নেমে এসেছে পুশুলিয়ার মাঠে। বিশাল চাঁদ উঠেছে আকাশ জুড়ে। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে তাপমাত্রা কমে গেছে। রাঢ়ের রুক্ষ হিম হাওয়ায় তৌফিকের গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। প্রকৃতিও বিরোধিতা করছে তার সঙ্গে। জানুয়ারি মাসের শেষ দিন আজকে। ঠান্ডাটা একটু কম থাকলে কী ক্ষতি হত! গায়ে জিন্‌স আর গেঞ্জি থাকা সত্ত্বেও মাঘী শীতের হিমেল হাওয়ায় কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে তৌফিকের। খুঁটির গায়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল সে।

একটু দূরেই দাওয়াতে গুরুজি বসে আছে। গুরুজির কথায় ওরা তাকে জল খেতে দিয়েছে। অবশ্য এখনও তার হাত শক্ত করে বাঁধা খুঁটির সঙ্গে।

'তুই বেজায় ঝামেলা শুরু করেছিস লাল। এত লাফালাফি কীসের?' একটু আগেই গুরুজি তাকে এই কথাগুলো বলছিল।

তৌফিকের মনে পড়ল, ছোটবেলায় চন্দ্রমৌলির কাছে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে সে উপাধ্যায়বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ত। তখনও লতার ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন, তিনি খুব ছুঁচিবাইগ্রস্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন। যে বাড়িতে করুণাময়ীর নিত্যপুজো হয়, সেখানে তৌফিকের মতো একটা মুসলিম ছোঁড়া অন্দরে পা দেবে— এই ব্যাপারটা তাঁর একদম পছন্দ ছিল না। তৌফিক একবার বাড়ির ভিতরে পা দেওয়ার মানে পুরো বাড়ি মুছে গোবর আর গঙ্গাজলের ছড়া দেওয়া। তিনি বেজায় চেঁচামেচি করতেন। বিমলচন্দ্র কখনও তাকে হাতের কাছে পেয়ে গেলে দু-চারটে চড়চাপড়ও কপালে জুটত। তখন ঠিক এই সুরে এই বাক্যবন্ধটা তারকনাথ বলত।

জয়ন্তকে সে প্রথম থেকেই প্রতিপক্ষের চোখে দেখেছে। বিমলচন্দ্র বা সুরমাদেবী সুযোগ পেলেই জাতপাত তুলে তাকে খোঁটা দিত, কিন্তু তারকনাথ! লতার ঠাকুরদা! তাকে সে কোনওদিনও খারাপ ভাবেনি। এই লোকটার মুখে কোনওদিন সে একটাও বাজে কথা শোনেনি। বরং কখনও কখনও অচিন্ত্যকে পড়ানো শেষ হয়ে গেলে সে লাইব্রেরি রুমে দাদুর সঙ্গে বসে বিভিন্ন বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পও করেছে। তৌফিক তীব্র চোখে তাকিয়ে রইল দাওয়ায় বসে-থাকা তারকনাথের দিকে।

তারকনাথ নিচুস্বরে কারও সঙ্গে কথা বলছেন ফোনে। তৌফিক মনস্থির করে ফেলল। এখনও হাতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। অন্ধকার বাড়লেই সে কোনওভাবে বাঁধন খোলবার চেষ্টা করবে। তৌফিক বুঝে গেছে, লতাকে এরা চন্দ্রগ্রহণের আগে কিছুতেই মারবে না।

রৌম্যজাগরণই তারকনাথের উদ্দেশ্য যদি হয়, তাহলে তিনি কখনওই এমনি এমনি লতাকে খুন করবেন না। বিশু তাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছিল।

যে করেই হোক, একটা ফোন শুধু হাতে পেলেই চলবে। রজতকে ফোন করে বললেই হবে পুশুলিয়ার মাঠের কথা। কী হবে? ধরা পড়লে, এরা বড়জোর তাকে মেরে ফেলবে, এর বেশি ক্ষতি তো কিছু করতে পারবে না।

তৌফিক মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিল। একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে তাকে।

একটু পরে ফোনটা কেটে দিয়ে তৌফিকের দিকে এগিয়ে এল তারকনাথ।

‘কী ভাবছিস? রজতকে ফোন করবি?’ তারকনাথের প্রশ্নে তৌফিক চমকে উঠল। তারকনাথ তৌফিকের মুখ দেখে হেসে উঠলেন। ‘তোকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি, লাল। তুই ভাঙবি তবু মচকাবি না।’

তৌফিকের মাথায় হাত রাখল। তৌফিক মাথা ঝাঁকি দিয়ে হাত সরিয়ে দিল। তারকনাথ হেসে উঠল।

‘তুই আমাদের যেমন সমস্যা তৈরি করেছিস, তেমনি সমস্যা মিটিয়েছিসও। জয়ন্তকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত কিছু গুবলেট হতে বসে ছিল। বীজবপনের দায়িত্ব বিশুকেই দেওয়া ছিল। সেটা হয়তো ঠিকই হয়ে যেত। কিন্তু কী করে লতাকে বের করে আনব ওই বাড়ি থেকে তা বুঝতেই পারছিলাম না। জয়ন্তকে ছাড়ালাম তো তোর পুলিশ-বন্ধু বলে দিল, কেস না-মেটা পর্যন্ত লতা যেন উপাধ্যায়বাড়ির বাইরে পা না রাখে। কী মুশকিল!

অবশ্য আমরা আগের প্ল্যানটাই রেখেছিলাম। রাত্তিরবেলা তোদের দুজনকেই তুলে আনব। আর রটিয়ে দেব, তুই কিডন্যাপ করেছিস লতাকে। জয়ন্ত সেটার সাক্ষ্যও দেবে। কিন্তু পুলিশ স্টেশন থেকে বেরনোর সময়ই জানতে পারলাম, তুই বাড়ি থেকে পালিয়েছিস। জয়ন্ত অবশ্য ঠিকই আন্দাজ করেছিল, তুই খুঁজে খুঁজে এই পুশুলিয়াতেই এসেছিস।

তবে তুই আমাদের সব সমস্যা মিটিয়েও দিয়েছিস। জয়ন্তকে খুনের জন্য তোর উপরে লতার কিডন্যাপিং-এর চার্জটা আরও পোক্তভাবে বসানো গেছে। যেই মুহূর্তে খবর পেলাম তুই জয়ন্তকে খুন করেছিস, আমি তখনই বুঝেছি, এবার তুই লতার কাছেই আসবি। বাড়ির মধ্যে থেকে তোদের উঠিয়ে আনাটা একটু অসুবিধাজনক ছিল ঠিকই, তা-ই ওদের রাতের খাবারে আমি হালকা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। লতার চিৎকার-চেঁচামেচিতেও কেউ জাগেনি।’

মানুষ এত নিচে নামতে পারে? নিজের পরিবারকে, নিজের নাতনিকে! রাগে-ক্ষোভে তৌফিকের গলার কাছে কী যেন একটা দানা পাকাচ্ছিল।

তারকনাথ দেখল, তৌফিকের চোখে রাগ জমছে। গত কয়েক মাস ধরে ছেলেটার উপর দিয়ে একটানা ঝড় যাচ্ছে তা-ও সে মচকাতে রাজি নয়। কোণঠাসা কালো চিতার মতোই লাগছিল তৌফিককে, যে কোনও সময় একটু ঢিল দিলেই মরণকামড় বসাবে।

এই ছেলেটাকে কবজা করা বড় দরকার। অত্যন্ত চালাক, আর ততটাই মনের জোর। গতকাল ছেলেটা জয়ন্তকে খুন করে ফেলেছে। তিনি আর এই ছেলেকে বিশ্বাস করেন না। শেষ মুহূর্তে ভয়ংকর হয়ে উঠে এমন কিছু করে বসতে পারে, যাতে তাঁদের এতদিনকার সমস্ত যাগযজ্ঞ বৃথা হয়ে যাবে। মাত্র বাইশ-তেইশ ঘণ্টা বাকি চন্দ্রগ্রহণ হতে। নাহ্, ছেলেটাকে ঠান্ডা করা খুব দরকার।

তিনি আবারও হাসলেন তৌফিকের দিকে তাকিয়ে, ‘এখন তুই ছটফট করলে বড় মুশকিল। যদিও এই শেষ মুহূর্তে এসে আবার একটা ঝামেলায় জড়ানোর ইচ্ছা ছিল না আমার। কিন্তু স্পেশাল কেস অলওয়েজ নিডস স্পেশাল ট্রিটমেন্ট।’

তারকনাথের কথায় তৌফিক একটু অবাক হল। কী ট্রিটমেন্ট? আবার কোনও বশীকরণ?

'ক-টা বাজে?' তারকনাথ একজনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন।

'সাড়ে ন-টা, গুরুজি।'

'বিশু কাজটা কত দূর করল একটু দেখ। এতক্ষণে তো হয়ে যাওয়ার কথা।'

তারকনাথ ইঙ্গিত করতেই লোকটা ফোন বের করে কল করল। 'হ্যালো।... কাজ হয়ে গেছে?... গুড।' লোকটা তারকনাথের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

তারকনাথ স্মিতমুখে তাকালেন তৌফিকের দিকে, 'তোকে রজতের সঙ্গে কথা বলতে দিতে পারছি না। কিন্তু তোর শাহাজাদির সঙ্গে কথা বলতে পারিস।'

তৌফিকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কী বলতে চাইছে তারকনাথ?

অন্য লোকটা মোবাইলটা এনে তৌফিকের সামনে ধরল। তৌফিক দেখল, মোবাইলে বিশু ড্রাইভার হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তৌফিককে দেখে বিশু হাত নাড়ল। 'হাই তৌফিক।'

বিশুর কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে বিশুর কাঁধে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। বিশু বাচ্চাটার মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'এই যে, এইদিকে দেখ, এইদিকে দেখ, ছবি উঠবে।'

ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চাটা মুখ ঘোরানোর আগেই তৌফিক চিনে গেছে ওকে। তার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। সিরিন! শাহাজাদি! তার ভাইঝি।

'ইবলিশের বাচ্চা! কী করছিস তুই সিরিনের সঙ্গে?' চেঁচিয়ে উঠল তৌফিক। পাগল পাগল লাগছিল তার। সে দেখেছে, সময়বিশেষে বিশু কতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে।

'বিশেষ কিছু নয় লাল।' সে কানের কাছে তারকনাথের গলা পেল। 'তোকে বশীকরণের কিছু নমুনা দেখানো হবে। সামান্য কিছু। তোর শাহাজাদি আমাদের বশে আছে। বাড়ির বাকিরা সবাই ঘুমাচ্ছে এখন। স্বাভাবিক ঘুম নয়। ঘুমের ওষুধ-মেশানো ঘুম।'

তৌফিক একবার ছটফট করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। তারকনাথের নির্দেশে দুটো লোক ওকে চেপে ধরে বসিয়ে দিল।

'বস্ লাল। কোথায় যাবি?' তারকনাথ হালকা গলায় বললেন। 'বিশু, দেরি কীসের? তুমি সিরিনকে প্রথম কাজটা দাও। লাল অধৈর্য হয়ে পড়েছে।'

'না। সিরিনকে ছেড়ে দিন।' তৌফিক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

বিশু সিরিনকে কোল থেকে নামিয়ে কানে কানে কী যেন বলল। তৌফিক দেখল, সিরিন ছুটে ঘরে গিয়ে কোলে করে জিমিকে নিয়ে এল। বিশু জিমির গায়ে হাত দিতেই, জিমি চিকন গলায় তারস্বরে ভৌ ভৌ করে আপত্তি জানাল। বিশু জিমিকে টেবিলের পায়ায় শক্ত করে বেঁধে দিল। জিমি চুকচুক করে সিরিনের গাল চেটে দিল। তৌফিক ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, ওরা কী করাতে চাইছে সিরিনকে দিয়ে।

সে বিস্ফারিত চোখে দেখল, বিশু সিরিনের হাতে একটা বড় ছুরি তুলে দিল। সিরিনের এক হাতের ছোট্ট মুঠোয় ছুরির মোটা বাঁটটা আঁটছিল না, সে দু-হাতে মুঠি করে ধরল ছুরিটা।

বিশুর গলার স্বর শোনা গেল এতক্ষণে, 'জিমিকে মার, শাহাজাদি।'

‘না। সিরিন না। স্টপ ইট।’ তৌফিক চেঁচিয়ে উঠল।

প্রথম কোপটা ঠিকমতো পড়ল না। জিমির একটা ছোট্ট থাবা আলগা হয়ে গেল কচি দেহটা থেকে। অবলা জীবটার তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। দ্বিতীয় কোপটা জিমির গলায় ঢুকে গেল। তৃতীয় কোপটা চোখের মধ্যে দিয়ে খুলিতে... জিমির ছোট্ট শরীরটায় কোপের পর কোপ পড়তে লাগল। রক্ত ছিটকে এসে লাগল সিরিনের কচি হাতে, মুখে, জামায়। জিমির নরম তুলতুলে শরীরটা কুচিকুচি হয়ে যাচ্ছিল ধারালো ছুরির নিচে। একটা চোখ ঠিকরে পড়েছে, পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, ছোট্ট শরীরটা থেকে মাংস ছিটকে যাচ্ছে, লোম উড়ছে বাতাসে, সিরিন থামছিল না।

একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরিয়ে এল তৌফিকের গলা থেকে। তার চোখের সামনে মোবাইলের স্ক্রিনটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ‘স্টপ... ইট... দয়া... করুন...’ তৌফিক কাঁপছে। তার চোখে জল চলে এসেছে। ‘প্লিজ... ছেড়ে দিন সিরিনকে... প্লিজ... প্লিজ।’

তারকনাথ ফোনটা কেটে দিলেন।

‘জিমির জায়গায় ওটা সিরিনের শরীর হতে পারত।’ তারকনাথের হিমশীতল স্বর শোনা গেল। তৌফিক শিউরে উঠল। সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, তার জন্যে তার পরিবারের এমন মারাত্মক বিপদ হতে পারে।

তারকনাথ খপ করে তৌফিকের চুলের মুঠি ধরে মুখটা টেনে তুলল। ‘তবে তোর শাহাজাদিকে আমি মারব না। কিন্তু তুই যদি আর কোনওরকম গন্ডগোল করিস তাহলে ঠিক এইভাবে সিরিনকে দিয়ে আরও চারটে খুন করাব। তোর মা, বাবা, দাদা আর বউদি। সিরিন কিন্তু জীবনে কখনও বুঝতে পারবে না, ও কেন এই খুনগুলো করেছিল। ওর মনে থাকবে সবই। সিরিন পাগল হয়ে যাবে। সারাজীবন ধরে দগ্ধে দগ্ধে মরবে।’

তারকনাথের চোখে চোখ রাখতেই, একটা তীব্র ভয়ের কাঁপুনি তৌফিকের বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তারকনাথ কোনও ফাঁকা বুলি বলছে না। এরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। তৌফিক কিছু একটা বলতে চাইল। কিন্তু তার গলা থেকে আওয়াজ বেরল না। চোখ থেকে কান্না গড়িয়ে পড়ল।

তারকনাথ এক আঙুলে গাল বেয়ে গড়িয়ে-পড়া জলের ফোঁটাগুলো মুছে দিল। একই রকম শীতল স্বরে বলল, ‘কাঁদছিস কেন লাল? তুই আমাদের দলের এতজনকে আহত করেছিস। আমি কিছু বলিনি। একজন বিশেষ সাধককে মেরে দিয়েছিস। তা-ও কিছু বলিনি। আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে এ কাজ করছি না। তা-ই যদি হত তাহলে অনেক আগেই তোর পরিবারের লাশ ভাসত কোপাইয়ের জলে। আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। শান্ত ছেলের মতো আমাদের কথা মেনে চল্। তাহলে শুধু তুই মরবি। নয়তো তোর সঙ্গে তোর ফ্যামিলিও। কোনটা চাস তুই?’

‘আমি কিছু করব না। আল্লাহ্ কসম। কিচ্ছু করব না আমি। আপনি যা বলবেন তা-ই শুনব।’ তৌফিক ভাঙা গলায় বলে উঠল। হাত বাঁধা না থাকলে এই মুহূর্তে হয়তো সে তারকনাথের পায়ে পড়ে যেত। ‘সিরিনকে ছেড়ে দিন। আম্মি, আব্বু... দয়া করুন। প্লিজ।’

তারকনাথ দেখছিলেন, তৌফিকের চোখ থেকে জেদ, রাগ মুছে গেছে। অসহায় মুখে দুটো দিঘল চোখে ভয় কাঁপছে তিরতির করে। তারকনাথ স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। ধীরে ধীরে উঠোনটা ফাঁকা হয়ে গেল। যারা তৌফিকের উপরে নজর রাখছিল, তারা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল দাওয়ার এক কোণে। তৌফিক ঝাপসা চোখে দেখল, তারকনাথ দৃঢ় পদক্ষেপে ঢুকে গেলেন একটা ঘরের মধ্যে। তাঁর হাতে ধরা জিয়নকাঠি-মরণকাঠি। একটা কালো রঙের মোবাইল।

উত্তুরে হাওয়ায় হিম পড়ছিল বিশ্বচরাচর জুড়ে। মেঘের আড়াল থেকে চতুর্দশীর চাঁদ উঁকি দিয়ে, দেখল ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পুশুলিয়ার মাঠের মাঝে বাগানবাড়িতে এক বন্দি যুবক হাঁটুতে মুখ গুঁজে হু হু করে কাঁদছে। তার একুশ বছরের শরীরটা ঝড়ের মুখে ঝাউপাতার মতো কাঁপছে।

বিষজরজঁর কৃষ্ণনীল বর্ণের আকাশে শীতল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমে। মৃত্যুর শীতলতা।

একচল্লিশ

সেই স্বপ্নটা আবারও দেখল তৌফিক।

আবার ভোর হচ্ছে। পাখিটা বরফের রাজত্ব পেরিয়ে চলে এসেছে। বিশাল বিশাল পাহাড়ের গায়ে বরফ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে সবুজাভা। উপত্যকায় একটা-দুটো জনপদ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যারাক। পাখিটা হিমালয় পর্বতশ্রেণি পেরল। ও কি সারারাত ধরে উড়ছে?

দূরে মেঘ জমেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ডানায় জলকণা এসে লাগছে। আকাশের অন্য পাখিরা ডানা মুড়ে নেমে যাচ্ছে আশ্রয়ের খোঁজে, কিংবা ফিরে যাচ্ছে বাসায়। পাখিটা উঠে গেল আরও উপরে। এখন পাখিটার পায়ের তলায় কালো মেঘের সারি। বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে তার মাঝে। বজ্রগর্ভ মেঘের অনেক উপরে সূর্যের নির্মল আলোর স্রোতে গা ভাসিয়ে পাখিটা উড়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। যেন আকাশের একচ্ছত্র অধিপতি, মুকুটহীন রাজা।

ছোট ঘর। মেঝেতে একটা মাদুর পাতা। তৌফিক দেওয়ালে হেলান দিয়ে অবসন্নের মতো বসে ছিল। তার শরীর সায় দিচ্ছে না। সারারাত হিমের মধ্যে বাইরে বসে ছিল সে। কখন যেন ঘুমিয়েও পড়ে ছিল। সোনালি ইগলের একটা স্বপ্ন দেখছিল।

ভোরবেলা বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে স্নান করিয়ে নতুন ধুতি পরানো হয়েছে। তারপর তারকনাথ তাকে এই ঘরে এসে বসতে বলেছেন।

ঘরে ঢোকার সময় তারকনাথ জানিয়েছেন, 'আজ সারাদিন বিশু তোদের বাড়িতেই থাকবে।' কথাটা শুনে তৌফিক স্পষ্টতই কেঁপে উঠেছিল।

রজত কি কিছু বুঝতে পারবে না? রজত যদি একবার বুঝতে পারে, কোনওভাবে বুঝতে পারে। তাদের বাড়িতে আসবে না রজত? অন্তত তার খোঁজে আসবে তো। সে যে খুন করেছে জয়ন্তকে, সেটার জন্যে। তদন্তের জন্যে।

সিরিনকে যে বশ করেছে, সেটা কি কেউ বুঝতে পারবে না? তৌফিক আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করল, রজত যেন আজকে সারাদিন তাদের বাড়িতে বসে থাকে। আল্লাহ্ কি তার কথা শুনবে? সে এত বড় গুনাহ্ করেছে। সে যে মানুষ খুন করেছে। হে আল্লাহ্, আস্তাগফিরুল্লাহ্, আমার গুনাহ্‌য় আর কাউকে শাস্তি দিয়ো না। সিরিনকে দিয়ে যেন এরা আর কিছু না করাতে পারে।

একটু দূরেই মাদুরের উপরে লতা শুয়ে আছে। লতাকে অত্যন্ত ফ্যাকাশে লাগছে। তৌফিক ঝুঁকে পড়ে একবার হাত রাখল লতার শরীরে। লতা বেঁচে আছে। নিঃশ্বাস বোঝা না গেলেও, বুকে ক্ষীণ একটা ধুকপুক শোনা যাচ্ছে। তারপরেই তৌফিক চমকে উঠল। কী যেন তার হাতে ধাক্কা মারল। লতার পেটের মধ্যে বাচ্চাটা লাথি মারছে!

যদি সবার কথা সত্যি হয় তাহলে লতার গর্ভে যে আসছে, সে পিশাচ। রৌম্যপিশাচ। যাদের নিয়ে চন্দ্রমৌলি অবসেসড ছিল। সেই একটা জন্মাবে। তাকে খেয়ে! লতাকে খেয়ে! তৌফিক আর সহ্য করতে পারল না। লতার পাশ থেকে সরে এসে ঘরের এক কোণে বসল।

কতক্ষণ তৌফিক ওইভাবে বসে ছিল তা তার মনে নেই। আচমকা একটা খুট করে শব্দ হতে চোখ খুলে তাকাল। তারকনাথ এসে ঘরে ঢুকলেন। লতাকে একবার পরীক্ষা করলেন। তারপর একটা আসন পেতে তৌফিকের মুখোমুখি বসলেন।

'লতা তো আপনার নাতনি হয়। নিজের নাতনিকে আপনি মারতে চাইছেন?' তৌফিক আর থাকতে পারল না, বলে ফেলল।

তারকনাথ সরু চোখে একবার দেখলেন তৌফিককে, তারপর হাসলেন, 'এটা লতার সৌভাগ্য যে ওকে বাছা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে। যে কোনও পাতরগণ্য শ্রেণির মেয়েদের তো এটাই সৌভাগ্য।'

'পাতরগণ্য?'

'হ্যাঁ। লতার শরীরে পাতরগণ্য রক্ত বইছে। টুকলু বলছিল, তুই নাকি ওদের দেবী কেচাইখাতির গল্প শুনিয়েছিস? রৌম্য আর ভৈরবের কথা বলেছিস। দেওরীদের কথা বলেছিস। তুই ওদের বলিসনি, এক গোষ্ঠীর মেয়েদের গর্ভবতী করা হত আর সেই সন্তানদের খেতে দেওয়া হত রৌম্যদেরকে?' তারকনাথের প্রশ্নে তৌফিক ঘাড় নাড়ল।

চৌহাট্টার রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে-যাওয়া, এক ভাঙা টালির বাড়িতে বসে মজা করে ভূতের গল্প করা, দিনগুলো যেন কয়েক যুগ আগেকার।

'তুই ভুল জানিস। একটা গোষ্ঠী ছিল ঠিকই, তবে তাদের সন্তানদের রৌম্যদেরকে খেতে দেওয়া হত না। তারা গর্ভে ধারণ করত রৌম্যসন্তান। ওই গোষ্ঠীটার নামই পাতরগণ্য। দেওরী গোষ্ঠীর এক বিশেষ শাখা। লতার শরীরে সেই রক্ত বইছে। অবশ্য পাতরগণ্যদের সন্তান জন্মালেই তা রৌম্য হয় না। সাত মাস প্রতি অমাবস্যায় তাকে প্রসাদি রক্ত খাওয়াতে হয়। নয় মাসের সময় চন্দ্রগ্রহণের দিন ওই মাকে রক্তবৃত্তে আহুতি দিতে হয়। তখন রৌম্যশিশু উঠে আসে পৃথিবীতে।

এত ব্যাপারস্যাপার কিছুই আমি এই সেইদিনও জানতাম না। জানতাম না, আমার শরীরে পাতরগণ্য রক্ত বইছে। অবশ্য গোপনে গোপনে তান্ত্রিক সাধনা আমি বহু বছর ধরেই করছি। ঠিক চোদ্দো মাস আগে আমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি।

মা কালসিদ্ধা স্বয়ং আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। নিজের মুখে জানিয়েছেন আমাকে সবকিছু। এত বড় সৌভাগ্য আমি কোনওদিনও কল্পনাও করিনি। মা স্বয়ং বলেছেন রৌম্যজাগরণের কথা, বীজের কথা, শাম্ভবীর কথা। কার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে। জয়ন্তকেও মা আদেশ দিয়েছিল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার। এই বিশু, বা অন্যান্যরা; এরা সবাই পাতরগণ্য সাধক। কিন্তু মা আমাকেই বেছে নিয়েছেন এই দুরূহ কাজের জন্য।

চোদ্দো মাস ধরে আমি সযত্নে ঘুঁটি সাজিয়েছি। সোলাঙ্কীদের সঙ্গে কৃষ্ণাদের পরিবারের হাতে ধরে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছি। আগের ড্রাইভারকে টাকা খাইয়ে সোলাঙ্কীদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট। নতুন ড্রাইভার হিসাবে বিশুকে ওদের বাড়িতে ঢোকানো। অবশ্য জয়ন্ত আমাকে সাহায্য না করলে এত কিছু সম্ভব হত না। যদিও জয়ন্ত বলেছিল সোলাঙ্কীর সঙ্গে কৃষ্ণার বন্ধুত্ব করানোর কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ওদের সর্বানন্দপুরে টেনে আনার। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম শেষ মুহূর্তে বীজকে চোখের উপরে রাখাটা দরকার। শুধুই বিশুর হাতে সব ছেড়ে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।'

তারকনাথ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন, আবার সোজা হয়ে বসলেন। তৌফিকের দিকে কিছুক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারকনাথের আচমকা ভাব পরিবর্তনটা তৌফিক ঠিক বুঝতে পারল না। তারকনাথের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে তার গা শিরশির করে উঠল।

তারকনাথ বলে উঠলেন, 'আর যোগিনী কালসিদ্ধা তোকেই চেয়েছেন। বলেছেন রৌম্যপিতা হিসাবে আমার এই মানুষটিকেই দরকার। তুই কেন? তুইই কেন?'

তৌফিক একটু বোকার মতো চেয়ে রইল তারকনাথের দিকে। এই কে একটা যোগিনী, হঠাৎ তৌফিককেই কেন চাইবে?

'তোর ডান হাতটা দেখি।'

তৌফিকের হাতটা তারকনাথের দিকে বাড়িয়ে দিল। সরু রিস্ট ব্যান্ডটা খুলে নিল হাত থেকে। বাদামি চামড়ায় তিনটে সাদা সুতোর মতো দাগ।

'এটা তোকে চন্দ্রমৌলি দিয়েছিল। তা-ই না?'

তৌফিক ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'চন্দ্রমৌলি কে ছিল জানিস?' তৌফিকের নেতিবাচক ঘাড় নাড়া দেখে তারকনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, 'আমিও জানি না। তবে ও কোনও সাধারণ মানুষ ছিল না। আমার দাদা মহাযোগী ছিলেন। তিনিই চন্দ্রমৌলিকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তিনি আমাকে এ-ও বলে গিয়েছিলেন, আমি যেন কোনওদিনও ওই বালককে ঘরছাড়া না করি। কিন্তু সেইদিন কী যে ঘটে গেল। নিজের মেয়ের ওই অবস্থা দেখে আমার মাথাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ও একটা অশুভ শক্তি। ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলাম আমি। ও কি মরেছিল?'

তৌফিক ঘাড় নাড়ল। সে জানে না। তারকনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, ফিরে গেলেন আগের কথায়। 'মা কালসিদ্ধা তোকেই কেন চেয়েছে, সেটা আমি বুঝতে পারিনি। তবু মায়ের আদেশ। তা-ই তোকেও জীবিত আহুতি দিতে হবে... সেই জন্যেই তোকে...'

'অচিন্ত্যকে মাধ্যমিক পাশ করানোর অছিলায় টেনে আনলেন নিজের বাড়িতে। লতাকে ঠেলে দিলেন আমার দিকে। আপনারা সবাই এইরকম?' তৌফিক সামান্য ঝাঁজালো সুরে বলল।

'মানে?'

'এইসব পিশাচসাধনার সঙ্গে যুক্ত?'

'তুই কী করে ভাবলি, বিমুর মতো গণ্ডমূর্খ বা টুকলুর মতো মেরুদণ্ডহীন ভিতু ছেলে এই মহান সাধনা করতে পারে? নাহ্ লাল, এই একটা ক্ষেত্রে আমি হেরে গিয়েছি। আমার বংশে আর এমন কোনও পুরুষ নেই, যে এই ধারা অক্ষয় রাখতে পারবে। আমিই শেষ। আমার বংশধরই এত বছর পরে জন্ম দেবে দেবীর প্রসাদ। আমার নাম তন্ত্র ইতিহাসে অজর অমর হয়ে যাবে।'

তৌফিক খানিক মুহ্যমানের মতো বলল, 'লতাই কেন? আপনার কথামতো আরও তো কত পাতরগণ্য মেয়ে ছিল।'

'নিজের রক্ত থাকতে এত বড় সৌভাগ্য আমি অন্য কাউকে কী করে দিতে পারি? আর দ্বিতীয় কারণ হল, তোর প্রথম থেকেই লতার প্রতি টান ছিল। যদিও লতা কখনও তোকে পাত্তা দেয়নি বলে তুইও আত্মসম্মানের বেড়া ডিঙিয়ে কিছু করিসনি। অবশ্য তুই চিরকালই ভালো ছেলে। তা না হলে আজকাল কে আর রেজিস্ট্রি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে?

কবে থেকে প্ল্যান ছকে রেখেছি আমরা, আর তুই এতটাই ঢেঁটা যে, দুটো সইয়ের জন্যে আমাদের পরিকল্পনা মাটি করাতিস। তা-ই সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তোদেরকে রেজিস্ট্রি করতে দিতে হল। তারপর তোরা নিয়মিতভাবে মিলিত হচ্ছিস দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। নির্দিষ্ট দিনে লতাকে সম্পূর্ণ তৈরি করে পাঠানো হয়েছিল। এক বিশেষ তান্ত্রিক ওষুধ। যাতে তোদের মিলন বৃথা না যায়।'

সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য একটা মানুষ কত নিচে নামতে পারে! তারকনাথের কথা শুনতে শুনতে তৌফিকের বমি পাচ্ছিল। তাকে নিয়ে, লতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে ওই লোকটা।

তৌফিক একবার লতার দিকে তাকাল। মনে পড়ল, প্রাক্-বিবাহ প্রেমপর্বে লতা বারবার তার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হতে চাইত। সে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারত না তখন। শুধুই সংস্কারের বশে বা হয়তো খানিকটা অন্য ভয়েও সে রেজিস্ট্রি না-হওয়া পর্যন্ত লতাকে সরিয়ে সরিয়ে রাখত।

'লতা জানত সব?' কেমন যেন আকুল হয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'না।' তারকনাথ বললেন, 'প্রথমে লতাকে আমরা বশীকরণ করেছিলাম, যাতে তোকে সিডিউস করতে পারে। আমি ভেবে রেখেছিলাম, ওর গর্ভধারণের তিন মাসের মাথায় জয়ন্তর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে সরিয়ে দেব। নয়তো ওর শারীরিক অবস্থা দেখে বাড়ির সবাই সন্দেহ করবে। আসলে আমি চেষ্টা করছিলাম ওকে যতদিন পারা যায় কাছে কাছে রাখতে। এই পুশুলিয়ার মাঠের মাঝখানে জয়ন্তর কবজায় দিনরাত্রি কাটাবে— এটা আমার ভালো লাগছিল না।

কিন্তু গর্ভধারণের দুই মাস পরে, প্রথম রক্তবৃত্তের প্রসাদগ্রহণের সময়েই যে লতার বশীকরণ কেটে যাবে, আর ও যে তোর সঙ্গে হঠাৎ পালিয়ে যেতে চাইবে; এইটা আমরা ভাবতে পারিনি। যদিও তোদেরকে চোখে চোখেই রাখা হয়েছিল। তা-ই তো তোকে জয়ন্ত অত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারল।

অবশ্য লতা আমার কথাও জানে না। ও এটাও জানে না যে, ওকে রক্তবৃত্তে আহুতি দেওয়া হবে। ওকে অতটা মানসিক যন্ত্রণায় রাখতে চাইনি আমি। ও শুধু জানত, ওর বাচ্চা জন্মে গেলেই জয়ন্ত আবার ওকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে আমার মনে হল, মেয়েটা মরার আগে কয়েকদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটিয়েই যাক। অবশ্য জয়ন্ত বারবার মানা করেছিল। এই নিয়ে জয়ন্তর সঙ্গে আমার একটু মতান্তরও হয়েছিল।'

'আমাকেও তো বশ করতে পারতেন?' তৌফিক সামান্য ঘৃণার সুরে বলল।

'কাউকে বশে রাখা অত সহজ কাজ নয়। নিত্যদিন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়। তোর ক্ষেত্রে সেই সুযোগ আমার ছিল না। সেই জন্যেই তো জয়ন্ত তোকে তুলে নিয়ে গিয়ে

পেটাল। তোকে শুইয়ে রাখার খুব দরকার ছিল যে। যোগিনী কালসিদ্ধা যে তোকেই চেয়েছে, জীবিত।' তারকনাথ শেষ কথাগুলো বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

লতা তাকে ভালোবাসত না। শুধুই বশীকরণ! শুধুই এই জ্যান্ত পিশাচগুলোর হাত থেকে বাঁচার আশায় তৌফিককে আঁকড়ে ধরেছিল। না! লতা পরেও তাকে বারবার বাঁচাতে চাইছিল। কেন? একটা জলজ্যান্ত মানুষ, যে তার সন্তানের পিতা, সে খুন হয়ে যাবে—এটা দীর্ঘদিনের মেয়েলি সংস্কারে লতা সহ্য করতে পারেনি? অপরাধবোধ? বিবেকদংশন? নাকি, ওটাই প্রেম! তৌফিক ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগল লতার সাদাটে রক্তশূন্য গালে।

বিয়াল্লিশ

পূর্ণিমার দিন সকালবেলা রজত লাভপুর হাসপাতাল থেকে বেরল। উত্তেজনায় কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল সে। সোলাঙ্কীর অবস্থা এখন অনেকটা ভালো। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান ফেরেনি তার। রজত ওর জন্যে পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রজত স্পষ্ট বুঝতে পারছিল এই তৌফিক-লতা-জয়ন্তর ত্রিকোণ মামলায় সোলাঙ্কী একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

গতকাল তৌফিকদের বাড়ি থেকে থানায় যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সে খোঁজ পেয়েছিল, লাভপুর হসপিটালে সোলাঙ্কী গুরুতর আহত অবস্থায় ভরতি হয়েছে। তখুনি বাইক নিয়ে ছুটেছিল লাভপুর। সে পৌঁছানোর আগেই ঘটে গিয়েছিল আরেক ঘটনা। কে বা কারা যেন হাসপাতালের মধ্যে দিনের বেলাতেই খুন করার চেষ্টা করছিল সোলাঙ্কীকে। অক্সিজেনের নল খুলে দিয়েছিল। তখনই রজতের মনে হয়েছিল, সোলাঙ্কী কিছু নিশ্চয়ই জানে। নার্স-ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে সে বুঝতে পারে, গতকাল রাত্রে তৌফিকই সোলাঙ্কীকে লাভপুর হসপিটালে ফেলে রেখে পালিয়েছে। কিন্তু কালকে রাত্রে তৌফিক লাভপুরে কী করছিল? লাভপুর তো কলকাতা যাওয়ার রাস্তায় পড়ে না।

সোলাঙ্কীই বা এরকম গুরুতর আহত হল কী করে? ওর পরিবারের বাকিরা কোথায়? নানান প্রশ্ন ভিড় করছিল রজতের মাথায়। যতক্ষণ না সোলাঙ্কীর জ্ঞান ফেরে, ততক্ষণ রজত কোথাও যায়নি।

গতকাল সারারাত্রি একটা চেয়ার নিয়ে সে সোলাঙ্কীর বেডের পাশে বসে ছিল। রজতের প্রতীক্ষা বৃথা যায়নি।

প্রায় ভোরের দিকে রজত দেখল, সোলাঙ্কীর চোখের পাতা কাঁপছে। সে কী যেন বিড়বিড় করছে। রজত উৎসুক হয়ে কান পাতল সোলাঙ্কীর ঠোঁটের কাছে। আহা রে, মেয়েটা নিজের বোনের নাম ধরে ডাকছে। তার পরের কথাটাতেই রজত বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে বসল।

সোলাঙ্কী বলছে, ‘জয়ন্তদা... না... শামুকে মেরো না।’ রজত এবার স্পষ্ট শুনতে পেল, সোলাঙ্কী আবারও বিড়বিড় করছে, ‘বাঁচাও তৌফিকদা।’

সোলাঙ্কী আর কিছু বলতে পারেনি, যন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে একজন নার্স তাকে ঘুমের ইনজেকশন দেয়। বেশি কিছু শোনার প্রয়োজন ছিল না রজতের। ওই কয়েকটা কথাতেই সে ঘটনাটা বেশ খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিল। জয়ন্ত শাম্ভবীকে মারতে চেয়েছিল, কোনওভাবে তৌফিক মাঝখানে এসে পড়ে। কী মারাত্মক! এখন কোথায় তৌফিক? সোলাঙ্কীর বাবা আর বোনই বা কোথায়?

লাভপুর থেকে বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে থানায় ঢুঁ মারার পরে রজতের মনে হল একবার তৌফিকের বাড়ি যাওয়া উচিত। সে বেশ কিছু জিনিস মেলাতে পারছে না। ছেলেটার কোনও একটা বিপদ হয়েছে বলে তার মনে হচ্ছে।

বেলা দুটো নাগাদ রজত তৌফিকের বাড়িতে বসে ছিল। তৌফিকের বাড়ির লোকজন একজন পিরকে ধরে এনেছে। তাকে দিয়ে বাড়ির অমঙ্গল দূর করার কাজ চলছে।

রজতকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে পিরটা কেমন একটু গুটিয়ে গেল। রজতেরও একবার মনে হল, পিরটাকে সে যেন চেনে। তৌফিকের দাদা একটু পরেই আসবে। রজতকে বসতে বলে তৌফিকের ভাবি শরবত বানাতে গেল।

'ভাবি, জিমি কই গেল?' একটু পরে ভাবি শরবত নিয়ে ফিরে এলে রজত জিজ্ঞেস করল। অন্যদিন এই বাড়িতে কেউ ঢুকলে আগে জিমি ছুটে আসে। আজ আসেনি। ভাবি হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠলেন। রজত ভারী অবাক হল। কী ব্যাপার?

তৌফিকের আব্বা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আর বল না, রজত। কাল রাত্রে কারা যেন জিমিকে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে। তার উপরে সকাল থেকে সিরিনের খুব জ্বর। সে তো মাথাই তুলতে পারছে না। জানি না আল্লাহ্ কীসের সাজা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এই পিরবাবা, জান না কী অলৌকিক শক্তি ধরে! আমি মসজিদে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় ডেকে আমায় একের পর এক সব বলে দিল। ছোট ছেলের এই হয়েছে। সিরিনের এই হয়েছে। বাড়িতে শয়তানের ছায়া পড়েছে। তা-ই ওঁকে নিয়ে এসেছি।'

গ্রামের মানুষ, কথা কয় বেশি। তবে কয়েকটা কথা শুনে রজত যারপরনাই অবাক হল। 'আচ্ছা! জিমিকে মেরেছে!'

জিমি তো একটা খুদে কুকুর। খুবই ছোট। প্লে ডগ। বাড়ি পাহারা দেওয়ার কাজেও কিছু লাগত না। সে একবার জিমির দেহটা দেখতে চাইল। খণ্ডবিখণ্ড লাশটা উঠোনের একপাশে কাপড়-চাপা দিয়েই রাখা ছিল। দেখে রজতের খুব একটা ভালো লাগল না। এইভাবে বাচ্চা কুকুরটাকে খুন করল কে?

সে দেখল, পিরবাবা চুপিচুপি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রজত উঠে এসে খপ করে চেপে ধরল লোকটাকে।

'মাজারে যাচ্ছি।' পিরটা চিঁ চিঁ করল। রজতের খুব সন্দেহ হচ্ছিল দাড়িটা নকল। সে বিনা বাক্যব্যয়ে ধরে টান দিতেই পরচুলো সমেত দাড়িগোঁফ খুলে রজতের হাতে চলে এল। এই নকল পিরটাকে রজত ভালোই চেনে। কালই এর ছবি সে বিভিন্ন থানায় পাঠিয়েছে। বিশু ড্রাইভার।

বিশু একটা গোঁত্তা মেরে পালাবার চেষ্টা করছিল। রজত এক পুলিশি থাবড়ায় বিশুকে শুইয়ে দিল। পকেট থেকে হ্যান্ডকাফটা বের করে বিশুর হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। হঠাৎ বিশু অদ্ভুত তীক্ষ্নস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। 'শাহজাদি, শাহজাদি।'

রজত কিছু বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা। সে বিশুকে থামানোর জন্যে আরেকটা থাপ্পড় বসাল।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে একটা প্রাণান্তক চিৎকার শোনা গেল। রজত বিশুর ঘাড়ে একটা পুলিশি রদ্দা মেরে অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর ছুটে গেল বাড়ির ভিতরে। এমন দৃশ্য রজত কোনওদিনও দেখেনি। তৌফিকের ভাবি তরকারি কুটতে কুটতে উঠে গিয়েছিলেন। অসুস্থ সিরিন কখন যেন বিছানা ছেড়ে উঠে এসে তুলে নিয়েছে বঁটিটা। সোজা কোপ বসিয়ে দিয়েছে মায়ের শরীরে।

রজত দেখল, তৌফিকের ভাবি বসার ঘরের মেঝেতে পড়ে গেছেন। তাঁর পেটের কাছ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে শাড়ি। বঁটিটা তুলে মাকে মারতে যাচ্ছে

সিরিন! মাত্র বছর তিন-সাড়ে তিনের বাচ্চা মেয়েটা!

রিভলভার বের করেও রজত বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনেই সিরিন মায়ের মাথা লক্ষ্য করে বঁটিটা চালিয়ে দিল। তৌফিকের ভাবি শেষ মুহূর্তে বাঁচার জন্যে হাত তুলে আটকাতে গিয়েছিলেন। তাঁর হাতে কোপটা এসে পড়ল। ভাগ্যক্রমে বঁটিটা লাগল না মাথায়।

রজত ছুটে এসে চেপে ধরল সিরিনকে। সিরিন ঘুরে দাঁড়িয়ে রজতকে মারতে গেল। সিরিনের হাত থেকে বঁটিটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল রজত। সিরিন আচমকা কামড় বসাল রজতের হাতে। রজত কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না সিরিনিকে। রজতের মনে হল, দুধে-দাঁতেই মেয়েটা তার হাড়মাংস আলাদা করে ফেলবে। তৌফিকের আব্বা এসে চেপে ধরলেন সিরিনকে। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে আরও লোক জড়ো হয়ে গেছে।

কেউ একজন একটা কাঠের টুকরো দিয়ে মারল সিরিনকে। সিরিনের কপাল ফেটে গেল কিন্তু সে কামড় ছাড়ল না। যতক্ষণে রজতের হাত থেকে সিরিনের দাঁত ছাড়ানো হল, ততক্ষণে হাতের চামড়া কেটে মাংস খুবলে নিয়েছে সে। তার দু-কষে রক্ত লেগে ছিল। দাঁতের ফাঁকে আটকে আছে মাংসের টুকরোটা। কোনওরকমে চার-পাঁচজন লোক মিলে সিরিনের হাত-পা বেঁধে ফেলল। তা-ও খুদে মেয়েটা দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছিল সবার দিকে।

'ডাইনি। ডাইনি।' সবাই চেঁচাচ্ছিল, কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। রজত হতভম্বের মতো বসে ছিল মাটিতে। তার হাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

তেতাল্লিশ

তৌফিক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনের এক কোণে রাধাচূড়া গাছটার ছায়ায় চুপচাপ শুয়ে ছিল। তাকে সবাই দেখেছিল, কেউ কিছু বলেনি। মধ্যগগনের খর সূর্যকে আড়াল করে ছায়াটোপ তৈরি করেছে রাধাচূড়ার হলুদ-সবুজ আঁচল।

জ্ঞানরহিত লতার পাশে সে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেনি। পেটের মধ্যে বাচ্চাটা নড়াচড়া করছে। তার একটা সময় মনে হচ্ছিল, লাথি মেরে পেটটা খসিয়ে দেয়। তাহলে আর রৌম্য জন্মাবে না। তারাও দুজনে বেঁচে যাবে।

চিন্তাটা মাথাতে আসতেই তৌফিক শিউরে উঠেছিল। কী পিশাচ জন্মাবে সে জানে না, কিন্তু এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তৌফিক একটা পিশাচের মতোই চিন্তা করছে।

ইয়া আল্লাহ্, একটা গর্ভবতী মেয়ের পেটে লাথি মারার কথা সে ভাবতে পারল কী করে? সত্যি সত্যি সে জাহান্নমে যাওয়ার যোগ্য। সে শুনেছিল, মানুষ মৃত্যুর আগে প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে পড়ে। কাউকে যদি জানিয়ে দেওয়া যায় তার মৃত্যু হবে এইদিনে এই নির্দিষ্ট সময়ে, সেই সময় যত এগিয়ে আসে, সেই মানুষ তত পাগল হয়ে যায়। তারও কি তা-ই হল নাকি?

উঠোনে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কয়েকজন মহিলা আর সাধু যাতায়াত করছে। কী সব জিনিসপত্র এনে এনে রাখছে বেদির চারপাশে। তৌফিক সেসব খেয়াল করছিল না, সে দেখছিল রাধাচূড়ার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো নীল আকাশ, সাদা মেঘ, সূর্যের আলো, গাছের ডালে মৌটুসি পাখির নাচানাচি, গাছের গুঁড়িতে ঘর বানাচ্ছে পিঁপড়েরা।

সবাই থাকবে— এই সূর্যের আলো, এই সাদা মেঘের দল, এমনকী ওই, ছোট পিঁপড়েটাও থাকবে যেটা এইমাত্র পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। সবাই থাকবে এই পৃথিবীতে, শুধু তারা দুজন থাকবে না।

তার জীবনটা বড় দ্রুত শেষ হয়ে গেল। এরকম ভরন্ত রাধাচূড়ার গাছ, মৌটুসি পাখি, বসন্ত বাতাস, দিগন্তবিস্তৃত ধানের খেত; ছুটন্ত ট্রেনে করে যাওয়ার মতোই পেরিয়ে গেল সে। কোরান, পুরাণ, বিজ্ঞান সবকিছু ভুলে গিয়ে অনিবার্যের মতো একটা কবিতার লাইন ভেসে এল তৌফিকের মনে।

বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, ‘আবার আসিব ফিরে, কোপাই নদীর তীরে, এই বাংলায়... ’

ধানসিড়ির জায়গায় কোপাই বসাতে বসাতে তৌফিকের ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। কতদিন হাসেনি সে! হাসতে যেন ভুলে গিয়েছিল।

জীবনে শেষবারের মতন খোলা আকাশের নিচে, ঘাসে-ভরা মাটির উপরে তৌফিক শুয়ে ছিল। এলোমেলো হাওয়ায় চার-পাঁচটা করে হলুদ ফুল ঝরে পড়ছিল তার উপরে। শান্ত মনে তৌফিক কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। সে আবার কালকের পাখিটাকে স্বপ্নে দেখল।

সোনালি ইগলটা কালকের মতোই উড়ে যাচ্ছে। পাখিটা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তবু সে থামছে না এক মুহূর্তও, গতি কমাচ্ছে না এক বিন্দুও। তার বড্ড তাড়া! তাকে কোথায় যেন পৌঁছাতে হবে।

মাটির অনেক উপরে থাকা সত্ত্বেও সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে তার নিজের ছায়া জলের মধ্যে। তার নিচে উড়ে যাচ্ছে বহু পাখি। বকের সারি, চিল, আরও নিচে কাক, শালিখ, ময়না... আবার সন্ধ্যা নেমে আসছে, সূর্য ঢলে পড়ছে নারকেল গাছের পাশে। পুবের আকাশে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। দিক্‌চক্রবালে তামার থালার মতন এক প্রকাণ্ড লাল চাঁদ উঠে এসেছে। পৃথিবীর বুকে এক অনন্ত অভিশাপ বহন করে আনছে তার গায়ে লেগে-থাকা রক্তাভা! রক্তচন্দ্র। গ্রহণ চন্দ্র।

গোধূলি আকাশের নানা রঙের খেলা ভেদ করে উড়তে উড়তে ইগলটা নিচের পৃথিবীর দিকে তাকাল। পাখসাট খেয়ে নেমে এল মেঘ ভেদ করে। বহু নিচে পৃথিবীর মাটিতে বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে বাগান আর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা মাঠকোঠা। পাখিটা বাতাস কেটে নেমে এল আরও নিচে। উঠোনের এক ধারে প্রেমপ্রতিমাস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল রাধাচূড়া গাছ। ফুল ঝরে ঝরে তার তলার মাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। সেই বিষণ্ণ ফুলের চাদরে শুয়ে আছে এক কৃষ্ণবর্ণের যুবক।

***

তৌফিকের ঘুম ভেঙে গেল। সূর্য ডুবে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। পশ্চিমের আকাশ অকারণ রাঙা হয়ে আছে। সে দেখল, দুটো সাধু দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ‘চল্। গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।’

তৌফিকের বুকটা ধক করে উঠল। সময় শেষ! তার মুখের দিকে তাকিয়ে সাধুটা আবারও বলল, ‘চল্, চল্। দেরি করিস না।’ এই প্রথম তৌফিকের মনে হল, সে মাটি ছেড়ে উঠতে পারবে না। তার শরীরে কোনও শক্তি নেই। সে দেখল, লতাকে নিয়ে এসে শুইয়ে রাখা হয়েছে বেদির কাছে।

সত্যি এরা তাদেরকে মেরে দেবে! সত্যি পিশাচ জন্মাবে!

আরেকটা সাধু এসে দাঁড়াল। দুজনের মিলে পুতুল হয়ে-যাওয়া তৌফিককে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। সে দেখল, বড় উঠোনটায় প্রায় জনা দশেক সাধু আর যোগিনী জমা হয়েছে। বিশু নেই তাদের মধ্যে। তৌফিকের পা চলছিল না, তাকে সামান্য টেনেহিঁচড়ে লোক দুটো বেদির কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

‘বাধা দিয়ে কোনও লাভ হবে না।’ একজন তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল।

বৃত্তের মধ্যে রক্ত যেন ফুটছে।

তৌফিক একবার আকাশের দিকে তাকাল। পুব আকাশে একটা বিশাল গ্রহণ-লাগা চাঁদ। চাঁদটা একটু একটু করে ঢুকে যাচ্ছে রাহুর পেটে। বিশাল রক্তময় গোলক। একটা সাধু তার পিঠে হাত রাখল ধাক্কা দেবে বলে। তৌফিক আর্তনাদ করে উঠল, ‘বাঁচাও।’

গ্রহণ-লাগা চাঁদ ফুঁড়ে অবাস্তব স্বপ্নদূতের মতো একটা প্রকাণ্ড সাদা সোনালি ইগল পাখি উড়ে এল। যে সাধুটা তৌফিককে ধাক্কা দিচ্ছিল, পাখিটা সোজা উড়ে এসে তার চোখে নখ বসিয়ে দিল। সাধুটা ছটফট করতে করতে পড়ে গেল একটু দূরে।

তৌফিক প্রায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল বৃত্তের মধ্যে, একটা সাদা হাত এসে তৌফিককে টেনে সরিয়ে দিল বৃত্তের পাশ থেকে।

উঠোনের মাঝখানে ছিটকে পড়তে পড়তে তৌফিক দেখল, বিশাল পাখিটা একটা অদ্ভুত মানুষে পরিবর্তন হয়ে গেছে। দিঘল লম্বা সাদা চুল উড়ছে হাওয়ায়। তার সারা শরীর শ্বেতাগ্নির মতো জ্বলছে। নীল চোখে অবিশ্বাস্য হিংস্রতা।

পাতরগণ্যরা চন্দ্রমৌলিকে দেখতে পায়নি। তারা দেখল, একে একে সাধু আর যোগিনী ঢলে পড়ছে মাটিতে। অদৃশ্য ধারালো অস্ত্রে কেউ ছিন্ন করে দিচ্ছে তাদের কণ্ঠনালি। একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল উঠোনের মাঝখানে। কয়েকজন সাধু ত্রিশূল দিয়ে শূন্যে আঘাত করার চেষ্টা করল। চন্দ্রমৌলি বোধহয় প্রতীজ্ঞা করে এসেছিল, একটাকেও সে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না। সে একাই খুন করছিল একের পর এক।

হঠাৎ তৌফিক দেখল, তারকনাথ একটা ত্রিশূল তাক করেছেন চন্দ্রমৌলির দিকে। তারকনাথের চোখ দেখেই তৌফিক বুঝতে পারল, তার মতো তারকনাথও চন্দ্রমৌলিকে দেখতে পাচ্ছেন। তৌফিক চট করে গড়িয়ে গেল তারকনাথের পায়ের কাছে। তারকনাথ ত্রিশূলটা ছুড়ে দিলেন চন্দ্রমৌলিকে লক্ষ্য করে। তৌফিক এক লাফে উঠে দাঁড়াল। খপ করে বাম হাতে ত্রিশূলের লেজটা ধরে ফেলে নিজের রিফ্লেক্সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। সে ঘুরে এক লাথি মারল তারকনাথকে। তারকনাথ ছিটকে পড়লেন রক্তবৃত্তের একপাশে।

তৌফিক ফিরে তাকিয়ে দেখল, চন্দ্রমৌলি উঠোনের শেষ সাধুটার বুকে বিঁধিয়ে দিল একটা বর্শা। তৌফিক হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল শ্মশান হয়ে-যাওয়া উঠোনের এক প্রান্তে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি। উঠোনে খান দশেক ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে আছে। অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতকায় তরুণ। চন্দ্রমৌলি! এতক্ষণে তৌফিক চিনতে পারল বন্ধুকে। সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

'হে দেবী। আমার বাসনা পূর্ণ কর।'

বিকট চিৎকারটা শুনে তৌফিক আর চন্দ্রমৌলি দুজনেই ফিরে তাকাল। তারকনাথ লতার জ্ঞানহীন দেহটা টেনে নিয়ে এসেছেন রক্তবৃত্তের পাশে।

চন্দ্রমৌলি সাধুর বুক থেকে বর্শাটা খুলে ছুড়ে মারল তারকনাথের দিকে। নিখুঁত লক্ষ্যে তারকনাথের গলায় গেঁথে গেল বর্শাটা। কিন্তু ততক্ষণে তিনি লতার দেহটা ছুড়ে দিয়েছেন রক্তবৃত্তের মধ্যে।

তৌফিক তিরবেগে ছুটে গেল। সে লতাকে ধরে ফেলল ঠিকই কিন্তু এবারে সে বৃত্তের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

তরলে ডুবে যেতে যেতে সে শুনতে পেল চন্দ্রমৌলির তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদ, 'লাআআল!'

চুয়াল্লিশ

ফুটন্ত তরলে ছেঁকা লাগল তৌফিকের চামড়ায়। বহু দিনের বাসি পচা মাংসের শ্বাসরোধকারী গন্ধে তৌফিকের দম আটকে এল। বীভৎস তরলটায় নিমেষে ডুবে গেল দুজনে। সামান্যতম প্রতিরোধও করতে পারল না সে। তরলটা যেন জীবন্ত। আঁকড়ে ধরছে তৌফিকের হাত-পা। অবলীলায় ঢুকে যাচ্ছে নাকে-মুখে। কোনও নরকের পিশাচিনী ডাকিনীরা টেনে নামাচ্ছে তৌফিককে পাতালের গহ্বরে। তৌফিক শ্বাস নিতে পারছিল না। এই কি শেষ? তারা মরে যাচ্ছে!

এক অদ্ভুত জগতে ঢুকে গেল তৌফিকের চেতনা। সে অনুভব করল কত তীক্ষ্ণ হতে পারে পাপ। ন্যায়ের চাপ কত মারাত্মক। কত পচনশীল মানুষের জীবন। কত তুচ্ছ তারা এই বিশাল মহাশক্তির কাছে। আনন্দ, দয়া, মায়া, প্রেম মিশে যাচ্ছিল ক্রোধ, ঘৃণা, শঙ্কা, অস্থিরতায়। দুই বিপরীত অনুভূতির অস্বাভাবিক এক মিলনের চাপে পিষে যাচ্ছিল চেতনা। এই চাপ স্বাভাবিক মনুষ্যচেতনায় সহ্য করা সম্ভব নয়।

এক অন্ধকার জগতে চেতনাটা মিশে যাচ্ছিল ক্রমশ। দুটো অনন্ত শক্তি একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যুগল মিথুনরূপে বয়ে যাচ্ছে সেই প্রাচীন অন্ধকারে। শুভ-অশুভ। ভালোমন্দ। ন্যায়-অন্যায়। কোনও পার্থক্য নেই। শক্তিদ্বয়ের মধ্যে ভেদ খুঁজে পাওয়া ভার। মৈথুনরত নারী-পুরুষের মতোই তারা একাঙ্গী হয়ে পড়েছে।

তীব্র যন্ত্রণায় প্রায় অসাড় হয়ে গেল তার চেতনা। অনন্ত বেদনার সুউচ্চ শিখরে নিস্তেজ হয়ে আসতে আসতে, প্রবল বাতাসেও জ্বলতে-থাকা প্রদীপের শিখার মতোই দপদপ করতে লাগল। মাঝে মাঝে তীব্র ঝাপটায় সে ডুবে যাচ্ছিল, আবার জেগে উঠছিল। তাকে ঘিরে জেগে উঠল এক অগ্নিবলয়। চেতনার কি কোনও নাম থাকে? অথচ সেই বিশাল অগ্নিবলয় থেকে ধ্বনি উঠছিল। লাল... লাল... লাল...

তৌফিক চোখ মেলল।

একটা বিশাল প্রান্তর। দূরে দূরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। তামারঙের আকাশ থেকে অদ্ভুত লালচে আলো ঠিকরে আসছে। বাতাসে বিকট মাংস-পচা গন্ধ ভাসছে। তৌফিক কোনওমতে উঠে বসল। প্রান্তরে অসংখ্য ভাঙা অস্ত্র ছড়ানো। মুগুর, তলোয়ার, খড়্গ, বর্শা, বল্লম... মাটিতে গেঁথে আছে সেগুলো। তখনই সে খেয়াল করল, তার পায়ের তলায় মাটি নয়, মানুষ পড়ে আছে। না, মানুষও নয়। চামড়া ছাড়ানো হাড়মাংসসর্বস্ব রক্তাক্ত লাশ।

'আঁ আঁ আঁ...' তৌফিক মারাত্মক চিৎকার করে উঠল। ভয়ের চোটে পাশে পড়ে থাকা লতার জ্ঞানহীন দেহটা জড়িয়ে ধরল। তার একবার মনে হল, সে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে, কিন্তু তার চেতনা দিব্যি সজাগ রইল।

'লাল!' কেউ তার পিঠে হাত রাখল। তৌফিক চমকে ফিরে তাকাল। চন্দ্রমৌলি নেমে এসেছে!

'এখুনি এখান থেকে বেরতে হবে...' চন্দ্রমৌলি বিড়বিড় করল। তাকে যথেষ্ট ভীত দেখাচ্ছিল।

'কীভাবে?'

চন্দ্রমৌলি হাত তুলে দেখাল, একটু দূরে মাঠের মধ্যে একটা আগুনের বৃত্ত জ্বলছে। বৃত্তটা মাটির উপরে অনুভূমিকভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। বৃত্তের মধ্যে একটা মেয়ে। ধ্যানস্থ।

'একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড চাই। ওকে খাওয়াতে হবে। তাহলেই ও দ্বার খুলে দেবে। চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণকালের মধ্যেই... কিন্তু তুই কি পাগল? একটা পাতরগণ্য মেয়ের জন্যে... কেন?'

'আমি বলছি।' মৃত প্রান্তরে কথা দুটো যেন ধ্বনিত হল। একটা কালো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে লাশের প্রান্তরে। মহাযোগিনী কালসিদ্ধা! চন্দ্রমৌলি জানত, এখানে এলে যোগিনীর মুখোমুখি তাকে পড়তেই হবে।

'ভৈরব, তুমি কি এতটাই বোকা? একজন কখন আরেকজনের জন্য মরতে চায়? ও রৌম্যপিতা।'

চন্দ্রমৌলির চোখের মণি বিস্ফারিত হল। এতক্ষণে সে যোগিনীর সম্পূর্ণ চালটা বুঝতে পেরেছে। শুধু কালসন্দর্ভাই নয়। এক অজর অমর কালসন্দর্ভাকে জন্ম দিতে চলেছে ওই পাতরগণ্য মেয়েটা! কী ভয়ংকর!

দুরন্ত রাগে সে ফিরে দাঁড়াল তৌফিকের দিকে। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল। 'পিরিত করার জন্য পৃথিবীতে মেয়ে খুঁজে পাসনি তুই?'

অক্ষমের রাগ প্রকাশ। চন্দ্রমৌলির কোনও ক্ষমতা নেই এখন যোগিনীর সঙ্গে লড়াই করার। তৌফিকের জন্যে সে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এসেই বুঝেছে, এই জগতে তার শক্তি শূন্য হয়ে গেছে। এই জগতে কারও মনকে সে অধিকার করতে পারবে না।

চন্দ্রমৌলি অনুভব করছিল, গত চোদ্দো মাসে যোগিনীর শক্তি অনেক অনেক বেড়ে গেছে। অন্ধকার নরকের ক্ষমতাকে সে করায়ত্ত করেছে। এই জগতে কালসিদ্ধা দেহহীন হলেও চন্দ্রমৌলির মতো ক্ষমতাহীন নয়। যোগিনী থেকে ডাকিনী হয়ে উঠেছে সে। ডাকিনী কালসিদ্ধা!

এখনও জন্মায়নি রৌম্যশিশুটা। একবার জন্মালেই সব শেষ। ওটাকে আর কিছুতেই মারতে পারবে না চন্দ্রমৌলি। জন্মানোর আগেই ওটাকে...

হঠাৎ তৌফিকের টুঁটি চেপে ধরে সে ছুড়ে দিল ডাকিনীর দিকে। তৌফিক শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল চন্দ্রমৌলির ইশারাটা। চন্দ্রমৌলি তার হাতে গুঁজে দিয়েছে একটা ভাঙা অস্ত্র। তৌফিক হাওয়াতে পাক খেল। অস্ত্রটা সমূলে বসিয়ে দিল ছায়ামূর্তির বুকের মধ্যে। তার নিশানা ভুল হল না। কিন্তু বিশ্রী খলখল হাসি ছুড়ে দিয়ে ছায়ামূর্তিটা আঙুল তুলে কী যেন ইশারা করল। পরমুহূর্তেই মিলিয়ে গেল ধোঁয়া হয়ে। অস্ত্রটা ঝপ করে পড়ে গেল।

তৌফিক চমকে ফিরে তাকাল। চন্দ্রমৌলি একটা দীর্ঘ তরবারি তুলে নিয়েছে। তার লক্ষ্য অজ্ঞান লতার গর্ভ। তরবারিটা লতার শরীর ছোঁয়ার আগেই এক আঘাতে চন্দ্রমৌলি ছিটকে পড়ল তৌফিকের পায়ের কাছে। কালসিদ্ধা বাধা দিয়েছে তাকে। ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়ামূর্তি আবার জমাট বাঁধছে।

লতার দিকে এগনোর আগেই তৌফিক টের পেল, পায়ের তলায় পড়ে থাকা হাড়মাংসসর্বস্ব লাশগুলো জীবন্ত হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরছে। তৌফিক আর চন্দ্রমৌলি নিমেষে বন্দি হয়ে গেল।

চন্দ্রমৌলি দেখল, কালসিদ্ধা লতার পেটের উপরে হাত রাখল। উচ্চস্বরে দুর্বোধ্য মন্ত্র পাঠ করছে সে। লতার বিশাল পেটটা থরথর করে কাঁপছে। এখুনি বাচ্চাটা জন্ম নেবে।

বাচ্চাটার মাথাটা দেখা যাচ্ছে। সে ক্রমে বেরিয়ে আসছে মায়ের গর্ভ থেকে। নাড়িতে আবদ্ধ বাচ্চাটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কালসিদ্ধা একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলল নাড়িটা।

কালসিদ্ধা নরকের নদীতে চান করিয়ে দিচ্ছে শিশুটাকে। মুখে তুলে দিচ্ছে নরকের খাদ্য। দেখতে দেখতে ওদের চোখের সামনে পরিপূর্ণ রৌম্য হয়ে উঠল শিশুটা। ঘোর নীল রং। সর্বাঙ্গে কাঁটা কাঁটা।

এক হাতে শিশুটাকে ধরে ডাকিনী এগিয়ে এল তৌফিকের সামনে। একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল তৌফিকের শরীরে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল তৌফিকের দেহ থেকে। ডাকিনী অঞ্জলি ভরতি রক্ত তুলে দিল শিশুটার মুখে।

চন্দ্রমৌলি দেখল শিশুটার হাতে একটা অস্পষ্ট তিন সুতোর রেখা। অবিকল তৌফিকের হাতে যেমনটা আছে। কালকবচ।

রক্ত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেখাটা উজ্জ্বল আর পরিষ্কার হয়ে উঠল।

সময় নেই আর। এবার ডাকিনী কালসিদ্ধা প্রবেশ করবে ওই শিশুর শরীরে। অস্থির হয়ে উঠল চন্দ্রমৌলি। যে করেই হোক, ওই শিশুকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। ডাকিনী কালসিদ্ধাকে কোনওভাবেই ওই শিশুর শরীরে প্রবেশ করতে দেবে না সে। একবার ওই দেহে প্রবেশ করলে কালসিদ্ধা অমর হয়ে যাবে। ওই রৌম্যশিশুটা অবধ্য।

সাড়ে আট বছর আগে দিকরং অববাহিকায় ঘটে-যাওয়া এক খণ্ডযুদ্ধ দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল চন্দ্রমৌলির। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতোই, চন্দ্রমৌলি বহুদিন আগে একবারমাত্র শোনা মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করল।

‘তেহাম্... ৎনাত...’

যেন প্রায় শূন্য থেকেই অস্ত্রটা এসে পড়ল চন্দ্রমৌলির হাতে। স্বর্ণবর্ণ বিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি খড়্গের পেটের মাঝখানে এক ঘূর্ণায়মান চক্র। চন্দ্রমৌলি দ্রুত অস্ত্রটা ঘোরাল। তাদের দুজনকে ধরে-রাখা লাশগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

‘জ্ঘকিদ্... সানাখে...’ চক্রটা দ্রুত গিয়ে আঘাত করল কালসিদ্ধাকে।

সে ছিটকে পড়তেই চন্দ্রমৌলি দ্বিতীয় মন্ত্রটা উচ্চারণ করল। চক্র থেকে এক দীর্ঘ শিকল বেরিয়ে বেঁধে ফেলল কালসিদ্ধাকে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমৌলি বুঝতে পারল, সে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না কালসিদ্ধাকে। মন্ত্র শুধু উচ্চারণ করলেই হয় না, সেই মন্ত্রকে আয়ত্ত করতে হয়। সমস্ত সংকল্প দিয়েও মন্ত্রটা সে অতটা জোরের সঙ্গে স্থাপন করতে পারেনি। তার ক্ষমতা কম।

‘একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড চাই, যে করেই হোক। ওই ডাকিনীটাকে আমি আটকাতে পারব না বেশিক্ষণ।’ চন্দ্রমৌলি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি কি মানুষ নই?' তৌফিক কোনওরকমে বলল।
'কালকবচ। কোনও অলৌকিক অস্ত্রে তোর মৃত্যু হবে না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটা একটা অলৌকিক জগৎ। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সবকিছু দৈবী।'
'আমি মানুষ?' দুজনে চমকে ফিরে তাকাল। লতা! লতা উঠে বসেছে। তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তার শরীর থেকে রৌম্যসন্তান বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রায়ণের প্রভাব মিলিয়ে গেছে। সে শুনেছে সবকিছু। কখন সে হাতে তুলে নিয়েছে একটা ভাঙা ধারালো অস্ত্র। তার মুখে যন্ত্রণা, আতঙ্কের সঙ্গে মিশে আছে এক দৃঢ়তা।
সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমি মানুষ?'
'হ্যাঁ!'
লতা একবার পূর্ণদৃষ্টিতে তৌফিকের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই অস্ত্র সমেত হাতটা শূন্যে তুলল। অস্ত্রটা বুকে ঢুকিয়ে পাঁজর ভেঙে ফেলল।
তৌফিক মরণান্তিক চিৎকার করে ছুটে গেল লতার দিকে, 'না না না।'
তৌফিক বাধা দেওয়ার আগেই লতা নিজের হৃৎপিণ্ডটা বার করে আনল হাতের মুঠোয়। কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? রৌম্য মায়েরা মানুষ হলেও সাধারণী নয়। ভৈরবের শত্রুকে যে জন্ম দেয়, সে কি সাধারণ হতে পারে? দীর্ঘ ছয় মাস রক্তবৃত্তের রক্ত খেয়ে লতাও আর সাধারণ নারী নেই।

একটা কেন দশটা রৌম্য মাতাকে মেরে ফেলতে হলেও কোনও ভৈরব কোনওদিন পিছপা হত না। কিন্তু দৃশ্যটা দেখতে দেখতে আচমকা চন্দ্রমৌলির মনের মধ্যে অপরাধবোধ জন্ম নিল। আবাল্যের বন্ধুর বুকফাটা আর্তনাদটা শুনতে শুনতে আপনা হতেই তার হাতের মুঠি দৃঢ়বদ্ধ হয়ে এল। কাজ শেষ হয়নি এখনও। বাচ্চাটাকে কালসিদ্ধার আওতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

স্পন্দনহীন লতার হাতে ধরা হৃৎপিণ্ডটা তখনও ধুকধুক করছে। একটু দূরেই শিশুটা পড়ে আছে। চন্দ্রমৌলি ছুটে এসে হৃৎপিণ্ডটা ছিনিয়ে নিল লতার হাত থেকে। একটা হুংকার শুনে চমকে উঠে পিছনে তাকাল চন্দ্রমৌলি। ডাকিনী কালসিদ্ধা শিকলটা ছিঁড়ে ফেলছে।
বিহ্বল তৌফিকের দু-হাতে দুটো জীবিত জিনিসকে গুঁজে দিয়ে চন্দ্রমৌলি চিৎকার করল, 'রান। পিছনে তাকাস না। বাচ্চাটাকে বের করে দে এখান থেকে।'
জীবিত বইকী! দুটোই জ্যান্ত। নাভিমূলে নাড়ির অংশ লেগে-থাকা সদ্যোজাত শিশু আর রক্ত গড়িয়ে-পড়া ধুকপুকে হৃৎপিণ্ডটা।
তৌফিক চন্দ্রমৌলির আদেশ অমান্য করতে পারল না। লাশগুলোর উপর দিয়ে, ধারালো অস্ত্রগুলোর উপর দিয়ে অগ্নিবলয়ের দিকে ছুট লাগাল। পিছন থেকে দৃশ্যে সে স্থাণু হয়ে যেত। ভয়ে-আতঙ্কে ছোটার ক্ষমতা থাকত না। ডাকিনী কালসিদ্ধা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চন্দ্রমৌলির উপরে।
তৌফিক যতটা দ্রুত পারা যায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল। চামড়াহীন মাংসল নরদেহগুলোতে তার পা পিছলে যাচ্ছিল। পা কেটে যাচ্ছিল ভাঙা অস্ত্রের টুকরোয়।

লাশগুলো ক্রমাগত বাধা দেওয়ার জন্য আঁকড়ে ধরতে চাইছিল তৌফিককে। দ্রুত রিফ্লেক্সে নিজেকে অপ্রতিহত রেখে তৌফিক ঠিক পৌঁছে গেল আগুনের বলয়টার কাছে।

শাম্ভবীর মুখে হৃৎপিণ্ডটা ঠেসে দিতে দিতে তৌফিক একবার ফিরে তাকাল। চাঁদ কোথায়? বিশাল অগ্নিবলয়টা গ্রাস করে নিচ্ছিল তাকে। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে তৌফিক অনুভব করল, চন্দ্রমৌলি হেরে যায়নি। সে-ও ঢুকে পড়েছে অগ্নিবলয়ে।

পঁয়তাল্লিশ

চারজনে ছিটকে বেরিয়ে এল পৃথিবীর মাটিতে। রক্তবৃত্ত জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল।

পৃথিবীর আকাশে গ্রহণের পূর্ণাবস্থা সবে শেষ হয়েছে। সাদা চাঁদটা কাটা নখের মতো সামান্য বেরিয়ে এসেছে রাহুর গলা থেকে। পুশুলিয়ার মাঠ ঘিরে মাঘ মাসের হিমশীতল ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। এখনও দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে দাওয়ার উপরে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি চতুর্দিকে।

চন্দ্রমৌলি ধীরে ধীরে উঠে বসল। কপাল থেকে গড়িয়ে-পড়া রক্তটা মুছে ফেলল। উফ, কয়েক পলের জন্য বেঁচে গেছে তারা। আরেকটু হলেই দ্বার বন্ধ হয়ে যেত। পরবর্তী পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের আগে দ্বার খোলার সম্ভাবনা থাকত না। অতদিনে ডাকিনী কালসিদ্ধার হাতে তারা শেষ হয়ে যেত।

হাতের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রমৌলি দেখল, সে একটা অদ্ভুত অস্ত্র পেয়েছে। চন্দ্রমৌলি সোনালি ধাতুটায় টোকা দিল দুটো। 'রক্ষাম্।' অস্ত্রটা গুটিয়ে ছোট হয়ে একটা চক্র তৈরি করল, তারপরে আরও ছোট হয়ে একটা বাহুবলয় তৈরি করে চন্দ্রমৌলির মণিবন্ধে মিশে গেল। চন্দ্রমৌলি এদিক-ওদিক দেখল।

তৌফিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাটির উপরে।

অন্যদিকে একটা নয় বছরের নগ্ন বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত রক্তাভাবিশিষ্ট তার ত্বক, লালচে কোঁকড়া চুল, রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট।

চন্দ্রমৌলি হাসল।

'তুই বীজ?'

'না। আমার নাম শাম্ভবী।' বালিকা প্রতিবাদ জানাল। তারপরে সামান্য কাঁপা গলায় বলল, 'খুব ঠান্ডা।'

চন্দ্রমৌলি খেয়াল করল তারা দুজনেই উলঙ্গ। একটা মৃতদেহের থেকে কাপড় খুলে নিতে নিতে সে হাত নাড়াল, 'মাটি থেকে তুলে নে একটা।'

'রক্ত লেগে আছে।'

'বীজের সাধ কত!'

'আমার নাম শাম্ভবী।' বাচ্চা মেয়েটা আবারও প্রতিবাদ করল।

কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে চন্দ্রমৌলি তৌফিককে পরীক্ষা করল। শ্বাস পড়ছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

শাম্ভবী তৌফিকের হাতের সাদা সুতোর মতো দাগটায় আঙুল বোলাল। বিড়বিড় করে বলল, 'লালকমল কান্ট বি কিল্ড্ বাই এনি ম্যাজিক্যাল ওয়ে!'

'নাহ্। অলৌকিকভাবে ওর মৃত্যু হবে না। কিন্তু বশীভূত বা আহত হতে পারে।'

চন্দ্রমৌলি ফিরে তাকাল শাম্ভবীর দিকে। 'ক্যান ইউ রিকল এভরিথিং?'

'ইয়েস। হোয়াই নট?'

'তাহলে আগে কেন তুই লালকে সব কথা জানিয়ে দিসনি? তুই যদি জানতিস সবকিছুই। তুই তো জানতিস তুই কে, রক্তবৃত্ত কী।'

'না তো!' শাম্ভবী খুব অবাক হয়ে গালে হাত দিল। 'আমি তো জানি না। আমি মাঝে মাঝে শুধু হারিয়ে যেতাম। ওই কালো পরিটা আমাকে কেমন ডুবিয়ে দিত।'

চন্দ্রমৌলি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝল ব্যাপারটা। যোগিনী কালসিদ্ধা যেমন তাকে হাতে পেয়ে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল, এই বীজটার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। প্রতিবার রৌম্যজাগরণের পরে যোগিনী বীজের মন থেকে পূর্বস্মৃতি মুছে দিত। আগের দুটো রৌম্যজাগরণের সমস্ত স্মৃতি শাম্ভবীর মন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু এইবারে সে সুযোগ পায়নি যোগিনীটা।

চন্দ্রমৌলি বুঝল নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে শাম্ভবীর বিশেষ কোনও ধারণা নেই। চন্দ্রমৌলি নিঃশ্বাস ফেলল। বীজটাকে সে বন্ধন করে দিতে পারবে। অন্য লোকে থেকে এই পার্থিব লোকে ভৈরবের মনবন্ধনকে কাটিয়ে ডাকিনী কালসিদ্ধা বীজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ডাকিনীর অত ক্ষমতা নেই।

'ওই বাচ্চাটার কী হবে? যেটা এল।' শাম্ভবী জিজ্ঞেস করল। 'আমি নিয়ে আসব?'

চন্দ্রমৌলি ঘাড় কাত করল। ওটাকে আপাতত বীজের হাতেই রাখা যাক। রৌম্য বাচ্চাটাকে ছোঁয়ার মতো মানসিকতা সে এখনও অর্জন করতে পারেনি।

একটা কাতর আওয়াজ শুনে চন্দ্রমৌলি ফিরে তাকাল। তৌফিকের জ্ঞান ফিরছে। চন্দ্রমৌলি উঠে গিয়ে দু-বোতল জল নিয়ে এল। খানিকটা তৌফিককে খাইয়ে, বাকিটা মাথায় ঢেলে দিল।

তৌফিক চোখ খুলে তাকাল। মাঝ-আকাশে চাঁদটা এখন অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। বাতাসে কাঁচা রক্তের গন্ধ ভাসছে। মৃতদেহগুলো এখনও পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অন্য বোতলটা চন্দ্রমৌলি এগিয়ে দিল তৌফিকের দিকে।

বোতলটা নেওয়ার বদলে তৌফিক চন্দ্রমৌলির হাত আঁকড়ে ধরল।

'কোনও উপায় নেই?'

'কীসের?' চন্দ্রমৌলি অবাক হল।

তৌফিক কোনওরকমে উঠে বসল। তৌফিক এখন নিশ্চিত, লতা তাকে ভালোবাসত। মারা যাওয়ার আগে লতার চোখে তৌফিক প্রেমের সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখেছে। লতা তাকে ভালোবাসে। কয়েক খণ্ডমুহূর্তের জন্য লতার উপরে অবিশ্বাস করেছিল তৌফিক। সেই অবিশ্বাস থেকেই লতা যখন অস্ত্রটা হাতে তুলে নিচ্ছিল, তখন সে ছুটে যায়নি। বাধা দেয়নি লতাকে। সে ভেবেছিল, লতা কখনওই আত্মহত্যা করবে না। অন্তত তাদের জন্য।

এক মারাত্মক অপরাধবোধ গ্রাস করছে তৌফিককে। সে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'লতাকে বাঁচানোর। প্লিজ চাঁদ। প্লিজ। ওই দোজখে ফিরে যেতে হলেও আমি যাব। প্লিজ, তুই শুধু বল।' তৌফিকের দু-চোখে প্রবল প্রত্যাশা। যেন চন্দ্রমৌলি বললেই এখুনি আবার দ্বার খুলে যাবে। লতা জীবিত হয়ে উঠবে। চন্দ্রমৌলি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

নাহ্‌, মৃত মানুষকে বাঁচানোর ক্ষমতা নেই তার।

আচমকা তৌফিকের নজরে পড়ল শাম্ভবীর কোলে সদ্যোজাত শিশুটা। তৌফিক ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইল। চন্দ্রমৌলি তাকে জোর করে চেপে ধরে বসিয়ে দিল।

তৌফিক চেঁচিয়ে উঠল, 'মার্ ওটাকে। মারিসনি কেন এখনও? কিল ইট।'
শুধু বাঁচানো কেন, এ ক্ষেত্রে মারাটাও তার হাতে নেই, দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল চন্দ্রমৌলির। 'আই কান্ট।'
তৌফিক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল চন্দ্রমৌলির দিকে। চন্দ্রমৌলি চোখ সরিয়ে নিল।
যোগিনীটা একটা দুর্দান্ত চাল চেলেছিল। সে জানত, শুধুমাত্র কালসন্দর্ভা জন্ম নিলে, ভৈরব ঠিক শিশুটাকে মেরে ফেলবে। কালসন্দর্ভাদের তো বিশাল কোনও শক্তি থাকে না, 'কালিকা' বা 'উমা'র মতো। সে শুধুমাত্র নিজের দেহে অন্য আত্মাকে স্থান দিতে পারে। সেই জন্য যোগিনী জন্মের আগেই নিশ্চিত করতে চেয়েছিল, আধারটাকে কেউ যাতে কোনওদিনও ধ্বংস না করতে পারে।
আসল হেতু তো লতা নয়। লতার বদলে ওখানে অন্য যে কোনও পাতরগণ্য মেয়ে হতে পারত। আসল হেতু তৌফিক। তার হাতে আছে কালকবচ বন্ধন। কালকবচ যার হাতে থাকে, কোনও অলৌকিক শক্তিতে তাকে মারা সম্ভব নয়। মানুষটা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আহত হতে পারে, বশীভূতও হতে পারে; কিন্তু মরবে না।
কালকবচ যার হাতে থাকে, শুধু সে নিজেই নিরাপদ নয়। নিরাপদ তার রক্তসূত্রে জাত পরবর্তী প্রজন্মও। সদ্যোজাত রৌম্যশিশুটার ঘোর নীল কাঁটা কাঁটা চামড়ার হাতেও একই রকম সাদা সুতোর তিনটে দাগ। দৈবী অস্ত্র, মন্ত্রশক্তি অথবা ভৈরবের রক্ত ছাড়া রৌম্যদের মারা যায় না। সবই অলৌকিক পন্থা।
কালসন্দর্ভা অজর অমর হয়ে জন্ম নিয়েছে।
অনেক ছোটবেলায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তৌফিককে সে কালকবচে আটকেছিল। তখন সে ভাবতে পারেনি, সুদূর ভবিষ্যতে কী হতে পারে। অতটা দূরদৃষ্টি ছিল না সেই দশ বছরের বালকের।
যোগিনী প্রথম থেকেই জানত তৌফিকের কথা। তা-ই সে তৌফিককেই বেছে নিয়েছিল সবার মধ্যে থেকে। তৌফিক সহ্য করতে পারবে না এই সত্যিটা।
হ্যাঁ, লতার এই মারাত্মক দুর্ভাগ্যের জন্যে তৌফিকই দায়ী। সম্পূর্ণভাবে। এবং দায়ী চন্দ্রমৌলি নিজে। তৌফিক যতদিন এই ব্যাপারটা না জানে, ততদিনই ভালো। একই দিনে প্রেয়সী, বিশ্বস্ত বন্ধু, এমনকী নিজেকেও হারিয়ে-ফেলা...
হঠাৎ বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজে চন্দ্রমৌলি সংবিৎ ফিরে পেল। শাম্ভবীর হাত থেকে শিশুটাকে কেড়ে নিয়ে তৌফিক এক আছাড় মেরেছে মাটির উপরে।
শিশুটা হাত-পা ছুড়ে তীব্র চিৎকারে গলা ফাটাচ্ছে। ওটার কিছুই হবে না, কিন্তু এই কাজটার জন্যেও তৌফিকের মনে অপরাধবোধ তৈরি হবে। রাগে-শোকে এখন ওর মাথা কাজ করছে না, কিন্তু পরে যখন ভাববে... চন্দ্রমৌলি তাড়াতাড়ি গিয়ে তৌফিককে জড়িয়ে ধরল।
'হোয়াই নট ইট ডেড? মরছে না কেন?' তৌফিক পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল। পা দিয়ে চাপা দিতে চাইল বাচ্চাটাকে। চন্দ্রমৌলি টেনে সরিয়ে দিল তৌফিককে।
'আঃ! লাল! স্টপ ইট। কী পাগলামো করছিস তুই?'

'জাস্ট কিল দ্যাট থিং। আমি সহ্য করতে পারছি না। প্লিজ চাঁদ। ওটা বেঁচে থাকবে? ওটা রৌম্য। পিশাচ! ওটা খেয়ে ফেলবে সবাইকে।'

'এখুনি এত ভয়ের কিছু নেই। তুই শান্ত হ। ওটাকে মারার উপায় ঠিক খুঁজে বার করব আমি। কিন্তু তুই অন্তত ওটাকে এভাবে আছাড় মারিস না। কন্ট্রোল ইয়োরসেল্ফ।' চন্দ্রমৌলির কথাটা মাথায় ঢোকাতে কিছুক্ষণ সময় লাগল তৌফিকের।

ওই ভয়ংকর জীবটার বাবা সে। জন্মদাতা! আচ্ছন্নের মতো তৌফিক বসে পড়ল দেওয়াল ঘেঁষে।

'কেন আমি ওকে বিয়ে করলাম? ওর গর্ভে বাচ্চা না এলে ও তো বেঁচে যেত। চাঁদ, আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি। সব দোষ আমার। আমার জন্যে। আই কিল্ড্ হার।' কিছু না জেনেই তৌফিক যন্ত্রণায় ভেঙেচুরে যাচ্ছিল।

চন্দ্রমৌলি তৌফিকের পিঠে হাত রাখল। তৌফিকের শক্ত শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছিল চন্দ্রমৌলির হাতের বাঁধনে। চন্দ্রমৌলি সময় দিল তৌফিককে সামলে নেওয়ার। এই যন্ত্রণাটা ওকে আজীবন সহ্য করতে হবে।

চন্দ্রমৌলি সরে এল। তৌফিক হাঁটুতে মুখ গুঁজে দিয়েছে। তার পিঠের বাদামি পেশি কাঁপছে তিরতির করে। যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় ছেলেটা ক্ষয়ে যাচ্ছে। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে তৌফিকের কপালে, চুলে লুটিয়ে পড়েছে খানিকটা রুপোলি জ্যোৎস্না, যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে। আচমকা তৌফিককে খুব একা এবং নিঃসঙ্গ মনে হল চন্দ্রমৌলির।

চাঁদের আলোয় কার একটা ছায়া পড়ল। চন্দ্রমৌলি দেখল শাম্ভবী। তৌফিকের পাগলামো দেখে বীজটা ভয় পেয়েছে। সে হেসে হাত বাড়াল। শাম্ভবী গুটিগুটি এগিয়ে এসে চন্দ্রমৌলির হাত ধরল। এই বালিকাকেও সঙ্গে রাখতে হবে। বীজ ছাড়া লোকান্তরের দ্বার খুলবে না। আবার নতুন কোনও রৌম্য জন্ম নেবে না পৃথিবীতে।

চন্দ্রমৌলি শাম্ভবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। শাম্ভবী ফোঁস করে উঠল। 'চুলে হাত দেবে না।'

চন্দ্রমৌলি হেসে উঠল। বাচ্চাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা উচিত, চন্দ্রমৌলি জানে না। প্রায় শাম্ভবীর মতোই বয়সে সে পথে নেমেছিল। সেই বালক বয়স থেকেই ক্রমাগত জীবনের অন্ধকারময় অভিজ্ঞতাগুলো তাকে বয়স্ক করে দিয়েছে। তার জীবনে কৈশোর আসেনি। কৈশোর তার অনাবিল কৌতূহল আর উত্তেজনা নিয়ে ধরা দেয়নি তার শরীরে।

আজ পরিবার আর পরিচিত মুখ ছেড়ে শাম্ভবীকেও চলে যেতে হবে তাদের সঙ্গে। জ্যোৎস্নার আলোয় শাম্ভবীর কোমল নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রমৌলি মনে মনে প্রতীজ্ঞা করল। ভবিষ্যৎ যতই কঠিন হোক না কেন, এই নিষ্পাপ মায়াময় বালিকাটাকে সে হারিয়ে যেতে দেবে না। এই বালিকা কিশোরী হলে সে কি ওর মধ্যে নিজের না-পাওয়া কৈশোরটাকে খুঁজে পাবে!

'নীলকমল?' শাম্ভবী রিনরিনে গলায় ডাকল। চন্দ্রমৌলি হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকল। 'লালকমল কি খুব রেগে গেছে?'

'না। লালকমল দুঃখ পেয়েছে।'

'কেন?'

এক বালিকার কাছে এই প্রশ্নের কী উত্তর দেওয়া যায়!

চন্দ্রমৌলি একটু ভেবে বলল, 'লালকমলকে যে ভালোবাসত, সে মরে গেছে; তাই।'

শাম্ভবী চন্দ্রমৌলির হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তৌফিকের গলা জড়িয়ে ধরল। তৌফিক চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। তার গালে জলের দাগ।

শাম্ভবী নিজের ছোট ছোট তালু দিয়ে মুছিয়ে দিল গাল দুটো, তৌফিকের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল গালে। কচি গলায় বলে উঠল, 'তুই কাঁদিস না লালকমল। আমি তোকে ভালোবাসব। খুব ভালোবাসব।'

তৌফিক ম্লান হেসে শাম্ভবীর চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। এবারে আর শাম্ভবী কোনও প্রতিবাদ জানাল না।

চন্দ্রমৌলি নেমে এল উঠোনে। অনেক কাজ বাকি। সে মৃতদেহগুলোকে টেনে টেনে রক্তবৃত্তের চারপাশে সাজাতে লাগল। এই সমস্ত বাগানটাকেই পুড়িয়ে দিতে হবে। কেউ যেন জানতে না পারে তৌফিক বেঁচে গেছে, কালসন্দর্ভাও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে বীজ। জানতে পারলেই বড় বিপদ। পুশুলিয়ার মাঠের প্রকৃতিবন্ধন কেটে গেছে। যে কোনও মানুষ চলে আসতে পারে।

ওই কালসন্দর্ভাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। ওর জন্যে একটা প্রিজ্‌ন তৈরির কথা ভাবতে হবে। চন্দ্রমৌলি যেন মানসদৃষ্টিতে দেখতে পেল, ভবিষ্যৎ কালসন্দর্ভা দাঁত-নখ বার করে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

কাজ গোছাতে গোছাতে চন্দ্রমৌলি প্ল্যান সাজিয়ে নিল। একটা গাড়ি জোগাড় করে আনতে হবে। কয়েকটা জামাকাপড়ও লাগবে। মারাত্মক খিদেও পাচ্ছে। ওরা দুজনেও বোধহয় গত কয়েকদিন কিছু খায়নি। শাম্ভবী তো নরকে ছিল, খিদে-তেষ্টাবোধ ছিল না। আর তৌফিক?

ওই বাচ্চাটার জন্যে একটু দুধ জোগাড় করা দরকার, যেভাবে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে! রৌম্যশিশুরা কি দুধ খায়? নাকি কাঁচা মাংস?

হঠাৎ সে লক্ষ করল, তৌফিক উঠে এসে তার সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে দুজনেই ক্লান্ত দুর্বল, দুজনেই টলছে, শ্রান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। একজনের মনের মধ্যে বিজয়ীর আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে ভবিষ্যতের আশঙ্কা। অন্যজনের মননে অপরাধের গ্লানিতে ডুবে গেছে জীবনের সমস্ত সুখস্বপ্ন।

একসময় আগুন জ্বালানো হয়ে গেল। অন্ধকার রাতের মাঝে দাউদাউ করে সর্ববিধ্বংসী আগুন জ্বলে উঠল বাগান ঘিরে।

যুদ্ধ শেষে বহ্নুৎসব!

'চাঁদ!' এতক্ষণ পরে তৌফিক কথা বলল। চন্দ্রমৌলি উৎসুকভাবে তাকাল।

'সিরিন। আমার ভাইঝি। এরা বশীকরণ করেছিল। বলেছিল, ওকে দিয়ে আমার আব্বা-আম্মা-ভাবিকে খুন করাবে।'

চন্দ্রমৌলি জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

‘এই শাম্ভবীর দিদি। সোলাঙ্কী। লাভপুর হাসপাতালে। জানি না বেঁচে আছে কি না।’

তৌফিক বুঝতে পারছিল, সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে না। আজ রাতেই হয়তো তাকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

‘শোন্, তুই শাম্ভবী আর বাচ্চাটাকে নিয়ে সোজা উত্তরদিকে চলে যা। পূর্বে বা দক্ষিণে লোকালয় আছে। এই আগুন দেখে কিছু মানুষ নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। আমি চাই না কেউ তোদের দেখুক। উত্তরে কাছাকাছি কোনও লোকালয় নেই। সোজা উত্তরে গেলে এক কিলোমিটার পরেই চক-সৈয়দপুরের খালধার ধরে পাকা রাস্তা। ওখানে অপেক্ষা করবি। আমি তোদের সঙ্গে ওখানেই দেখা করব।’ চন্দ্রমৌলি গুছিয়ে বলল।

‘আমি কি একবার বাড়ি যাব না?’ তৌফিক বিহ্বলভাবে জিজ্ঞেস করল।

‘না। এই মহাজনপথে গমন করলে শেষ পদচিহ্নটুকুও মুছে দিতে হয়, যাতে করে কেউ না আবার সেই পায়ের ছাপ ধরে গুটিগুটি এসে হাজির হয় আমাদের খোঁজে। আই অ্যাম সরি।’

তৌফিক বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল।

‘ওয়েলকাম টু আওয়ার ওয়ার্ল্ড। মিস্টার তৌফিক আহমেদ।’ চন্দ্রমৌলি কোমরে জড়ানো কাপড়টা খুলে নিমেষে বিশাল সাদা সোনালি ইগল পাখি হয়ে উড়ে গেল আকাশে।

ছেচল্লিশ

পুবের আকাশ ফাঁকা হওয়ার আগেই রজতের জিপটা এসে পৌঁছাল মাঠের প্রান্তে। তখনও কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলী পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছিল। মাঠের মাঝখানে বিশাল বাগানটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে আশপাশে।

রজত আক্ষেপে হাত ছুড়ল। তার আরও আগে বোঝা উচিত ছিল। ওই জয়ন্তই যত নষ্টের গোড়া। সে যদি আগে বুঝত, তাহলে আজকে তৌফিক আর লতাকে মরতে হত না। সিরিনের পাগলামির সুযোগ নিয়ে বিশু বেটা পালিয়ে গিয়েছিল। সোলাঙ্কী জ্ঞান ফিরে যখন পুলিশকে জানাল সবকিছু, ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গেছে। অবশ্য গতকাল রাতেই বিশু ড্রাইভারকে ধরতে পারা গেছে। বাঞ্চোতটাকে দু-ঘণ্টা ধরে পিটিয়ে সে এই জায়গাটার হদিশ পেয়েছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল। বিশুর কথা ঠিক হলে গতকাল সন্ধেবেলাতেই লতা আর তৌফিক মারা গেছে। তাদেরকে ওই পিশাচ সাধুর দল বলি দিয়ে দিয়েছে।

রজত জিপে ফিরে গেল। বেটাকে কড়কালে আরও কথা জানা যাবে। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। জিপে ওঠার আগেই তার কাছে একটা ফোন এল থানা থেকে। বিশু ড্রাইভার সুইসাইড করেছে। রজত রাগের চোটে ফোনটা ছুড়ে মারল জিপের গায়ে।

আগুন ধরে-যাওয়া বাগানটা দেখতে দেখতে রজতের চোখের কোনা হঠাৎ চিকচিক করে উঠল।

***

'সিরিন একদম ঠিক আছে। ওর সামান্য প্রবলেম হয়েছিল। ঠিক করে দিয়েছি। তোর ভাবি আর একটা পুলিশ অফিসার একটু চোট পেয়েছে। তবে ঠিক আছে তারা। খুব মারাত্মক কিছু হয়নি। সোলাঙ্কী নামের মেয়েটাও বেঁচে আছে। হেভিলি উন্ডেড বাট শি উইল সারভাইভ।' চন্দ্রমৌলি জানাল। গতকাল জেলখানার মধ্যে সে বিশুকেও মেরে এসেছে। চিহ্ন রাখতে নেই।

উত্তর বিহারের পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে একটা ফিয়াট গাড়ি ছুটে চলেছিল। কিছুক্ষণ আগে তারা পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে। সঙ্গে পর্যাপ্ত জল। জামাকাপড়ও জোগাড় হয়েছে। এখন শুধু অন্তহীনের উদ্দেশে যাত্রা।

তৌফিক একটা পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিল সামনের উইন্ডো সিটে। চোখ বুজে চন্দ্রমৌলির কথা শুনতে শুনতে সে ঢুলে পড়ল গভীর ঘুমে। পিছনের সিটে শাম্ভবী শুয়ে ছিল। তার মাথার কাছে সদ্যোজাত শিশুটাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে কাপড় দিয়ে শোয়ানো ছিল।

শাম্ভবী দেখছিল, তাদের গাড়িটা যেন সূর্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গাড়ির পিছন পিছন ধেয়ে আসছে প্রথম সূর্যালোক। একটা বাঁক ঘুরতেই সূর্যকিরণের কবলে পড়ে গেল গাড়িটা। গাড়ির কাচের ফাঁক দিয়ে প্রথম সূর্যের আলো পড়তেই শিশুটার ঘন নীল রঙের কাঁটা কাঁটা চামড়া বদলে সাধারণ ভারতীয় বাদামি ত্বকে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল।

শাম্ভবী চেঁচাল, 'নীলকমল। বেবিটা কালার চেঞ্জ করছে। মানুষ হয়ে যাচ্ছে।'

‘ঠিক আছে। ওটা আর এখন ওর আসল রূপে ফিরবে না।’ চন্দ্রমৌলি গাড়ি চালাতে চালাতে জানাল।

‘আচ্ছা নীলকমল, আমরা কি একসঙ্গে থাকব?’

‘দেখা যাক।’

‘এই বাচ্চাটাকে কী খেতে দেবে?’

‘জানি না।’

‘এ বড় হলে কি পিশাচ হবে?’

‘উফ! এত প্রশ্ন কেন?’

‘এটা বুঝি বড় হয়ে তোমাকে খেয়ে ফেলবে?’

...

সুমোটা তার চূড়ান্ত সীমায় ছুটছিল হাইওয়ে ধরে। তাদেরকে অতিদ্রুত সরে পড়তে হবে বাংলার সীমারেখা ছেড়ে। কেউ জানবে না তাদের কথা। সাধারণ বা অসাধারণ মানুষ, পাতরগণ্য, স্বর্গদেও, যোগিনী— সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে তাদেরকে মিলিয়ে যেতে হবে বাতাসে।

তথ্যসূত্র

১) যোগিনী তন্ত্রম্। মূলানুবাদঃ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য কাপালিক। কলিকাতা ৬৫ নং গ্রেস্ট্রিট প্রেস, ১২৯৪

২) কালিকা পুরাণ। মহামুনি মার্কণ্ডেয়। (বাংলা অনুবাদ : শ্রী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), কলিকাতা বিডিন প্রেস, ১২৮১

৩) পুরোহিত দর্পণ। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। কলিকাতা, অবসর প্রেস, ১৩৩১

৪) আহোম রাজের খোঁজে। অমিতাভ রায়। সাহিত্য সংসদ, ১৪২৫

1. The **Śā**kta **Pīṭ**has, Dineschandra Sircar, Motilal Banarsidass Publication, 1998
2. The Womb of Tantra: Goddesses, Tribals, and Kings in Assam, Hugh B. Urban, The Journal of Hindu Studies, Volume 4, Issue 3, 1 October 2011, Pages 231–247, 2011
3. Personality patterns value preferences and academic achievement of the secondary school students among Deoris in Assam, Thesis by Sarmah, Chandra, 2012
4. Encyclopaedia of North-East India, Volume 1, Col Ved Prakash, Atlantic Publishers, 2007
5. The Roots of Tantra, Katherine Anne Harper, Robert L. Brown, SUNY Press, 2012
6. Website: www.timeanddate.com/eclipse/

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
পুস্তক তালিকা

কল্পবিশ্ব উপন্যাসপর্ব ১ : ছয়টি কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর নভেলা
সম্পাদনা : দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও সন্তু বাগ
মূল্য : ২৭৫ টাকা

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০ : বিশ্বের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ এমনকী মেরি শেলির কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারের সংকলন
সম্পাদনা : সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়
মূল্য : ২৭৫ টাকা

কালসন্দর্ভা : অলৌকিক তন্ত্রচর্চার উপর লিখিত এক জটিল কিন্তু আনপুটডাউনেবল থ্রিলার।
লেখক : অঙ্কিতা
মূল্য : ২৭৫ টাকা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ১ (কল্পবিজ্ঞান) : সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা : সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ
মূল্য : ৪০০ টাকা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ২ (কল্পবিজ্ঞান) : সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা : সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ
মূল্য : ৪০০ টাকা

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানটাসটিক ১ : আশ্চর্য! ও ফ্যানট্যাসটিক পত্রিকার নির্বাচিত সেরা গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা : অদ্রীশ বর্ধন
মূল্য : ৪০০ টাকা

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড : হরর সম্রাট এইচ পি লাভক্র্যাফটের একমাত্র উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

অর্থতৃষ্ণা : বাংলার প্রথম স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার

লেখক : সুমিত বর্ধন

নক্ষত্রপথিক : দুটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংকলন।
লেখক : সুমিত বর্ধন

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬ : নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা : রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৭ : নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা : রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৮ : নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা : দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র : কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাসের সংকলন
অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

সবুজ মানুষ : সবুজ মানুষদের নিয়ে নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন।
সম্পাদনা : অদ্রীশ বর্ধন, সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আদিম আতঙ্ক : কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস
লেখক : অদ্রীশ বর্ধন

রেবন্ত গোস্বামী কল্পবিজ্ঞান সমগ্র : রেবন্ত গোস্বামীর সমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাক্ষাৎকার।
সম্পাদনা : সুদীপ দেব

আদম ও ইভ : কল্পবিজ্ঞানের গল্প সংকলন
লেখক : অমিতাভ রক্ষিত

মনন শীল : তিনটি ইয়ং অ্যাডাল্ট বায়ো থ্রিলার
লেখক : পার্থ দে

ডেকাগন : কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার সংকলন
লেখক : ঋজু গাঙ্গুলী

ভয়াল রসের সম্রাট-এইচ পি লাভক্রাফট : শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা, সটীক সংস্করণ।
সম্পাদনা : সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

স্বমহিমায় শঙ্কু: দুটি অসমাপ্ত শঙ্কু-কাহিনির সম্পূর্ণ রূপ
লেখক: সত্যজিৎ রায় ও সুদীপ দেব

রণেন ঘোষ রচনা সমগ্র ১: রণেন ঘোষের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও গল্পের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আগামীর সাত মুখ: স্প্যানিশ কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের সাতটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের সংকলন
অনুবাদ: সৌরভ ঘোষ ও রমা সরকার দাস, সম্পাদনা: অঙ্কিতা

মন্তাজ ইমপ্রিন্টের বই

হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন সমগ্র ১: বিখ্যাত হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন জুটিকে নিয়ে তিনটি উপন্যাস ও পঞ্চাশটি গল্প, নাটক, কবিতা
লেখক: শিবরাম চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত, সম্পাদনা: সুদীপ দেব

প্রাপ্তিস্থান: অ্যামাজন, অরণ্যমন প্রকাশনী, দে বুক স্টোর (দীপু), বইচই, রিডবেঙ্গলীবুকস, বুকিকার্ট, বইঘর, দ্য বুকটক ইত্যাদি বুকস্টোরে।

কল্পবিশ্বের ডিজিটাল ইবুক

কল্পবিশ্বের বইগুলি এবার পাবেন ইবুক ফরম্যাটেও। পড়তে পারবেন আপনার মোবাইল, কম্পিউটার, আইফোন, আইপ্যাড কিংবা কিন্ডল ডিভাইসে। বিশদে জানতে নিচের লিঙ্ক দেখুন।

https://bit.ly/kalpabiswa

http://bit.ly/2Gru2rQ